ভারতের শিক্ষিত-মহিলা।

দর্শনশাস্ত্রে গবর্ণমেণ্ট উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ,
বারাণসীস্থ গবর্ণমেণ্ট কলেজের সংস্কৃত-বিভাগের "রাণী মধুমতী
দার্শনিক বৃত্তি" ও "মহারাণী স্বর্ণময়ী দার্শনিক পারিতোষিক"
প্রাপ্ত, এবং উক্ত কলেজের ইংরাজি-সংস্কৃত-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব
সিনিয়ার শ্রেণীস্থ ছাত্র, কলিকাতাস্থ মহাকালী পাঠশালা
স্থাপনে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক, সাহিত্যসভা প্রভৃতির
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, যুক্তপ্রদেশস্থ রাম-
পুরের স্বাধীন অধিপতির ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক,
ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্বাধীন হিন্দুনরপতি
বরোদাধিপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত বক্তৃতার্থ
বরোদায় নিমন্ত্রিত কলিকাতাস্থ বিশপ্স-
কলেজের সংস্কৃত-প্রোফেসার, "সংস্কৃত-
রঞ্জিকা," "দি ষ্টডি অব্ দি গীতা"
প্রভৃতি প্রণেতা, প্রাঞ্জল বঙ্গ-
ভাষায় সাংখ্য-পাতঞ্জল
প্রভৃতি ষড়্দর্শনের অনু-
বাদক, ও কাশীর গণেশ
মহল্লাস্থ সুপ্রসিদ্ধ
"কোনালিয়ার
ভট্টাচার্য্য"-
বংশ-সম্ভূত

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী

ইহার প্রণেতা ও নিজ ব্যয়ে প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩২১ বঙ্গাব্দ।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সংবাদপত্রে, পুস্তকের দোকানে, ও নিজ বাটীর দ্বারোপরি "সাইনবোর্ডে" বিজ্ঞাপন, এবং সহরের পথে পথে বড় বড় লাল নীল অক্ষরে "প্ল্যাকার্ড্" প্রভৃতি উপায় অবলম্বন ব্যতিরেকেই প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা প্রায় দ্বিগুণ হইল। অথচ ইহার মূল্য বৰ্দ্ধিত হইল না; দ্বিতীয় সংস্করণের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই এই সমস্তই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উত্তম হইয়াছে। সুতরাং এই সকলের জন্য দ্বিগুণ অর্থও ব্যয়িত হইয়াছে। অথচ পুস্তকের মূল্য সেই এক টাকাই রহিল। মূল্য বাড়িল না। কারণ, ঈদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচারই উদ্দেশ্য। পুস্তক বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করা উদ্দেশ্য নয়। মূল্য বাড়াইলে অনেকে সামর্থ্যসত্ত্বেও পুস্তক ক্রয়করেন না। এইজন্যই আমার ব্যাকরণ-সাহিত্য-দর্শন-তন্ত্রাদি নানাশাস্ত্র-অধ্যায়ী ছাত্র, কলিকাতা হাই কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ সুবিচারক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একাধার, মাননীয় মিষ্টার্ জষ্টিশ্ জে, জি, উড্রোফ্ এম্, এ, বি, সি, এল্, বার-য়্যাট্-ল, সাহেব মহোদয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের বেলায় বলিয়াছিলেন যে,

"পণ্ডিত মহাশয়, বহু অর্থ ব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে সম্পাদিত কোন একখানি প্রয়োজনীয় উত্তম পুস্তকের মূল্য অতিঅল্প এক টাকা মাত্র হইলেও অনেক ক্রয়সমর্থ ভারতীয় লোক উহা বিনা মূল্যে গ্রহণকরিতে চেষ্টাকরে। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার লোক এতই গুণগ্রাহী যে, ঐরূপ একখানি পুস্তক বাহির হইবামাত্র যে কোন প্রকারে অন্ততঃ ঋণ করিয়াও উহা ক্রয়করিয়া পাঠকরে। অতএব আপনি ইংরাজীভাষায় ইহার অনুবাদ করুন। আমিই উহার মুদ্রাঙ্কনব্যয়-ভার গ্রহণকরিব। ইউরোপের ও আমেরিকার ইংরাজিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভারতমহিলাগণের অজ্ঞাতপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আপনার পুস্তক ক্রয় করিবে"। উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস্, আই, বাহাদুর মহোদয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়, গুণগ্রাহীর দেশ বিলাত হইলে যেদিন ঈদৃশ উত্তম পুস্তকখানি বাহির হইয়াছিল, সেই দিনই পুস্তকবিক্রেতৃগণ ছাপাখানায় আসিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয়ার্থ আপনার পুস্তক নিজ নিজ দোকানে লইয়া যাইত"। মাননীয় মিষ্টার্ উড্রোফ্ এবং রাজা বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এদেশে গুণগ্রাহী উৎসাহদাতা লোক যে, একেবারে নাই, তাহা নয়। তবে

খুব অল্প। ষ্টার্ থিয়েটারের নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল বসু মহাশয় এই পুস্তক বাহির হইবার প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে ঈদৃশ একখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক বাহির হইবে, এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার উৎকলদেশীয় সদৃশ্য "থলি"টি বাহির করিয়া একটি টাকা আমার হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন, "যেদিন ঈদৃশ পুস্তকখানি বাহির হইবে, সেই দিনই পুস্তকখানি যেন পাই।" পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বেই মূল্যদান, প্রবল পিপঠিষা ও সাধুভাব পরিচয় নয় কি? তিনি যেরূপ অধ্যয়নশীল লোক ও তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরিতে যেরূপ পুস্তক-সংগ্রহ দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এইরূপ পুস্তকপাঠের আগ্রহ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিচিত্র নহে। কলিকাতা হাট্‌খোলার বিখ্যাত উত্তমর্ণ ধনী বিদ্বান গুণগ্রাহী মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়, এই পুস্তক উপহার পাইয়া ও পাঠ করিয়া এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ইহার এক টাকা মূল্যের পরিবর্ত্তে পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, যে পুস্তকখানি উপহার দেওয়া হয়, তাহার মূল্য লইতে নাই। আমি উপহার দিয়া ইহার মূল্য লইব বলিয়া আশাও করি নাই"। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনার এই পুস্তকখানি অমূল্য হইয়াছে। সুতরাং ইহার মূল্য দেওয়া হইতেছেনা, কিন্তু ইহার মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ে সাহায্যার্থ আমি অতি সামান্য কিঞ্চিৎ দিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক

হইয়াছি। ইহা আপনাকে লইতেই হইবে”। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তক উপহার পাইয়া ও পাঠকরিয়া ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, ও ইহার পাঁচ টাকা মূল্য দিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে পুস্তক উপহার দিয়া টাকা পাইবার আশাও করি নাই। অস্মদ্দেশের বালিকাদিগকে সনাতন বৈদিক-ধর্ম্ম ও মনুপ্রভৃতির স্মার্ত্তধর্ম্ম-অনুযায়ী আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি, পিতা-মাতা শ্বশুর-শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি, ব্রত, পূজা, ও বিদ্যা শিক্ষাদিবার জন্য আমি কলিকাতায় একটি হিন্দুবালিকা-বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু ঈদৃশ বিদ্যালয়-স্থাপনে প্রভূত ব্যয়ের প্রয়োজন বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয়া বিদুষী শ্রীমতী মাতাজী মহারাণী মহোদয়া মুর্শিদাবাদ-কাসিমবাজারের বিখ্যাত দানশীলা মহারাণী ৺ স্বর্ণময়ী মহোদয়ার কলিকাতা-জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। আমিই তাঁহার নিকটে সর্ব্বপ্রথম শুভক্ষণে এই বিষয় প্রস্তাবকরিলে তিনি বলিয়াছিলেন,”য়হ বহুৎ অচ্ছী বাৎ হায়। মহারাণী স্বর্ণময়ীকো ইস্ বিষয় নিবেদন করনা চাহিয়ে”। তিনি মহারাণী ৺ স্বর্ণময়ী মহোদয়াকে

এই বিষয় নিবেদন করিলে মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য মাতাজী মহোদয়াকে ও আমাকে মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার ভগিনীপুত্র তৎকালীন সুযোগ্য দিওয়ান্ কল্যাণ-ভাজন রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল বি, এ, মহাশয়, যেরূপ মহাযত্ন ও রাজভোগের সহিত আমাদিগকে মুর্শিদাবাদে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

মহারাণী ৺ স্বরময়ী মহোদয়া ঈদৃশী পাঠশালার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অদ্যাপি মহাকালী পাঠশালাকে উক্ত সাহায্য দানকরিয়া আসিতেছেন।

৺ মাতাজী মহারাণী মহোদয়া ঈদৃশী পাঠশালার উপযোগী একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে আদেশ করায় আমি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাসিমবাজার-রাজ-বাটীর পার্শ্বস্থ "গোলাবাড়ীর" বৈঠকখানায় বসিয়া "সংস্কৃত-রঞ্জিকা"-নাম্নী একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। এবং মহাকালী পাঠশালাকে সেই পুস্তিকার স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। উহার কয়েকটি সংস্করণও বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পাঠশালার অর্থাভাবে উহার আর নূতন নূতন সংস্করণ বাহির হয় নাই। মহাকালী পাঠশালার উদ্দেশ্য টি যে, সাধিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার

করিতেই হইবে। ইহার শাখা-প্রশাখা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু সহস্র হিন্দু বালিকা এই সকল পাঠশালায় শিক্ষার ফল প্রাপ্ত হইয়া বহু সহস্র গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিত হইতে পারিয়াছেন। "মহাকালী পাঠশালা" যুগান্তর উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমার এই "ভারতের শিক্ষিত-মহিলা"-নামক পুস্তক খানি লিখিতে অনেক পুস্তক পাঠকরিতে হইয়াছে। সেই জন্য অনেক সময় লাগিয়াছে। এই সংস্করণে রাণী দুর্গাবতী, রাণী অহল্যাবাই ও রাণী ভবানীর জীবনচরিত সুবিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে ও অনেক নূতন কথা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য গ্রন্থ-কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাণী দুর্গাবতীর জীবন-চরিত সবিশেষ জানিবার জন্য রাণী দুর্গাবতীর ভূতপূর্ব্ব রাজ্য জব্বলপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েক ব্যক্তির নিকটে অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। তজ্জন্যও অনেক সময় গিয়াছে। রাণী দুর্গাবতীর সম্বন্ধে যিনি যেরূপ পুস্তক লিখিয়াছেন, এবং রাণী ভবানীর সম্বন্ধে যে কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, সেগুলি সাময়িক চিত্রপট বা গল্প পুস্তক বা উপন্যাস মাত্র। ঈদৃশ পুস্তক তাদৃশ উপাদানে রচিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল পুস্তক হইতে

অণুমাত্র সাহায্য লাভকরিতে পারি নাই। কিন্তু রাজসাহীর সর্ব্বপ্রধান উকিল সাহিত্যিক ও ইতিহাসশাস্ত্ররত্ন শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট হইতে রাণী ভবানীর সম্বন্ধে অনেক দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম ও তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানকরিলাম। রাণী ভবানীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপিনী আলোচনা ও বিশেষ পরিশ্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাণী অহল্যাবাইর জীবন-চরিত-লিখন সম্বন্ধে "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত" প্রণেতা মিষ্টভাষী সহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, মহাশয়ের অনেক কথার সাহায্য লইয়াছি। অতএব তাঁহার নিকটেও কৃতজ্ঞ রহিলাম ও তাঁহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানকরিলাম। অস্মৎকুলপ্রতিপালক মহামান্য কাশীর স্বাধীন মহারাজা বাহাদুর তাঁহার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ আচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে আমার এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের কয়েক পত্রের হিন্দি অনুবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "হিন্দি ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ হওয়া উচিত"। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া ইহার হিন্দি ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সেই জন্য, এবং আমি সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত

ন্যায় বৈশেষিক ও মীমাংসা, এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় সুবিস্তৃত ভাবে অনুবাদ করিবার জন্য সর্ব্বদা লিখনে ব্যস্ত থাকায় ও অন্যান্য নানাবিধ পুস্তক পাঠে আসক্ত থাকায় এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে।

শ্রীহরিদেব শর্ম্মা।
১২।৫ ডাক্তার লেন।
তালতলা, কলিকাতা।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের মত ঃ—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সত্যস্পষ্টবাদী বিখ্যাত বিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ মিত্র মহাশয় ইহার প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন ঃ—

......"প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়......বিদুষী স্ত্রীলোকদিগের বৃত্তান্ত......স্বগ্রন্থে নিবেশিত করিয়া ভারত-দুহিতৃ-শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ

প্রদর্শন করিয়াছেন। ......কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি ঐরূপ পুস্তক হইতে অনেকাংশে উত্তম। কারণ, ইহাতে আর্য্যনারীদিগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় উত্তমোত্তম কথা আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য হইয়াছে। আশা করি, প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এই পুস্তকখানি কুল-মহিলাদিগের সুপাঠ্য হইবে এবং "মহাকালী পাঠশালা" ও ইহার শাখা বিদ্যালয়সমূহে ইহার কতক কতক অংশ নিম্নশ্রেণীতে ও কতক কতক অংশ উচ্চ শ্রেণীতে বালিকা-গণের অবশ্য পাঠ্য হইবে। এই পুস্তকখানি যে, কেবল স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য, তাহা নহে, যুবকগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে স্ব স্ব গৃহের মহিলাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ উত্তম এক-খানি পুস্তক লিখিয়া হিন্দুসমাজে একটি প্রধান অভাব দূর করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্য-উদ্যানের একটি নূতন সুরভি পুষ্প। ইহার সৌরভে পাঠক-পাঠিকাগণ যথেষ্ট আমোদিত ও উপকৃত হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই"।

১৩১৭ সালের ২৫শে আষাঢ়, শনিবারের

"বসুমতী"।

"ভারতের শিক্ষিত-মহিলা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী প্রণীত। বাঁধাই মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ উৎকৃষ্ট। সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য এক টাকা।' সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক বিরল। ইহা কেবলমাত্র কতিপয় আর্য্য-মহিলার জীবন-চরিতে পূর্ণ নয়। ইহা ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার ছবি নয়। "ভারতের শিক্ষিত-মহিলা" প্রাচীন আর্য্য সমাজের ঐতিহাসিক চিত্রের সমষ্টি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন; "এই পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্য-উদ্যানের একটি নূতন সুরভি পুষ্প। ইহার সৌরভে পাঠক-পাঠিকাগণ যথেষ্ট আমোদিত ও উপকৃত হইবেন। ইহা কেবল স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক নয়, যুবকগণ এইরূপ পুস্তক পাঠ করিলে স্ব স্ব গৃহের মহিলাদিগকে সুশিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন।......" কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি ঐরূপ পুস্তক হইতে অনেকাংশে উত্তম। কারণ, ইহাতে আর্য্য-নারী-দিগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় উত্তমোত্তম কথা আছে।......আশা করি

প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এই পুস্তকখানি কুলমহিলাদিগের সুপাঠ্য হইবে।.........শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ এইরূপ একখানি উত্তম পুস্তক লিখিয়া হিন্দুসমাজে একটি প্রধান অভাব দূর করিয়াছেন"।—সারদা বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এই গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে বহু গ্রন্থ পাঠকরিতে হইয়াছে। তিনি আর্য্য নারীর আচার-ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—হিন্দু স্ত্রী ভোগ্যা বা পরিচারিকা নহেন; হিন্দু স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপত্নী, গৃহদেবতা, আদ্যাশক্তির অংশভূতা; যদি হিন্দু এই আদর্শের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে হিন্দুর গৃহ ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত হইতে পারে। যাঁহারা পুত্র কন্যা-দিগকে ধর্ম্মভাবে ও আর্য্যভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চাহেন, তাঁহারা পুত্র কন্যাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিন। এই গ্রন্থে বর্ণিত নারীচরিত্র অধ্যয়ন করিলে হৃদয়ে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। ১২।৫ ডাক্তার লেন, তালতলা, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকটে ইহা প্রাপ্তব্য। এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়"।

এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য "সাধারণী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার

মহাশয় চট্টগ্রাম-সাহিত্য সম্মিলনে অভিভাষণের সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের "ভারতের শিক্ষিত মহিলা"র এইরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন ঃ—'......

"ইহাতে প্রাচীনকালের এবং এখনকার দিনের বিখ্যাত ভারত মহিলার চরিত্রের পরিচয় আছে।......বঙ্গমহিলার এখানি সুপাঠ্য পুস্তক, পড়িলে জ্ঞানের সঙ্গে আমোদ পাইবেন"। বঙ্গবাসী। ১৩১৯ সাল, ১৬ই চৈত্র, শনিবার।

THE BENGALI, FRIDAY,
JANUARY 6, 1911.

Review.

Pandit Hari dev Shastri, who is well-known as a Sanskrit scholar and Sanskrit speaker, has brought out a will-written Bengali book entitled "Bhrarter Shikshita Mahila." Babu Sarada Charan Mittra has written a preface. The book contains lives of noted learned Hindu and Budddist ladies of India. It also narrates the manners, customs, modes of education and living of the Aryan ladies of India ; and as such can be usefully placed in the hands of our girls and ladies. We understand that the Hon'ble Mr. Justice Woodroffe has promised to publish a translation ot this into English. We are also told that the Bengal Government promised to purchase several copies of this book.

THE AMRITABAZAR PATRIKA,

JULY 5, 1910.

It has been a common mistake in many quarters to Indian women has been relegated a much inferior place to that of men in all matters pertaining to education, religious abservances and the like. Indeed the popular belief among large sections of the community still is that women are precluded from worshiping gods and goddesses, as is the case with Shudras, in the same manner as the Brahmans do. Pandit Hari dev Shastri has done a great service to Hinduism and to the improvement of the status of Hindu women by publishing his 'Bharater Shikshita Mahila.' Babu Sarada Charan Mitter has written a preface for it, and the work in itself is a monument of patient labour study and research. The Shastri has drawn his materials from all available sources and laid under requisition the Vedas and other Sanskrit works to prove his contentions. He has also given biographical sketches of some eminent Indian women to show how far erudition and and learning had at one time penetrated to the feminine ranks of society. A well-known

Sanskrit scholar, whose gift of Sanskrit elo-quence is almost uniqe among Bengalis, Pandit Hari dev Shastri has long enjoyed a reputation, almost second to none, for he was invited to deliver Sanskrit discources at such seats of Sanskrit learning as Navadwip and by such illustrious persons as the Gaeckoar of Baroda. His present work will, we belive, hand down his name to posterity and enable Benglis to realise what the true place of women is in the society and in domestic circles. His book will, we hope find an honoured place in every Bengali house-hold. The book is to be had of Messrs. S. C. Addy & Co. Wellington street and of the author at 12/5 Doctor Lane, Taltolla, Calcutta. It is well-bound and nicely printed for its price.

THE INDIAN MIRROR, SATURDAY,
DECEMBER 17, 1910.

"Bharater Shikshita Mahila" or the educated ladies of India is the title of a book, evincing a good deal of patient researches, that has emanated from the pen of Pandit Hari dev

Shástri, the well-known Sanskrit scholar. The splendid array of facts gleaned from ancient and midiaval Literatute, furnishes a convincing testimony as to how ladies avail-ed themselves of the highest education in those days, and proved themselves the true helpmets of their husband. The author has ransacked both the scriptural and the profane Literature of India to demonstrate how ladies were ever venerated and even paid the homage little short of worship in this country, and how they fully cultivated the graces of mind and soul, thereby stand-ing even to this day as the best specimens of womanhood, having realised the highest ideals of culture and spirituality. The attain-ment of supreme knowledge and the perfect development of the intellectual and spiriturl faculties were greately prized by the ladies of ancient India is fully attested by glorious examples of Atreyi, Maitreyi, Gargi and host of others, ladies, coming down to later times, who must ever be reckoned as the germs of of their sex. The author has again shown how female education of a highly developed character was one of the bright results of

the inspiring influences of Buddhism and how Buddhest ladies like Malini, Kamandaki, Saudamini and others reached the highest flights of enlightened advancement, an achivement which shed a lustre round their names in Buddhist Literature. The life sketches of celebrated women in the Vedic Pauranaic and later ages, ending with those of Ranee Durgavati, Ranee Ahalya Bai and Ranee Bhavanee, furnish interesting and instructive reading. The intoduction to the book is written by Babu Sarada Charan Mitra in his usual graceful manner, who writes, among other things, that Buddhism is not a religion distinct from Hinduism or the last anti Hindu in its spirit and principles—a remark, we need hardy say, we fully endorse. Pandit Hari dev Shastri has done good service to the cause of female education by bringing out a book so suitable for the development of the character of our girls, and by bringing forward unanswerable arguments from the store hose of ancient and later times to convince the yet unconvinced on the supreme importance of elevating the other sex by proper education. The get up of the

book is excellent, and the price quite modest in comparison with the wealth of information supplied.

"Bharater Shikshita Mahila" by Pandit Hari dev Shastri, Professor of Sanskrit, Bishop's College. Pric one ruppe. To be had of the author at—12/5 Doctor Lane, Taltolla, Calcutta.

সূচীপত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

ভারতের শিক্ষিত-মহিলা।

অতি প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্য-মহিলাগণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও শিক্ষা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। যে সকল গ্রন্থে আর্য্য-মহিলাগণের আচার-ব্যবহারাদির কথা লিখিত আছে, সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা অস্মদ্দেশে প্রায়শঃ বিলুপ্ত হওয়াতেই অধুনা অনেকের হৃদয়ে নানাপ্রকার কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। যে সকল পুস্তকে ভারতীয় আর্য্য-মহিলাদিগের ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল পুস্তকের সম্যক্ আলোচনা লুপ্ত হওয়াতেই মহিলাদিগের শিক্ষা বিষয়ে অনেকেরই অনেক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালের মহিলা-জাতির আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, তপস্যা, দয়া, দান, পরাক্রম,

সাহস, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বহু প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণকালেও ভারতীয় মহিলার অসাধারণ বীরত্ব ও সতীত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমগ্র জগৎকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। ভারত-ললনার পবিত্র চরিত্র বর্ণনা করা মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির সামর্থ্যাতীত। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহর্ষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা ভগবতী আদ্যাশক্তির সম্যক্ বর্ণনায় অক্ষম হইয়া এই-মাত্র বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন যে, হে দেবি দুর্গে, এ জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, যত প্রকার নারী আছে এবং যত প্রকার কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা মহিলা আছে, সেই সকলই তোমার অংশ। হে দেবি, তুমি স্ত্রীলোক, অতএব জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতিই তোমার ন্যায় পূজ্যা ও মাননীয়া।* যে দেশে মহাপ্রভাব মহর্ষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা মহিলা-জাতিকে ঈদৃশ সম্মান দান করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের স্ত্রীলোক পুরুষের নিকট যথাযোগ্য সম্মান ও উত্তম ব্যবহার প্রাপ্ত হয় না, এ কথা যাহারা বলে, তাহারা পক্ষপাতী এবং শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তি।

যে দেশে "এয়ো সংক্রান্তি ব্রত," কুমারী-পূজা, সধবা-পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে দেশে কুমারী-পূজা ও সধবা-পূজার সময়ে কুমারীর ও সধবার

---

* বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ॥—চণ্ডী ॥

সুচারু চরণ-যুগল অলক্তকে রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং উহা গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়া উত্তমোত্তম পুষ্প, চন্দন, মাল্য, বস্ত্র ও নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চিত হয়, যে দেশে কুমারী-পূজার নিমিত্ত মহর্ষিগণ সংস্কৃত মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই কুমারী-পূজা-সময়ে ধূপ-ধূনা ও গুগ্গুলের সুগন্ধি ধূমরাশিতে সমগ্র পল্লী সুবাসিত হয়, সেই দেশের—সেই একমাত্র ভারতবর্ষের আর্য্য-সন্তানগণই নারীর সম্মান-দানে একমাত্র অভিজ্ঞ। নারীদিগকে কিরূপে সম্মান করিতে হয়, তাহা শিখাইবার জন্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, দক্ষ, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভূরি ভূরি শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন ঃ—*

পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর প্রভৃতি যদি গৃহের কল্যাণ-কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন তাঁহাদের গৃহের নারীদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেন, পূজা করেন

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমিপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ।—মনু।

এবং বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও খাদ্য-দানে সন্তুষ্ট রাখেন। যে গৃহে নারীর উপযুক্ত সম্মান ও পূজা হয় এবং উত্তম খাদ্য-বস্ত্র-অলঙ্কারাদি-দানে নারীকে সন্তুষ্ট রাখা হয়, সে গৃহে তেত্রিশ কোটি দেবতার আবির্ভাব হয়, দেবতারা তথায় অদৃশ্যরূপে বিরাজ করেন। আর যে গৃহে নারীর পূজা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয় না, সে গৃহের সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ড বিফল হইয়া যায়। যে গৃহে নারী উৎপীড়িত হইয়া দুঃখ পায়, কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে গৃহের—সে বংশের শীঘ্র ধ্বংস হয়। যে কুলে নারী মনের সুখে দিন-যাপন করে, সদা আপ্যায়িত থাকে, সেই কুল শীঘ্র সমৃদ্ধি-শালী হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা কুলের মান-সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা উত্তম খাদ্য-বস্ত্র-অলঙ্কারাদি-দানে তাঁহাদের নারীদিগকে যেন সদা পূজা করেন। কারণ, নারীই গৃহের দেবতা। যেমন দেবতাকে পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা দেবতারূপিণী নারীকেও পূজা করিতে হয়। ইহা স্ত্রৈণ-দিগের কথা নয়, ইহা চির-ব্রহ্মচারী মহর্ষিগণের কথা।

আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপে সম্মান করিতে হয়, তাহা শিখাইবার জন্য মনু বলিয়াছেন, * মাতৃ-ভগিনী,

* মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া।

মাতুলানী, পিতৃ-ভগিনী এবং শ্বশ্রূ-(শাশুড়ী) কে মাতা ও গুরুপত্নীর ন্যায় প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইবে। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে বয়োজ্যেষ্ঠা জ্ঞাতিপত্নী, বৈবাহিক (বেয়ান্) এবং পিতৃব্য-পত্নী (খুড়ী জেঠাই) প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবে। কারণ, ইহাঁরা মাতা ও গুরুপত্নীর ন্যায় মান্য। বয়োজ্যেষ্ঠা সবর্ণা ভ্রাতৃ-পত্নীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করা দেবরের দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। মাতা ইঁহাদের অপেক্ষা গুরু-তমা।* পূজনীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক ব্যতীত সাধারণতঃ স্ত্রীজাতিমাত্রের প্রতি সর্ব্বদা মানব অতি উত্তম ব্যবহার করিবে এবং সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই জন্য মনু বলিয়াছেন, † চক্রযুক্ত যানে (গাড়ীতে) আরূঢ় ব্যক্তি, বৃদ্ধ, রোগী, ভারবাহক (মুটে), নারী (যে কোন জাতীয়া এবং যে কোন ধর্ম্মিণী হউক না কেন), গুরুগৃহ হইতে বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, হস্তী,

---

* ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ॥
পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবৎ বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো গরীয়সী॥—মনু।

† চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥—মনু।

ঘোটক, সৈন্য ও ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত রাজা এবং বর, এই সকল লোককে অগ্রে যাইতে দিবার জন্য পথিক পথ ছাড়িয়া দিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, * ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতিবর্গ, শ্বশ্রূ (শাশুড়ী), শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধুগণ, উত্তম খাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা কুলবধূকে দেবতার মত পূজা করিবে। কুলমহিলা কারাগারের বন্দিনী নয় কিংবা কুকুর-বিড়ালের ন্যায় হেয় পশু নয় কিংবা দাস-দাসীদিগের ন্যায় কঠোর পরিশ্রমের জীবও নয়; কিন্তু কুলমহিলা গৃহের বাস্তুদেবতাস্বরূপ।

মনু বলিয়াছেন, † গৃহে স্ত্রী যদি সুপ্রসন্না থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত কুলই সুপ্রসন্ন থাকে, আর স্ত্রী যদি অপ্রসন্না থাকেন, তাহা হইলে সমস্তই অপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হয়। যাঁহাদের উত্তম খাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার দিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা স্ব স্ব স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য যেন অসঙ্গত উপায়ে ঐ সকল বস্তু সংগ্রহ না করেন। পতির সুমধুর বাক্য, উত্তম ব্যবহার, সদা যত্ন, স্নেহ-সমাদরই পত্নীর উত্তম খাদ্য-বস্ত্র-অলঙ্কারাদি বস্তুর স্থানাপন্ন হওয়াই উচিত। কুলমহিলা

---

* ভর্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥—যাজ্ঞবল্ক্য॥

† স্ত্রিয়াত্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে॥—মনু॥

গৃহস্থোচিত কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইবে। গৃহকার্য্যে স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা হইলে গৃহে কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে না। গৃহে বহু দাস-দাসী থাকিলেও স্ত্রীলোক আলস্যে ও ঔদাস্যে কালযাপন করিবে না; দাস-দাসীদিগের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিবে; তাহাদিগকে উত্তমরূপে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিবে। স্ত্রীলোক সদা বিলাসে আসক্ত থাকিয়া নির্জীব চিত্রপটের ন্যায় বিরাজ করিবে না। এইরূপ ভাবে সদা অবস্থান করিলে নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং মেদ বর্দ্ধিত হওয়ায় তাদৃশী নারী অতি স্থূলাঙ্গী হইয়া পড়ে, ক্রমে বাতব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পায় এবং অবশেষে তাহার শরীর দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন ঃ—* নারী গৃহকার্য্যে দক্ষ হইয়া গৃহের বস্তু সকল পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে; সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য অত্যধিক ব্যয় করিবে না। আয় অনুসারে ব্যয় করিবে। আয়-ব্যয়ের একটা "হিসাব্-নিকাশ" রাখিবে। না বুঝিয়া অতিব্যয় করা দারিদ্র্যের প্রথম সূচনা। অদ্য বৃহৎ রোহিত মৎস্যের "পোলাউ" ভক্ষণ, আর কল্য খাদ্যাভাবে উপবাসে দিনযাপন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। গৃহের দাস-দাসী-

---

* সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥—মনু ॥

দিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। তাহাদের প্রতি গৃহকর্ত্রী সরল ও উদার ভাব প্রদর্শন করিবে। তাহাদের সহিত পুত্র-কন্যার মত ব্যবহার করিবে।

শকুন্তলা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিপালক পিতা মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন :—* শ্বশুর ও শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিও। তোমার পতির যদি অন্য কোন পত্নী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রিয়-সখীর ন্যায় আচরণ করিও। কদাপি তাঁহার সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করিও না। যদি কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ তোমার পতি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ভর্ৎসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইও না। তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিও না। পরিজনের সহিত, দাস-দাসীদিগের সহিত সরল ও উদার ব্যবহার করিও। সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি হইলে কদাচ গর্ব্বিত হইও না। এইরূপ উপদেশমত কার্য্য করিলেই প্রশংসনীয়া গৃহিণীর পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যে নারী এইরূপ উপদেশের বিপরীত আচরণ করে, সে

---

* শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ ॥
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

গৃহের ব্যাধিস্বরূপ ও কণ্টকস্বরূপ হইয়া সদা পতি প্রভৃতির মানসী ব্যথা উৎপাদন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ও ভারতীয় ব্যবহার-বিরুদ্ধ। শাস্ত্র বলেন ঃ—*

স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হইয়া থাকিবে, যৌবনে পতির রক্ষণাধান হইবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের সেবাধীন হইবে। স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না।

মনু বলিয়াছেন, ণ বালিকাই হউক্, যুবতীই হউক্ বা বৃদ্ধাই হউক্ না কেন, কুলমহিলা কোন কালেই নিজ্ গৃহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। নিজের গৃহমধ্যেই যখন স্বাধীনতা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বাহিরে স্বাধীনতা ত অত্যন্তই নিষিদ্ধ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ‡ স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীন হইবে, বিবাহের পর পতির অধীন হইবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। যদি পিতা, পতি বা

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম গৃহেষপি॥—মনু॥

রক্ষেৎ কন্যাং পিতাবিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥—যাজ্ঞবল্ক্য॥

পুত্র না থাকে, তাহা হইলে জ্ঞাতি বা অন্য আত্মীয়গণের রক্ষণাধীন হইবে। স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না। শাস্ত্র পুনরায় বলিতেছেন ঃ—*

পিতা, পতি ও পুত্রগণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্ত্রীলোক কদাপি কোন স্থানে বাস করিবে না। ইহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া বাস করিলে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের নিন্দা হয়। ভারতের কুলমহিলা লজ্জাশীলা হইবে। ভারতের কুলমহিলার পক্ষে পরপুরুষের মুখ-দর্শন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। ভারত-ললনা পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর হইবে না। পরপুরুষের দৃষ্টি-ব্যাঘাতের জন্য অবগুণ্ঠনবতী হইবে। পরপুরুষের মুখ দেখা ত দূরের কথা, শাস্ত্র বলিতেছেন ঃ—

কুলমহিলা চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত দর্শন করিবে না। সেই জন্য শাস্ত্র কুলমহিলাকে "অসূর্য্যম্পশ্যা" হইতে উপদেশ করিয়াছেন। এমন কি, পতির মুখ ছাড়া পুংলিঙ্গ-শব্দ-বাচ্য বৃক্ষাদি পদার্থকেও নিরীক্ষণ করিবে না। যে নারী এইরূপ শাস্ত্রনীতি এবং প্রাচীন ভারতীয় পবিত্র হিন্দু-সমাজ-নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়, সেই নারীই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী। নতুবা কেবলমাত্র "মধুসংক্রান্তি ব্রত"

---

* পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেৎ বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে॥

করিলেই কিংবা নাসিকায় তিলক অঙ্কিত করিয়া জপমালা লইয়া জপ করিলেই মাত্র নারী ধর্ম্মচারিণী হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—গোপনে মদ্য-মাংস-সেবন, দুষ্ট-স্ত্রী-পুরুষের সহিত সংসর্গ, পতির সহিত বিচ্ছেদ, স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ পর্য্যটন, পরগৃহে শয়ন ও পরগৃহে বাস এই ছয়টি নারীর পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়।

স্ত্রীজাতি রত্নস্বরূপ। হীরক-মুক্তা-মাণিক্যাদি রত্ন যেমন লোকে অতি যত্নে ও সাবধানে "মখ্‌মল্‌" প্রভৃতি অতি কোমল বস্ত্র-সমাচ্ছাদিত সুচারু কারুকার্য্য-সুশোভিত পেটিকার মধ্যে রক্ষা করে, কিন্তু ঘাটে মাঠে পথে জঙ্গলে অনাদৃতভাবে ছড়াইয়া রাখে না, তদ্রূপ কুলমহিলাকে সুসজ্জিত স্বাস্থ্যকর উত্তম মনোরম আবৃত গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবে; ঘাটে মাঠে হাটে পথে জঙ্গলে অবহেলা পূর্ব্বক অনাবৃতভাবে বিকীর্ণ করিয়া রাখিবে না। রত্ন অবহেলার বস্তু নয়। রত্নের প্রতি রত্নোচিত ব্যবহার করিবে। রত্নকে অবহেলা করিলে দস্যু-তস্করাদির ভয় অবশ্যম্ভাবী এবং ছদ্মবেশী ভদ্রের ভয়ও অনিবার্য্য।

কুলমহিলা সর্ব্বদা যেখানে বাস করেন, তাহার নাম অন্তঃপুর; তাহার অপর নাম শুদ্ধান্ত। সে স্থান সদাই শুদ্ধ এবং উহা পরপুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত হওয়া উচিত বলিয়া উহা শুদ্ধান্ত নামে অভিহিত। উহা জনতা-পূর্ণ হট্ট ও সাধারণ পথের ন্যায় অনাবৃত, অপবিত্র ও

সাধারণের গম্য স্থান নহে। উহা আবৃত পবিত্র স্বজনগণের অধ্যুষিত স্থান। কুলমহিলারূপ রত্ন তাদৃশ স্থানেই রক্ষণীয় বস্তু। যাঁহার যেমন আর্থিক অবস্থা, তিনি তদনুসারে বাসভবন নিজের আয়ত্ত করিয়া তাঁহার কুল-মহিলাদিগকে সাধারণের দৃষ্টিবহির্ভূত করিয়া তথায় রক্ষা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। নিজের অবস্থানু-সারে ঐ স্থানকে যথাশক্তি পরিষ্কৃত, পবিত্র, মনোরম ও স্বাস্থ্যজনক করিয়া রাখিতে সদা চেষ্টা করিবে। মনু বলিয়াছেন ঃ—স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, সত্যধর্ম্ম, পবিত্রতা, সুমধুর উপদেশবাক্য এবং নানাবিধ শিল্প সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেই জন্য শাস্ত্র আরও বলিতেছেন যে, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" অর্থাৎ স্ত্রীজাতি রত্নবিশেষ বলিয়া অপেক্ষাকৃত নীচ কুল হইতেও উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্ত্রীজাতির উৎকৃষ্টতা ও পবিত্রতা প্রতিপাদন করিবার জন্যই শাস্ত্র ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। এই জন্যই স্ত্রীজাতি ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি ও উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন ঃ—

যে কুলে ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং ভার্য্যাও ভর্ত্তার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। সন্তোষই কল্যাণের একমাত্র মূল কারণ। পতির ধনাভাব হেতু পতি যদি উচ্চ অট্টা-লিকায় বাস করিতে না পারেন, তথাপি সাধ্বী পত্নী নির্ধন

পতির সহিত পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও এবং দিনান্তে শাকান্নমাত্র ভক্ষণ করিয়াও, মহাসন্তোষ অনুভব করিবে। কন্যার পিতা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যদি আপনাকে ধনী বলিয়া মনে করে, ধনমদে গর্ব্বিত হয় এবং নিজের কন্যাকে দরিদ্র জামাতার পর্ণকুটীরে না পাঠাইয়া নিজ অট্টালিকায় যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ঐ অসাধু পিতা দত্তাপহারী হইয়া মরণান্তে নরকে গমন করে। কন্যাকে জামাতার হস্তে সম্প্রদান করিলে ঐ কন্যাতে পিতার আর কোন স্বত্ব থাকে না; উহা জামাতার বস্তু হইয়া যায়। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—সম্প্রদানের পর কন্যা পরকীয় ধন হইয়া পড়ে। বিবাহের পর পতি পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে যাবজ্জীবন বাস করা স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। এই জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তলে লিখিত আছে ঃ—

"সধবা নারী সতীত্ব রক্ষা করিয়াও যদি যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করে, তথাপি জগতের ছিদ্রান্বেষী নরনারীগণ তাহার চরিত্র-বিষয়ে নানাপ্রকার সন্দেহ করিয়া থাকে; অতএব স্ত্রী পতির অপ্রিয়া হইলেও, পতি-গৃহে নানাবিধ কষ্ট সত্ত্বেও পতি-সমীপেই সর্ব্বদা বাস করিবে। কারণ, আত্মীয়-মিত্র-বান্ধবগণ পতি-সমীপেই সধবা নারীর সদা অবস্থিতি দেখিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা করেন।" স্বর্গ ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থির হইয়া পতি-গৃহে যাবজ্জীবন

বাস করিবার জন্য বেদ নববধূকে অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন। "যেন যাবজ্জীবন পতি-গৃহেই বাস করিতে পারি, পতি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেন অন্যত্র কুত্রাপি না যাই," পরমেশ্বরের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবার জন্য বেদ স্ত্রীজাতিকে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন।

স্ত্রী সদা প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী হইবে। কোন ভার্য্যার "মুখে মধু হৃদে বিষ" হেতু তিনি বাহিরে লোকাচার-রক্ষণার্থ প্রিয়বাদিনী বা মধুরভাষিণী হইয়া থাকেন। কোন ভার্য্যার অন্তরটি খুব পবিত্র হইলেও, দয়া, স্নেহ ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইলেও তিনি মুখরা, অপ্রিয়-বাদিনী, কোপনস্বভাবা, কটুভাষিণী ও কোলাহলরতা হওয়ায় পতির প্রিয়া বা প্রীতিপ্রদা হইতে পারেন না।

এই জন্য নীতিশাস্ত্র বলেন যে, জগতে এই ছয়টি বড়ই সুখকর। (১) সামান্য ব্যয়ের সহিত প্রচুর আয়, (২) সদা নীরোগ শরীর, (৩) প্রিয়া ভার্য্যা, (৪) প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, (৫) বশ্য পুত্র, ও (৬) অর্থকরী বিদ্যা। এ স্থলে ভার্য্যার প্রিয়াত্ব এবং প্রিয়বাদিনীত্ব এই দুইটি গুণকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রে ভার্য্যাকে পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী কহে। ভার্য্যাই উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ। অর্দ্ধা-ঙ্গিনী গৃহিণীর সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই পতির উচিত কার্য্য। অথর্ব্ব-বেদ (১৪ কাণ্ড, ২ অনু, ১৮ মন্ত্র) উপদেশ করিয়াছেন, "হে নারি! তুমি দেবর-ঘাতিনী ও

পতি-ঘাতিনী হইও না; পতি ও দেবরের মনে কদাপি পীড়া জন্মাইও না; সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিও এবং তাঁহাদিগের প্রতি হিতাচরণ করিও; গৃহস্থাশ্রমের গো, মহিষ, ছাগ, ঘোটক প্রভৃতি প্রতিপাল্য পশু ও পক্ষিগণের কল্যাণসাধন করিও; তাহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিও; তাহা হইলেই তুমি ঈশ্বরের কৃপায় বীর-প্রসবিনী হইবে; পুত্র-পৌত্রাদি-সম্পন্ন হইয়া সুখে দিনযাপন করিবে। তুমি পতি ও দেবরাদির মঙ্গলবিধায়িনী হইয়া গৃহস্থাশ্রমের অর্চ্চনীয় হোমাগ্নিকে আরাধনা করিও।" পুরাকালে পত্নী পতির সহিত বৈদিক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক একত্র বসিয়া হোম করিতেন।

স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম।

স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গতি ও আরাধ্য দেবতা। মনু বলিয়াছেন, "পতি কদাচার, কুস্বভাব, যথেচ্ছাচারী, বিদ্যাবুদ্ধি-বিহীন ও রূপগুণ-বিহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। স্ত্রীলোকের পতি ভিন্ন যজ্ঞ নাই, পতি ছাড়া অন্য ব্রত নাই, পতির সেবা করিলেই সমস্ত ব্রতের ফল লব্ধ হয়; পতির সেবা করিলেই উপবাসের ফল-লাভ হয়; পতির সেবা করিলেই নারী স্বর্গেও পূজনীয়া হয়েন।

পতিত্যাগিনী ও পতি-বিদ্বেষিণী নারীর সহিত সতী স্ত্রী বাক্যালাপ করিবে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পতির আদেশপালন করাই পত্নীর একমাত্র পরম ধর্ম্ম। যে গৃহে পতি ও পত্নী পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকূল থাকেন, কেহ কাহার প্রতিকূলতাচরণ করেন না, সে গৃহে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "গৃহবধূ সর্ব্বদা গৃহোপকরণ ও গৃহস্থিত বস্তুগুলিকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবে; রন্ধনাদি কার্য্যে সুনিপুণা হইবে; সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে হাস্যমুখে দিনযাপন করিবে; প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিবে না; প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর চরণে প্রণাম করিবে এবং পতির বশবর্ত্তিনী হইয়া সকল কার্য্য করিবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে নারী পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সদা ব্যাপৃতা, সদাচার-সম্পন্না এবং জিতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে সুযশ ও পর-কালে অনুপম উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েন। মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন, পত্নীই গৃহস্থাশ্রমের মূল-দেবতা। পত্নী যদি পতির বশবর্ত্তিনী হয়েন, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমের তুল্য মহাসুখকর স্থান আর কুত্রাপি নাই। এ আশ্রমের তুলনা নাই। পত্নী বশে থাকিলে এ আশ্রম স্বর্গ অপেক্ষাও সুখকর স্থান হইয়া উঠে। স্ত্রী যদি যথেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়ে এবং পতি যদি অত্যন্ত স্ত্রৈণতা ও অতি-প্রীতি-

বশতঃ প্রথমকাল হইতে ঐ স্ত্রীকে নিবারণ না করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী প্রথমে উপেক্ষিত রোগের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পশ্চাৎ অবশ্যা হইয়া মহাক্লেশদায়িনী হয়।

যে স্ত্রী সদা পতির অনুকূল আচরণ করেন, যিনি কর্কশভাষিণী না হইয়া সদা মধুরভাষিণী হয়েন, স্বধর্ম্ম-রক্ষায় সদা ব্যাপৃতা থাকেন এবং পতির প্রতি অকপট ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি নারী নহেন, তিনি দেবতা।”

এই মানুষই দেবত্ব-গুণসম্পন্ন হইলেই দেবতা বলিয়া কথিত হয় এবং পশুত্ব-গুণসম্পন্ন হইলেই পশু বলিয়া আখ্যাত হয়।

মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন, “যে পুরুষের পত্নী অনুকূলা ও বশ্যা, তাহার ইহলোকেই স্বর্গসুখভোগ হয় এবং যাহার পত্নী প্রতিকূলা ও অবশ্যা, তাহার ইহলোকেই নরক-ভোগ হয়। সুখ-ভোগের নিমিত্তই লোকে গৃহস্থাশ্রমে বাস করে। গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল-কারণ। যে পত্নী বিনীতা, স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তিনী, সুখশান্তিদায়িনী এবং বশ্যা, তিনিই যথার্থ পত্নীপদবাচ্যা হয়েন।

পতি দরিদ্র ও রোগার্ত্ত হইলে যে পত্নী তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং তাঁহার সেবা করে না, সে পত্নী জন্ম-জন্মান্তরে গৃধ্রী, কুক্কুরী বা মকরী হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।”

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, "পত্নী কদাপি পতিবাক্য লঙ্ঘন করিবে না। পতিবাক্য-পালনই পত্নীর পরম ধর্ম্ম, একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র দেবার্চ্চনা। পত্নী সদা পতিবাক্য পালন করিবে।

পতি কাপুরুষই হউন্ আর দরিদ্রই হউন্, বৃদ্ধই হউন বা রোগগ্রস্ত হউন্, সুসময়স্থ হউন্ বা দুঃসময়স্থ হউন্ না কেন, পত্নী পতিকে কদাপি উপেক্ষা করিবে না।

অকপট ও পবিত্রহৃদয়া স্ত্রী, পতি হৃষ্ট হইলে হৃষ্টা হয়েন; পতি কোন কারণবশতঃ বিষণ্ণ-বদন হইলে নিজেও বিষণ্ণ-বদনা হয়েন। সাধ্বী স্ত্রী পতির সম্পদেও অনুগতা এবং বিপদেও অনুগতা হইয়া পতির সুখে সুখিনী এবং দুঃখে দুঃখিনী হয়েন।

পতির সেবা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল-লাভ হয়। পতির সেবা করিলে গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, দেবালয়ে গমন ও পুরাণ-পাঠ-শ্রবণাদি পুণ্যকার্য্যের ফললাভ হয়। যদি কোন নারী গঙ্গাস্নান করিতে বা কোন তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিয়া গঙ্গাতীরে কিংবা কোন তীর্থক্ষেত্রে বা কোন দেবালয়ে অথবা দেবী-মন্দিরে যাইতে হইবে না; যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। কারণ, গৃহে পতির পাদোদক পান করিলেই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে স্নানের ফললাভ হয় এবং কাশী, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন,

মথুরা প্রভৃতি তীর্থ-দর্শনের ফললাভ হয়। কারণ, পতি শিব ও বিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ। পতির পাদোদক পান করিলে শিব ও বিষ্ণু-দর্শনের ফললাভ হয়।

পতির আজ্ঞা বিনা যে নারী কোন ব্রত ও উপবাস করে, সে নারী পতির আয়ুক্ষয় করে এবং মরণান্তে নরকে গমন করে। পতিব্রতা নারী গৃহে ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল, ইন্ধন প্রভৃতি বস্তু ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই সেই সেই বস্তুর অভাব পতিকে জানাইবে। একেবারে ফুরাইয়া যাইবার পর মুহুর্মুহুঃ "এটা নাই, ওটা নাই" এইরূপ বলিয়া স্বামীকে উদ্বেজিত করিবে না। পত্নী নিজের উত্তম বস্ত্র-অলঙ্কার পরিধানের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য পতিকে কোন ক্লেশকর কার্য্যে নিয়োজিত করিবে না। যে নারী পতির আহ্বানে অকারণ ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশ-স্বরে উত্তর দান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য কুক্কুরী বা বন্য শৃগালী হয়।

পতির চরণ পূজা করিয়া, পতি-চরণে প্রণাম করিয়া সতী স্ত্রী পতিকে অগ্রে ভোজন করাইবে। পতিকে মহাযত্নের সহিত ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ নিজে ভোজন করিবে। "পতির আহারান্তে ভোজন করাই সাধ্বী স্ত্রীর অবশ্য পালনীয় প্রাচীন সদাচার," এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়ের সহিত সাধ্বী স্ত্রী পতি-সেবায় রত থাকিবে।

কোন নারীর গুরুজন নীচাসনে বসিলে সেই নারী কখনও উচ্চাসনে বসিবে না। কোন নারী নিজের উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে সদা নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ পর-গৃহে গমন করিবে না। ভদ্রবংশীয়া নারী লজ্জাজনক অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে না।"

প্রাচীন মহর্ষিগণ মহিলাদিগকে লজ্জাশীলা হইবার জন্য এবং গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন। ভদ্র-মহিলার পরগৃহে গমন শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ভারতে আর্য্য-মহিলারা অতি প্রাচীন-কাল হইতেই লজ্জাশীলা ও সাবরণা ("পর্দ্দানসীন্")। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জন্য শাস্ত্রে "অসূর্য্যম্পশ্যা" এই বিশেষণ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন।

"যে দুষ্টবুদ্ধি নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন-ভাবে আত্মীয়গণের দৃষ্টির অন্তরালে নির্জন প্রদেশে গোপনে একাকিনী বিচরণ করে, সে পরজন্মে উলূকী (পেঁচা) হইয়া বৃক্ষকোটরে বাস করিবে।

যে নারী নিজের দোষবশতঃ পতি কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত বা তাড়িত হইয়া পতিকে ভর্ৎসনা বা তাড়না করিতে ইচ্ছুক বা উদ্যত হয়, সে পরজন্মে ব্যাঘ্রী বা বিড়ালী হয়; যে নারী গোপনে পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে পরজন্মে কেকরাক্ষী ("টেরাচোখো") হয়। যে নারী

পতির দৃষ্টির অন্তরালে পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে পরজন্মে কাণা, কুৎসিতমুখী ও কুরূপা হয়।

যে নারী পতিকে মিষ্টান্নাদি উত্তম বস্তু প্রদান না করিয়া নিজেই উহা গোপনে ভক্ষণ করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য শূকরী হয় কিংবা নিজ বিষ্ঠাভোজী বাদুড় হয়।

যে নারী স্বামীকে বাহির হইতে গৃহে সমাগত দেখিবামাত্র শীঘ্র পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন করে, তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য খাদ্য বস্তু আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দেয়, তাঁহার ভোজনের পর তাঁহাকে তাম্বুল প্রদান করিয়া ব্যজন ও পদসেবা করে এবং ক্লান্তিনাশক শান্তিদায়ক সুমধুর অমৃতময় বচনে তাঁহাকে স্নিগ্ধ, সুশীতল ও প্রীত করে, সে নারী স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালকেও প্রীত করে। লোকে ও শাস্ত্রে ঈদৃশী নারীকেই পতিব্রতা ও সতী কহে।”

কেবলমাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর সাবিত্রী-ব্রত করিলেই সতী হয় না। “পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দেবর, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি সকলে পরিমিত সুখদান করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু পতি স্বর্গীয় সুখসম অপূর্ব্ব অনুপম পবিত্রতম সুখদান করেন বলিয়া ভার্য্যা পতিকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করিবে। পতিই পত্নীর একমাত্র দেবতা। পতিই পত্নীর একমাত্র গুরু। পতি ছাড়া পত্নীর অন্য কোন গুরুই নাই। সতী স্ত্রীর পতিই একমাত্র ধর্ম্ম, একমাত্র তীর্থ ও

একমাত্র ব্রত; সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীর স্বতন্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রত-পরিপালন এবং তীর্থ বা দেবালয়-দর্শন নিষ্প্রয়োজন। সতী স্ত্রী এ জগতে সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পতিকেই পূজা করিবে।

পতি দরিদ্র হইলেও, রোগার্ত্ত হইলেও অথবা কার্য্য-বশতঃ পথভ্রমণ ও রাত্রি-জাগরণাদি নিবন্ধন দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া গেলেও যে নারী পতিকে পুত্রের ন্যায় অতিশয় যত্ন, স্নেহ ও সমাদর করে, শাস্ত্রে তাহাকেই সতী পতিব্রতা কহে।"

ব্যাস-সংহিতায় লিখিত আছে:—"স্ত্রীলোক প্রত্যূষে পতির উঠিবার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া শয্যাদ্রব্য যথা-স্থানে তুলিয়া রাখিবে; পরে শৌচকৃত্য সমাপ্ত করিবে; তৎপরে জল-মিশ্রিত গোময় দ্বারা গৃহে "গোবর-ছড়া" দিবে; তৎপরে রন্ধনোপযোগী ধৌত পাত্র সকল পুনরায় ধৌত করিবে, পাকশালার সমস্ত পাত্র প্রতিদিন বাহিরে আনিয়া উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিবে; পরে মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা চুল্লী সংস্কৃত করিবে; তৎপরে স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে; তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ধৌত পাত্রগুলি জল ও তণ্ডুলাদি-পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিবে; তৎপরে চুল্লীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে; শিল-লোড়া, হাঁড়ী-সরা, হামান্-দিস্তা, উদূখল, মুসল প্রভৃতি যুগ্ম বস্তুগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে

সন্নিবেশিত করিবে। এইরূপে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সকল সমাধা করিয়া শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিবে এবং কায়মনোবাক্যে স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া সদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবে। পরে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্নে অগ্রে শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও পতিপুত্র প্রভৃতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ নিজে ভোজন করিবে। এই প্রকারে যে নারী পতিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত পতির সেবা করেন, সেই নারীই ইহলোকে পবিত্রকীর্ত্তি ও কল্যাণ-রাশি ভোগ করিয়া পরকালে পতির সহিত এক পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নারী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না; কাহারও সহিত কঠোর এবং অধিক কথা কহিবে না; স্বামীকে অপ্রিয় বাক্য বলিবে না; কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না; কাহারও সম্মুখে বিলাপ, শোক বা অনুতাপ করিবে না; বিলাপ বা শোক-অনুতাপাদির কারণ উপস্থিত হইলে নিজের মনে মনেই বিলাপাদি করিবে।

গৃহিণী অতি ব্যয়শীলা হইবে না, কৃপণাও হইবে না; ন্যায্য ব্যয় করিবে। স্বামী কোন একটি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইলে তাহাতে বাধা দিবে না; প্রমাদ, উন্মাদ, ক্রোধ, খলতা, হিংসা, পরদোষচর্চ্চা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, অতি সাহস এবং চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ

করিবে ; কাহাকেও বঞ্চনা করিবে না ; 'আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা অতিশয় রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্' এইরূপ বলিয়া কাহারও নিকটে গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না।"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে লিখিত আছে, "পতিকুলে পতির নিকটে দাস্যবৃত্তি করিয়া কষ্টে দিনযাপন করাও ভাল, কিন্তু পতি পরিত্যাগ করিয়া পিতৃকুলে, মাতুল-কুলে কিংবা অন্য আত্মীয়-কুলে সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হইয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা পাপানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য "

যে পিতা উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমান থাকিতেও বৃদ্ধাবস্থায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন এবং নিজের কন্যার শ্বশুরালয়ঘটিত সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া ঐ কন্যাকে স্বগৃহে পুষিয়া রাখেন এবং বলেন যে, "আমার যদি একমুষ্টি অন্ন জোটে, তাহা হইলে আমার মেয়েও খাইতে পাইবে," এই বলিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবতী স্ত্রীর সহিত স্বয়ং মহানন্দে জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিন যাপন করেন, কিন্তু কন্যার পতিবিরহজনিত কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করেন না, তাদৃশ পিতা মহাপাপী। কারণ, কন্যাকে একমুষ্টি অন্ন ও কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দান করিলেই কন্যার পতি-বিরহজনিত নরক-যন্ত্রণার অবসান হয় না। শৃগাল, কুক্কুর ও বিড়ালও একমুষ্টি অন্ন পাইয়া থাকে। যে পিতা অভিমানের ও "জেদের ডালি" মাথায় লইয়া কন্যার সর্ব্বনাশ-

সংসাধন করিতে পারে, তাদৃশ ব্যক্তির মুখদর্শন করাও পাপ। শত-সহস্র অন্নমুষ্টি ও রাশীকৃত বস্ত্রালঙ্কার দান করিলেও কন্যার তাদৃশী যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে না। ঈদৃশ পিতার সংসারে পড়িয়া ঐরূপ কন্যা যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে থাকে। কিন্তু যদি ঐ কন্যা কুমারী-অবস্থায় পতিভক্তি সম্বন্ধে সুশিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইত এবং তাদৃক্ সুশিক্ষা-লাভ-জনিত সদ্গুণরাশিতে ভূষিত হইত, তাহা হইলে ঐরূপ দুষ্টাভিসন্ধি পিতা বা পিতৃব্যের কুচক্রে পড়িয়া সে কদাপি ঘূর্ণ্যমান হইত না এবং তাদৃশ কষ্টও পাইত না। পতিভক্তিবিষয়িণী সুশিক্ষা লাভ করিলে ঐ কন্যা শ্বশুরালয়ের যে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়াও পতিকে সন্তুষ্ট রাখিয়া পরমানন্দে পতিকুলে দিনযাপন করিতে পারিত। সুতরাং সুশিক্ষাই সকল সুখের মূল। সুশিক্ষাই সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণার অবসানের একমাত্র উপায়। অতি প্রাচীনকালে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আর্য্য-মহিলাগণ কিরূপ সুশিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা জানিতে হইলে ইতিহাস, পুরাণ, সংহিতা ও কাব্য-নাটকাদি শাস্ত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চাবিহীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, "স্ত্রীজাতি বিদ্যাভ্যাস করিলেই বিধবা হইয়া যায়।" আবার, এই বর্ত্তমান যুগেও এমন অনেক মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা

বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকের সধবাবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিবার সময় "শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী" এইরূপ লিখিতে হয় এবং বিধবাবস্থায় "শ্রীমত্যা অমুকীদেব্যা বা দাস্যা" এইরূপ নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। তাঁহাদের মতে শ্রীমতী ও দেবী বা দাসী এরূপ স্বাক্ষর সধবাবস্থা-সূচক এবং শ্রীমত্যা ও দেব্যা বা দাস্যা এইরূপ স্বাক্ষর স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থাসূচক। এইরূপ অদ্ভুত শাস্ত্রের উপযুক্ত টীকাকার আবার এই কথা বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্বাক্ষরবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে সধবা বিধবা হইয়া যায় এবং বিধবাও সধবা হইয়া পড়ে!! যে দেশে এরূপ স্বাধীন শাস্ত্রের রচনা ও তাহার অদ্ভুত টীকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে দেশের স্ত্রীশিক্ষায় যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

পণ্ডিতগণ হয় তো প্রতিবাদচ্ছলে বলিবেন, এ কিরূপ অদ্ভুত বিধি? শ্রীমতী ও দেবী ইহার অর্থ শ্রীমতী দেবী স্বয়ং। লিখিতেছেন বলিতেছেন ইত্যাদিরূপ ক্রিয়াপদের কর্ত্তৃপদ। আর শ্রীমত্যা দেব্যাঃ, ইহার অর্থ শ্রীমতী দেবীর। ইহা সম্বন্ধবাচক পদ। ইহাতে সধবা-বিধবার কথা আসিল কিরূপে? এখানে সধবা-বিধবার কথা কোন প্রকারেই আসিতে পারে না। কারণ, কোন একটি স্ত্রীলোক যদি একখানি পত্র লিখিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীমতী সুশীলা দেবী এইরূপ নাম স্বাক্ষর করে, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে

যে, ইহা কর্ত্তৃপদ। এই পত্রখানি লিখিতেছেন বা পূর্ব্ব-লিখিত বিষয়গুলি নিবেদন করিতেছেন, এইরূপ ক্রিয়াপদ তথায় উহ্য। অর্থাৎ এইরূপ ক্রিয়াপদ তথায় বুঝিয়া লইতে হইবে। কারণ, পত্রে লিখিত বিষয়গুলির সহিত নিম্নলিখিত শ্রীমতী সুশীলা দেবী, এই নামের একটা কিছু অর্থসম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। পরস্পর অসংবদ্ধ পদ-প্রয়োগ শিষ্টসম্মত নহে। পক্ষান্তরে, যদি পত্রশেষে নিম্নে ঐরূপ একটি নাম লিখিত না হয়, কিন্তু পত্রে লিখিতব্য বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে "সবিনয়-নমস্কার-নিবেদন" এইরূপ প্রাচীন লিখন-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে নিম্নে শ্রীমত্যা সুশীলাদেব্যাঃ, এইরূপ নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। কারণ, ঐ পত্রের সর্ব্বপ্রথমে যে "সবিনয়-নমস্কার-নিবেদন" এই কথাটি লিখিত হইয়াছে, এই সবিনয়-নমস্কার-নিবেদনটি কাহার? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই সর্ব্বশেষে লিখিতে হয়—"শ্রীমত্যা সুশীলাদেব্যাঃ", অর্থাৎ ঐরূপ নিবেদনটি শ্রীমতী সুশীলা দেবীর। সুশীলা একটি স্ত্রীলিঙ্গান্ত পদ; একটি স্ত্রীলোকের নাম। শ্রীমতী ও দেবী বা দাসী এই দুইটি পদ উহার বিশেষণ। আর শ্রীমত্যাঃ ও দেব্যাঃ এই দুইটি সম্বন্ধবাচক ষষ্ঠ্যন্ত পদ। ইহার অর্থ শ্রীমতী সুশীলা দেবীর। একটির অর্থ সুশীলা দেবী, অন্যটির অর্থ সুশীলা দেবীর। ইহাতে সধবা-বিধবার কথা যে কোথা হইতে আসিল, তাহা সর্ব্ববিধ বাক্যের

অধিষ্ঠাত্রী ৺সরস্বতী দেবতার সমগ্র ভাণ্ডারে অন্বেষণ করিলেও জানা অসম্ভব। প্রাচীন সুসভ্য সুশিক্ষার আকর ভারতভূমির যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, ঈদৃশ স্বাধীন শাস্ত্র-রচনানৈপুণ্যই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ।

যাহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাহারা তাহাদের সনাতন বেদের বিরোধী। তাহারা আর্য্য-সন্তান বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাহাদের অমূল্যধন বেদের বহু মন্ত্র তাহাদের দেশের কতিপয় মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। সামান্য লৌকিক শাস্ত্র-রচনার কথা ত' দূরের কথা, ভারতে মহিলাজাতি বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত সংকলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সংকলিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া কত শত শত পুরুষ মহর্ষি কৃত-কৃতা ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যে দেশে বেদ-উপনিষদের পঠন-পাঠন-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, যে দেশে কেবল ব্যাকরণ, নব্যস্মৃতি ও নব্য ন্যায়চর্চ্চায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও বেদের জ্ঞানকাণ্ড পণ্ড হইয়াছে এবং প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্র-পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে ও পরমেশ্বরের ভক্তি-জ্ঞান-মার্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে দেশের লোক যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিল চক্রে পড়িয়া লোক যে কিরূপে ঘূর্ণিত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস স্বীয়

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বদেশে কালপ্রভাবে অতি উন্নতির পথে সমারূঢ় জাতিও অতল পাতালগর্ভে বিলীন হইয়া যায় এবং পক্ষান্তরে, অপক্কমাংসভোজী, বল্কলপরিধায়ী, ভীষণজন্তুপূর্ণ অরণ্য ও গিরিগহ্বরনিবাসী, প্রকৃতধর্ম্ম-জ্ঞানবিহীন বর্ব্বর, অসভ্য ও অনার্য্য জাতিও সমৃদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হয় ও আপনাদিগকে আর্য্য-জাতি-মধ্যে পরিগণিত করিয়া লয়। কালিদাস দেখাইয়াছেন যে, মানুষের কথা তো সামান্য কথা, সর্ব্বোপরিস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্যদেবতারও কালপ্রভাবে উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে। যে চন্দ্রদেব শস্যাদিপদার্থের রসসঞ্চার জীবন-রক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন করেন এবং সুশীতল শুভ্রকিরণ দ্বারা জগতের অন্ধকাররাশি নাশ করিয়া জগৎকে স্নিগ্ধ, প্রীত ও আলোকিত করেন, জগতের ঈদৃশ মহোপকারী চন্দ্রদেবও রাত্রি শেষ হইলে অস্তমিত হইয়া যান। তিনি অস্তমিত হইলে পর সূর্য্যদেব অত্যুচ্চ আকাশমার্গে উদিত হয়েন। যাঁহার প্রভাবে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্লোক পরি-চালিত হয়, যাঁহার প্রখর কিরণে অন্ধকাররাশি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, জগতের নানা উপকার সাধিত হয় এবং যিনি সমুদ্র, নদনদী ও পুষ্করিণীর জল আকর্ষণ করিয়া আকাশমার্গে লইয়া গেলে যাঁহার সাহায্যে মেঘের সৃষ্টি হয় ও সেই মেঘ হইতে পৃথিবীতে জলবর্ষণ হইলে নানাবিধ

শস্য-ফলমূলাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া যিনি জগতের প্রাণিগণের প্রাণরক্ষা করিয়া মহোপকারসাধন করেন, ঈদৃশ মহাপ্রভাব মহোপকারী সূর্য্যদেবও সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অস্তমিত হইয়া যান।

এই চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতার কালপ্রভাবে উত্থান-পতন দেখাইয়া ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিদিনই এই শিক্ষা দিতেছেন যে, ঈদৃশ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্যজাতিরও কালপ্রভাবে উত্থান ও পতন ঘটিয়া থাকে। যে ভারতের আর্য্য-মহিলাগণ একদা বেদের মন্ত্রসংকলন পর্য্যন্ত মহা-ব্যাপার সংসাধন করিয়াছিলেন, অধুনা সেই ভারতের আর্য্যনারী ঘোর অধার্ম্মিক, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই ভারতের অশিক্ষিত সেই বৈদিক নারীগণের আধুনিক সন্তানগণ নূতন শাস্ত্র রচনা করিতে-ছেন আর বলিতেছেন যে, "স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হয় এবং বিধবা হইলেই 'শ্রীমত্যা সুশীলাদেব্যাঃ' এইরূপ স্বাক্ষর করিতে হয়"!! এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তির বিস্মিত হওয়া বৃথা। কারণ, যুগধর্ম্ম-মাহাত্ম্যেই এইরূপ পরিবর্ত্তন এই পৃথিবীতে বহুবার ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। যে ভারতের স্ত্রীজাতি একদা বেদের মন্ত্র সংকলন করিয়াছিলেন, উপনিষদের গভীর তাৎপর্য্য বুঝিয়া বিচারশক্তি দ্বারা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকেও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, জ্ঞানিকুল-শিরোমণি রাজর্ষি

জনককেও বিস্মিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপ্রভাবে রাম ও লক্ষ্মণেরও একদা অন্বেষণীয়া হইয়াছিলেন এবং মহর্ষি পাণিনি ও ভাষ্যকার পাতঞ্জলির নিকট হইতেও ব্যাকরণ-পাণ্ডিত্য-সূচক নানাবিধ উপাধি ও বিশেষণ লাভ করিয়াছিলেন, অধুনা সেই মহিলাজাতির শিক্ষার ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি বিধবা হইবার ভয় দেখাইয়া অনেক মহিলাকে শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিতেছে; অধিকন্তু নূতন নূতন অদ্ভুত শাস্ত্রবাক্য রচনা করিয়া সমাজের অনিষ্টসাধন করিতেছে। কিন্তু আর্য্যদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হেমাদ্রিগ্রন্থ * উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নারীজাতি সধবা বা বিধবা হইবার পূর্ব্বেই কুমারী-অবস্থায় বিদ্যালাভ করিবে। তাহাদিগকে কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, ধর্ম্ম ও নীতি-বিদ্যা শিক্ষা দিবে। কুরুচিকর নাটক "নভেল" "টপ্পা" না শিখাইয়া ও অসার গল্প-পুস্তক না পড়াইয়া স্ত্রীধর্ম্মজীবন-সংগঠনের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবে। সীতা, সাবিত্রী,

---

* কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধি গচ্ছতি
ততো বরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মনীষিভিঃ।
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাং অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যামজ্ঞাতধর্ম্মসাধনম্॥

দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, দাক্ষায়ণী, অরুন্ধতী, মদালসা প্রভৃতি পবিত্র-চরিত্রা মহিলাকুলললামভূতা দেবীদিগের কথা যে সকল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইবে। সেই সকল পুস্তক পড়িলে পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া মহিলাগণ পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে। যে কুমারী বিদ্যালাভ করে, সেই কুমারীই উভয় কুলের কল্যাণদায়িনী হইতে পারে। শুদ্ধ কেবলমাত্র "ধোপার খাতা" ও বিবাহের পর বিদেশস্থিত পতির নিকটে প্রেমপত্র লিখিবার জন্য কুমারীগণকে শিক্ষা দিতে শাস্ত্র কখনও অনুমোদন করেন না। যখন ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রে কুমারী সুশিক্ষিতা হইবে, তখন এক বিদ্বান্ বরের করে তাহাকে সমর্পণ করিবে। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নববিধ কুল-লক্ষণবর্জ্জিত অথচ কুলীন-পদবাচ্য বরকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পিতা কন্যার পবিত্র জীবনের সর্ব্বনাশসংসাধন করিবে না, ইহাই হেমাদ্রির শ্লোকগুলির ভাবার্থ। ইহা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তক "বক্তৃতাবাগীশ"দিগের কথা নয়। হেমাদ্রি বলিতেছেন, ইহা অতি প্রাচীন আর্য্য-মহর্ষিদিগের প্রদর্শিত নিষ্কণ্টক সুপ্রশস্ত পথ। এই পথের গৌরব

পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চরবে বিঘোষিত হইয়াছে। যে কুমারী পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা জানে না, কিরূপে পতির মর্য্যাদারক্ষা করিতে হয়, তাহা শিখে নাই, পতিকে কিরূপে সেবা করিতে হয়, তাহা পড়ে নাই, তাদৃশী কন্যাকে তাহার পিতা কখনই বিবাহ দিবে না, ইহাই হেমাদ্রির উপদেশ।

সীতা যেরূপ রামের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পতির অনুবর্ত্তিনী হইবে। সীতার শ্বশুর সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ দশরথ। তাঁহার পিতাও মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক। এই উভয় রাজকুলে নানাবিধ উত্তমোত্তম খাদ্য, বস্ত্র, মহামূল্য অলঙ্কার, শত শত দাসদাসী ও দুগ্ধফেননিভ শয্যা-আসনাদি মহাসুখকর বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া সীতা ভীষণ জন্তুপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, খাদ্যপেয়াদিবর্জিত, নিবিড় অরণ্যমধ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে দুঃখিনী হইবার জন্য পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাম যখন গভীর অরণ্যানীমধ্যে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন এবং কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া যখন শান্তিসুখ অনুভব করিতেন, তখন সাধ্বী সীতাদেবীও পতির সহিত অনুপম শান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। রামের বনগমনসময়ে তিনি রামের সহিত না গিয়া যদি তাঁহার পিতা মহারাজ জনকের আলয়ে গমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন ক্লেশই হইত না। মহারাজ

জনক অতি যত্ন ও সমাদরের সহিত নিজ কন্যাকে অবশ্য প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু তিনি তথায় না গিয়া স্বামীর সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত বনবাসের জন্য স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রগাঢ় পতিভক্তির কথা যে সকল পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সেই সকল গ্রন্থ না পড়াইয়া কোন পিতা নিজ কন্যার বিবাহ যেন না দেন, ইহাই হেমাদ্রি গ্রন্থের পরম হিতোপদেশ। আবার মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রও বলিয়াছেন,—কন্যার লালন-পালন করা যেমন পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্রূপ অতিশয় যত্ন-পূর্ব্বক কন্যাকে শিক্ষা দেওয়াও পিতার অত্যন্ত উচিত কার্য্য। কন্যাকে ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া একটি বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে। পাত্রী যদি বিদুষী হয় আর পাত্রটি যদি বিদ্বান্ না হয়, তাহা হইলে উভয়ের পরস্পর মনের মিলন হয় না, সংসারে শান্তি-রসের অনুভব হয় না। সেই জন্য বিদুষী পাত্রীকে বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার বিধি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা।

পূর্ব্বকালে ভারতের আর্য্য-মহিলাগণ বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত সংকলন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে মন্ত্রগুলি সংকলন করিয়াছিলেন, সেই সেই মন্ত্র "তাঁহাদের মন্ত্র" এই বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্তটি অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্য-মহিলাকর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে। তাহার প্রথম মন্ত্রের অর্থ এই যে, অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত শিখা-বিস্তার পূর্ব্বক প্রখরভাব ধারণ করিয়াছে। ঊষাকালে প্রশস্ত শিখা-বিস্তার করিয়া অগ্নি সাতিশয় শোভান্বিত হইয়াছে। এই সময়ে ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা হোম করিবার জন্য ঘৃতাধার পাত্র হস্তে লইয়া বৈদিক মন্ত্র-গানে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্তব করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে ঈদৃশ প্রজ্বলিত শোভমান অগ্নির নিকটে গমন করিতেছেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অগ্নে, উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতের উপরে আধিপত্য বিস্তার কর। তুমি হোতার মঙ্গলের জন্য তাঁহার সমীপে বিদ্যমান থাক। তুমি যে যজমানের নিকট উপস্থিত হও, সে যজমান সমগ্র ধনলাভে সমর্থ হয়েন, তোমার মত প্রধান অতিথির প্রাপ্য

ঘৃতাদি উত্তম দ্রব্য প্রদান করেন। তোমার ন্যায় উপকারী অতিথিকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অগ্নে, আমাদের সৌভাগ্যসংবর্দ্ধনের জন্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার কৃপায় আমরা যেন ধনবান্ হই। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর। তোমার তেজঃসম্পত্তি আরও উৎকৃষ্ট হউক্। তুমি এ জগতে পতি ও পত্নীর পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমকে অতি প্রগাঢ় করিয়া দাও। তোমার আশীর্ব্বাদে দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধির চরম সীমা লাভ করুক। পতি ও পত্নীর কদাপি যেন পরস্পর বিচ্ছেদ না হয়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে বিশ্ববারা সকলকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেছেন যে, যজ্ঞে ঘৃতবাহক অগ্নিতে হোম কর। অগ্নির সেবায় রত থাক। দেবগণের নিকটে ঘৃত বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্নিকে বরণ কর।

ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্ত কাক্ষীবানের কন্যা ঘোষানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। ৪০ সূক্তের নবম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদের অনুগ্রহে

ও আশীর্ব্বাদে ঘোষা স্ত্রীজনোচিত গুণসমূহে ভূষিত হইয়াছে ও সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। ঘোষাকে বিবাহ করিবার জন্য পাত্রীকামী বর ইহার নিকটে আগমন করুক, ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য ইহাকে দেখিতে আসুক। আপনারা ইহার ভাবী পতির হিতার্থে আকাশ হইতে প্রচুর বারি বর্ষণ করিবেন। ইহার ভাবী পতির হিতার্থে প্রভূত পরিমাণে শস্য-সমূহ যেন উৎপন্ন হয়। ইহার ভাবী পতির মঙ্গলের জন্য ভবৎপ্রেরিত বারিধারা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে আকাশ হইতে ক্ষেত্রে পতিত হইবে, তদ্রূপ তৎপরিমাণে রাশি রাশি শস্যও যেন উৎপন্ন হয়। কোন শত্রু ইহার ভাবী পতির অনিষ্ট করিতে ও হিংসা করিতে যেন কদাপি সমর্থ না হয়। যুবা পতিকে লাভ করিয়া ঘোষার যৌবন যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। আপনাদের আশীর্ব্বাদে ঘোষা যেন চিরযৌবনা থাকে। দশম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এমন কি, রোদন পর্য্যন্ত করে এবং তাঁহাকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে ও পুত্রসন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত করে, তাদৃশী স্ত্রীই পতির আলিঙ্গনে সৌভাগ্যবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হইতে পারে।

ত্রয়োদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমি আপনাদিগকে সদা স্তব করিয়া থাকি। অতএব

আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতিভবনে ধনবল ও লোকবল বৰ্দ্ধিত করিয়া দিবেন। আমি যে ঘাটের জল পান করি, ঐ ঘাটের জল সুনির্ম্মল করিয়া দিবেন। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় ব্যক্তি বিঘ্ন উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিবেন। ৩৯ সূক্তে চতুর্দ্দশটি মন্ত্র আছে।

প্রথম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদিগের যে বিশ্বসঞ্চারী রথ আছে, উত্তমরূপে সম্বোধন পূর্ব্বক যে রথকে আহ্বান করা যাজ্ঞিক ব্যক্তির দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমরা সর্ব্বদা সেই রথের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকি। মানব পিতৃ-নামোচ্চারণে যাদৃক্ আনন্দ লাভ করে, তদ্রূপ আপনাদের ঐ রথের নামে আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমাদিগকে সুমধুর বাক্য উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করুন। আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের সমস্ত শুভক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হউক্। আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার সুবুদ্ধি উদিত হউক্, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা। আমাদিগকে প্রশংসনীয় ধনভাগ প্রদান করুন। যজ্ঞে সোমরস যেরূপ আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনাদের কৃপায় আমরা যেন লোকের আনন্দ-বৰ্দ্ধক ও প্রীতিভাজন হইতে পারি। তৃতীয় মন্ত্রার্থ এই যে, একটি

কন্যা পিত্রালয়ে অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছিল। আপনারাই তাহার জন্য একটি সৌভাগ্যকর বর আনিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা অন্ধ, খঞ্জ, নিরাশ্রয়, রুগ্ন ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্বরূপ। রোরুদ্যমান অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন ব্যক্তিগণের সুনিপুণ চিকিৎসক বলিয়া আপনাদিগকে সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই যে, কোন একখানি রথ যখন পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন উহাকে পুনরায় উত্তম-রূপে নির্ম্মাণ করিলে উহা যেমন নূতনবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আপনারাই জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনরায় নব্য-যুবা পুরুষের ন্যায় সুন্দর সুগঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভুগ্রের তনয়কে নির্ব্বিঘ্নে জলোপরি বহন করিয়া তীরদেশে পার করিয়া দিয়াছিলেন। ভবৎ-সম্পাদিত এই সকল উত্তম কার্য্য যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ এই যে, আপনাদের বীরত্বসূচক পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল আমি লোক-সমাজে বর্ণনা করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত আপনাদের আর একটি প্রশংসার কথা এই যে, আপনারা সুনিপুণ চিকিৎসক, স্বর্গের বৈদ্য। আপনাদের আশ্রয়-লাভার্থ আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ভক্তির সহিত স্তব করিতেছি। হে স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, আমি আশা করি; আমার এই স্তবকে যাজ্ঞিক ব্যক্তি অবশ্য আন্তরিক বিশ্বাসস্থাপন করিবে।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমার আহ্বান কর্ণগোচর করুন। পিতা পুত্ত্রকে যেরূপ শিক্ষাপ্রদান করে, তদ্রূপ আপনারা আমাকে সুশিক্ষা প্রদান করুন। আমার জ্ঞাতি কিম্বা কুটুম্ব কেহই নাই। আত্মীয়-মিত্র-বান্ধবাদি কেহ নাই। আমি জ্ঞানবুদ্ধিবিহীন। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, আমার যেন কদাপি কোন দুর্গতি না ঘটে। দুর্গতি ঘটিবার পূর্ব্বে দুর্গতির কারণগুলি যেন সমূলে উৎপাটিত হয়।

সপ্তম মন্ত্রের অর্থ এই যে, আপনারাই শুন্ধ্যুব-নাম্নী পুরুমিত্র-রাজার কন্যাকে রথোপরি অরোহণ করাইয়াছিলেন এবং বিমদের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বধ্রিমতী প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া যখন আপনাদের সাহায্য-প্রার্থিনী হইয়াছিল এবং আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে সুখে প্রসব করাইয়াছিলেন। আপনারা সুনিপুণ স্বর্গীয় চিকিৎসক।

অষ্টম মন্ত্রের অর্থ এই যে, কলি জরাজীর্ণ হইয়া যখন আপনাদিগকে স্তব করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে নবীন যুবাপুরুষ করিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা বন্দন-নামক ব্যক্তিকে কূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিশ্পলা-নাম্নী মহিলার চরণ ছিন্ন হইয়া গেলে

আপনারাই লৌহময় কৃত্রিম চরণ সংযোজিত করিয়া তাহাকে চলন-শক্তিশালিনী করিয়া দিয়াছিলেন।

নবম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অভীষ্টপ্রদ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, যখন শত্রুগণ রেভকে মৃতপ্রায় করিয়া গুহামধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনারাই তখন উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সপ্তবন্ধনে বদ্ধ অত্রিমুনি যখন জ্বলদগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনারাই সেই যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। আপনাদেরই অসীম প্রভাবে ঐ অগ্নিকুণ্ড ঝটিতি সুশীতল পাত্রে পরিণত হইয়াছিল।

দশম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদের নিকট হইতেই পেদু-নামক রাজা নবনবতি ঘোটকের সহিত একটি উত্তম সুদৃশ্য শুভ্রবর্ণ ঘোটক লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ঘোটকটিকে দেখিবামাত্রই শত্রুগণ পলায়ন করে। ঐ ঘোটকটি মানবের অমূল্য রত্ন-স্বরূপ। উহার নাম করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়।

একাদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, আপনাদের নামোচ্চারণ-মাত্রেই অতিশয় আনন্দ হয়। আপনারা যখন যে পথে গমন করেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই সকলে আপনাদিগকে বন্দনা করে। যদি সস্ত্রীক কোন ব্যক্তিকে আপনারা

নিজ রথোপরি উপবেশন করাইয়া আশ্রয়দানে সুখী করেন, তাহা হইলে ঐ সস্ত্রীক ব্যক্তির কোন বিপত্তি বা দুর্গতি ঘটে না।

দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভু-নামক দেবগণ দ্বারা আপনাদের যে রথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে রথ আকাশমার্গে উত্থিত হইলে আকাশ-কন্যা ঊষা-দেবীর আবির্ভাব হয় এবং সূর্য্যদেব হইতে দিন ও রজনী উৎপন্ন হয়, মন হইতেও অতি বেগশালী সেই রথে আরোহণ করিয়া আপনারা আগমন করুন।

ত্রয়োদশ মন্ত্রার্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা উক্ত রথোপরি আরোহণ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে গমন করুন। শয়ু-নামক ব্যক্তির বৃদ্ধা ধেনুকে পুনরায় দুগ্ধবতী করিয়া দিন। বৃকের করাল বদনের মধ্যে বর্ত্তিকা পতিত হইয়াছিল, আপনারাই উহার মুখের ভিতর হইতে ঐ বর্ত্তিকা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভৃগুসন্তানগণ যদ্রূপ রথ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ আমিও আপনাদের জন্য এই স্তুতি-মন্ত্রগুলি রচনা করিলাম। কন্যা-সম্প্রদান-কালে পিতা যেমন কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সমলঙ্কৃত করে, তদ্রূপ আমিও আপনাদের এই স্তুতি-মন্ত্রগুলিকে আপনাদিগের প্রশংসা দ্বারা অলঙ্কৃত করিলাম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে

আমার পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদি যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দিন-যাপন করে।

৪০ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, কৃশ ও শৈযুব-নামক দুইটি লোককে এবং একটি অসহায়া বিধবা নারীকে আপনারাই রক্ষা করিয়াছিলেন। যজমানদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ আপনারাই মেঘ-পটল বিদীর্ণ করেন এবং সেই বিদীর্ণ জলদরাশি শব্দ করিতে করিতে যেন সপ্তমুখ ব্যাদান করিয়া জলধারা বর্ষণ করে।

৪০ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অন্নধন-শালিন্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা আমার প্রতি কৃপাবিন্দু বর্ষণ করুন। আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করুন। আমার মঙ্গল করুন। আমার রক্ষক হউন। আমি যেন পতিগৃহে গমন করিয়া পতির প্রিয়পাত্রী হই, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ব্রহ্মবাদিনী সূর্য্যা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি সূর্য্যানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। ৮৫ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ এই যে, সূর্য্যার বিবাহ-সময়ে রৈভী-নাম্নী ঋক্-(মন্ত্র) গুলি সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল।

নরাশংসী-নাম্নী ঋক্-(মন্ত্র)গুলি তাঁহার দাসী হইয়াছিল। তাঁহার মনোহর বসনখানি যেন সামবেদের গান দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বিবাহ-সময়ে পাত্রীর সমবয়স্কা কয়েকটি সঙ্গিনী পাত্রীর চিত্ত-বিনোদনার্থ পাত্রীর সহচরী হইয়া থাকে। পতিগৃহে যাইবার সময় পাত্রীর সঙ্গে একটি দাসী যায়। বিবাহ-সময়ে পাত্রী পবিত্র উজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিধান করে। সূর্য্যার বিবাহ-সময়ে এই সকলের তত প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তিনি রৈভী ঋক্-(মন্ত্র) গুলিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তমরূপে সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে রৈভী-নামক মন্ত্রগুলি গান করিতে পারিতেন, উহাতে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রগুলিই তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য সহচরী বা সঙ্গিনীর কার্য্য করিত বলিয়া অন্য মানবী সহচরীর প্রয়োজন হয় নাই। নবোঢ়া বালিকা যখন পতিগৃহে যায়, তখন তথায় পতি ছাড়া সকলেই তাহার অপরিচিত। পতির সহিত পরিচয়ও সবেমাত্র একদিন পূর্ব্বেই হইয়াছে। অতএব অপরিচিত গৃহে তাহাকে উৎসাহিত ও আমোদিত করিবার জন্য তাহার পিত্রালয়ের একটি যত্ন-স্নেহকারিণী দাসী তাহার সহিত তাহার পতিগৃহে গমন করে। সূর্য্যার সহিত ঈদৃশী দাসী প্রেরণ করিবার কোন প্রয়োজনই হয় নাই। কারণ, সূর্য্যা নরাশংসী-নাম্নী ঋক্-(মন্ত্র) গুলিকে সম্পূর্ণরূপে

আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাহারাই তাঁহার অপরিচিত স্থানে তাঁহাকে উৎসাহিত, আমোদিত ও নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ ছিল। তিনি আধুনিক সাধারণ নবোঢ়া বালিকার ন্যায় অশিক্ষিতা ছিলেন না, সুতরাং পতিগৃহে পিতামাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতির বিরহজনিত দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার সুশিক্ষাগুণে পতিগৃহস্থ সমস্ত অপরিচিত লোক পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। বিবাহকালে পাত্রী উত্তম উজ্জ্বল পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। সূর্য্যার পবিত্র বস্ত্রখানি সূর্য্যার পবিত্র সুমধুর সাম-গানে যেন পবিত্রতর হইয়াছিল। তিনি সামবেদে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রতম মনোরঞ্জন সাম-গানে তাঁহার পবিত্র বস্ত্রখানি যেন রঞ্জিত হইয়া উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি সামান্য একখানি বস্ত্র পরিধান করিলেও মনোরঞ্জন পবিত্রতম সামবেদে তাঁহার অগাধ উজ্জ্বল জ্ঞান, তাঁহার বর্ণরঞ্জিত উজ্জ্বল পবিত্র পট্টবস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়াছিল।

সপ্তম মন্ত্রের অর্থ এই যে, পতিগৃহে আগমন-সময়ে সূর্য্যার সুগঠিত ধর্ম্ম-জীবনই বিবাহের পর জামাতৃগৃহে প্রেরণীয় দ্রব্য-সম্ভারস্বরূপ হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। তাঁহার সুস্নিগ্ধ সুপ্রশস্ত আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগলই তৈল-হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন স্নেহ-দ্রব্যস্বরূপ হইয়া যেন তাঁহার

সহিত চলিল। স্বর্গ ও পৃথিবী তাঁহার কোষ-পেটিকা-(ক্যাশ্‌বাক্স) স্বরূপ হইয়া যেন তাঁহার সহিত চলিল। এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, বিবাহের পর নবোঢ়া বালিকা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করে, তখন তাহাকে বসন ও ক্রীড়া-দ্রব্যাদি-পূর্ণ একটি পেটিকা (প্যাঁট্‌রা বা তোরঙ্গ) এবং ধন ও অলঙ্কারাদি-পূর্ণ একটি কোষ-পেটিকা (ক্যাশ্‌বাক্স) প্রদান করিতে হয়। বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে হিন্দু সমাজে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। কেহ বা একটি পেটিকাতেই সমস্ত প্রদেয় দ্রব্য দিয়া থাকে, কেহ বা পূর্ব্বোক্তরূপ দুইটি পেটিকা (বস্ত্রাদি দ্রব্যের পেটিকা ও কোষ-পেটিকা বা "ক্যাশ্‌বাক্স") প্রদান করে। কিন্তু সূর্য্যার বিবাহের পর পতিগৃহে যাইবার সময় তাঁহার সহিত এইরূপ ধন-পেটিকা প্রেরণের তাদৃক প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তিনি ঈদৃশী সুচরিত্রা, সুশিক্ষিতা ও গুণবতী ছিলেন যে, তাঁহার চরিত্র শিক্ষা ও সদ্‌গুণরাশির সুনির্ম্মল যশোরূপ ধন, স্বর্গে ও মর্ত্তে সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক, তাঁহার কোষাগারস্বরূপ হইয়াছিল। বিবাহের সময় পাত্রের গৃহে তৈল-হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন-দ্রব্য প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু সূর্য্যার বিবাহের সময় এরূপ বস্তু সকল প্রেরণ করিবার তাদৃশ প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তাঁহার সুস্নিগ্ধ,

মনোরম, সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত নয়নযুগল হইতে যেন স্বাভাবিক স্নেহধারা নিঃস্যন্দিত হইতেছিল।

তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্বাভাবিক সুস্নিগ্ধ, সুন্দর ও সমুজ্জ্বল ছিল। সুতরাং তৈলাদি স্নেহ-পদার্থে ও হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন-দ্রব্যে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কৃত্রিম স্নিগ্ধতা ও বর্ণের উজ্জ্বলতা সংবর্দ্ধন করিবার জন্য এই সকল দ্রব্য প্রেরণ করিবার তাদৃক্ প্রয়োজন হয় নাই। দশম মন্ত্রের অর্থ এই যে, বিবাহের পর পতিগৃহে গমনকালে তাঁহার সুপ্রশস্ত, সরল, উদার, নিষ্পাপ মনই তাঁহার যানস্বরূপ (গাড়ী, পাল্কী, ডুলি বা চতুর্দ্দোলা) হইয়াছিল। উপরিস্থ আকাশই এই যানের ঊর্দ্ধাচ্ছাদন-স্বরূপ হইয়াছিল। এইরূপে তিনি বিবাহের পর পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ত্রয়োবিংশতি মন্ত্রের অর্থ এই যে, আমাদের বন্ধুগণ বিবাহার্থ পাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য যে সকল পথে গমন করে, সেই সকল পথ যেন নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হয়। হে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, পতি ও পত্নী যেন দৃঢ়রূপে একটি প্রেমসূত্রে গ্রথিত হয়।

পঞ্চবিংশতি মন্ত্রের অর্থ এই যে, এই কন্যারূপ পবিত্র পুষ্পটিকে পিতৃকুলরূপ বৃক্ষ হইতে উত্তোলিত করিয়া পতির হস্তে গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে ইন্দ্রদেব, এই কন্যাটি যেন পতিগৃহে গিয়া সৌভাগ্যবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হয়, ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা। ষড়বিংশ মন্ত্রের অর্থ এই

যে, পূষা (দেবতা) তোমার হস্ত ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাউন। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে রথে আরোহণ করাইয়া পিতৃ-গৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাউন। তুমি পতিগৃহে গমন করিয়া প্রশংসনীয়া গৃহকর্ত্রী হও। তুমি পতিগৃহে সকলের প্রভু হইয়া শান্তস্বভাব, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সকলের উপরে প্রভুত্ব করিও। ঊনত্রিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে সৌভাগ্যবতি নারি, তুমি মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও। কদাপি মলিন বস্ত্র পরিধান করিও না। মলিন বস্ত্র পরিধান করা দারিদ্র্যের লক্ষণ। পরমেশ্বরকে যাহারা সর্ব্বদা উপাসনা করে, পূজা করে, স্তব করে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ধন দান করিও। হে হিতৈষিগণ, তোমরা সকলে দেখ, পত্নী পতির সহিত অভিন্নরূপা হইয়া কেমন শ্বশুরালয়ে যাইতেছে। দ্বাত্রিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, যাহারা অনিষ্টাচরণের জন্য এই দম্পতীর নিকটে আসিবে, তাহারা বিনষ্ট হউক্। এই দম্পতী যেন সদুপায় দ্বারা বিপত্তি-জালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে পারে। এই দম্পতীকে দেখিবামাত্র শত্রুগণ যেন দূরে পলায়ন করে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, এই নবপরিণীতা বধূ অতি সুলক্ষণ-সম্পন্না। তোমরা সকলে মিলিয়া আইস। এই বধূকে দেখ। এই বধূ সৌভাগ্যবতী হউন্। সমৃদ্ধিশালিনী হউন্। পতির প্রিয়পাত্রী

হউন্। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর।

ষট্‌ত্রিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধু, তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্ত ধারণ করিয়াছি। আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। আমার সহিত গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম আচরণ করিবার জন্য দেবতারা তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

দ্বিচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে দম্পতি, তোমরা দুই জন সদা একস্থানেই বাস করিও, কদাপি পরস্পর পৃথক্‌ভাবে বাস করিও না। দুই জনে মিলিয়া নানাবিধ সুখাদ্য বস্তু ভোজন করিও। নিজগৃহে বাস করিয়া পুত্র-পৌত্রাদির সহিত আমোদ-আহ্লাদে ক্রীড়া করিয়া দিন-যাপন করিও।

ত্রিচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, প্রজাপতির অনুগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে আমাদের উত্তম পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন হউক্। অর্য্যমা (দেবতা) আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত একত্র সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধু, তুমি কল্যাণভাগিনী হইয়া পতিগৃহে চিরকাল অবস্থিতি করিও। এক মুহূর্ত্তের জন্য পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইও না ও থাকিও না। দাসদাসী ও গোঘোটকাদি গৃহপাল্য পশুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তাহা-

দিগকে পুত্রনির্বিশেষে যত্ন করিও, প্রতিপালন করিও এবং তাহাদিগের কল্যাণসাধন করিও।

চতুশ্চত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধূ, তোমার নেত্রদ্বয় যেন নির্দ্দোষ হয়। তুমি পতির কল্যাণকারিণী হইও। বিশ্বাসপাত্রী হইও। তোমার মন যেন সদা প্রফুল্ল থাকে। তোমার শরীর যেন লাবণ্যপূর্ণ হয় ও উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। তুমি বীরপ্রসবিনী হইও। পরমেশ্বরে তোমার যেন অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে। গৃহের দাসদাসী ও পশুদিগের প্রতি সদা সদয় ব্যবহার করিও এবং তাহাদের কল্যাণ কামনা করিও।

পঞ্চচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে জলবর্ষিন্ ইন্দ্রদেব, আপনার কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে এই বধূর যেন উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মে এবং সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। ইহার গর্ভে যেন দশটি পুত্র জন্মে এবং ইহার পতিকে লইয়া এই বধূ যেন একাদশব্যক্তিমতী হয়।

ষট্‌চত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধূ, তুমি তোমার শ্বশুরালয়ের সম্রাজ্ঞী হইও। তুমি তোমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর প্রতি, ননদদিগের প্রতি এবং দেবরদিগের প্রতি সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হইও। অর্থাৎ কোন একটি সম্রাজ্ঞী যেমন কোটি কোটি প্রজার কল্যাণ করেন, মাতার ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন, সুবিচার, সুনীতি, সুব্যবস্থা ও সুশাসনগুণে প্রজা-

গণকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্ববশে রাখিয়া থাকেন, নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে সদা সর্ব্বত্র সুখশান্তি বর্দ্ধন করেন, তদ্রূপ তুমিও পতিকুলে গৃহকর্ত্রী হইয়া সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিও। সকলের প্রতি সুবিচার করিও। সকলের রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগিনী হইও। সকলের প্রতি সদয় উত্তম ব্যবহার করিও। সকলকে আধি-ব্যাধি প্রভৃতি বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিও। নিজগুণে সকলকে বশীভূত করিয়া রাখিও এবং গৃহরূপ তোমার একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে যাহাতে সর্ব্বদা সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবতী হইও, অবহেলা করিও না। "তুমি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির উপর সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হইও," ঋগ্‌বেদের এই কথার এইরূপ অর্থ যেন কেহ না বুঝেন যে, সম্রাজ্ঞী যেমন সিংহাসনে বসিয়া থাকেন ও রাজ্যের প্রধান প্রধান মাননীয় প্রজারা যেমন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া তিনবার প্রণাম করেন এবং তিনিও যেমন আদেশবাণী প্রচার করেন ও তাঁহারা যেমন উহা শিরোধার্য্য করেন, তদ্রূপ বধূ সর্ব্বদা "ইজি চেয়ারে" বসিয়া থাকিবেন এবং তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবনত-মস্তকে তাঁহাকে তিনবার প্রণাম করিবে ও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিবে, এইরূপ অর্থ কেহ যেন না বুঝেন।

সপ্তচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, ইন্দ্রাদিদেবগণ,

আমাদের (পতি ও পত্নীর) হৃদয় ও মনকে এক করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগেদবী আমাদিগকে উত্তমরূপে একত্র সম্মিলিত করিয়া রাখুন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তটি পুরূরবা-নামক পতি ও উর্ব্বশী-নাম্নী পত্নী কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ১৮টি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলি স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। গ্রন্থের কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া ঐগুলির অর্থ লিখিত হইল না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গল ঋষির পত্নী ইন্দ্রসেনা রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সহস্র শত্রু-জয়িনী হইয়াছিলেন এবং বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের হস্ত হইতে ধেনু সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে ও অসাধারণ বীরত্বের প্রভাবে তৎকালে বৈদিক যুগে ভারতের গোধন শত্রু-হস্তগত হইতে পারে নাই। গোধন যে কি অমূল্য বস্তু, তাহা বৈদিক যুগের আর্য্য-মহিলারাই বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়াও ভারতের গোধন-রক্ষার জন্য রথে চড়িয়া যুদ্ধ পর্য্যন্ত মহাকাণ্ড করিতে পারিতেন। তাঁহারা উত্তমোত্তম দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনীত ও ঘৃতের অভাব কখনই অনুভব করিতেন না। এই সকল উৎকৃষ্টতম বস্তু ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন এবং উত্তমরূপে

সাত্ত্বিকী বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে পারিতেন। অধুনা ঐ সকল বস্তুর নিকৃষ্টতা, অভাব ও মহার্ঘ্য বশতঃ নরনারী-গণ উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বুদ্ধিবৃত্তিও সাত্ত্বিক পথে পরিচালিত হয় না।

জুহু।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তটি বৃহস্পতির ভার্য্যা জুহু কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। এই সূক্তে ৭টি মন্ত্র আছে।

ইন্দ্রাণী।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তটি ইন্দ্রাণী-নাম্নী আর্য্যা-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৬টি মন্ত্র আছে। জগতে সপত্নী পীড়াদায়িকা হইয়া থাকে বলিয়া কাহারও যেন কদাপি সপত্নী না হয়, এইরূপ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই মন্ত্রগুলি সংকলন করিয়া-ছিলেন। অতি প্রাচীন সুসভ্যতার আকর ভারতভূমিতে শান্তিপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে সপত্নীর আবির্ভাব বৈদিকযুগে মহা অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এক স্ত্রী জীবিতা

থাকিতে দারান্তর পরিগ্রহ করা তৎকালে সভ্যসমাজের রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত এবং অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য বৈদিক মন্ত্রে সপত্নীর উচ্ছেদকামনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদ্যাপি অন্য সমাজ অপেক্ষা বঙ্গের বৈদিক সমাজে এই বহু-বিবাহরূপ কুরীতি প্রচলিত নাই। অদ্যাপি বৈদিক-শ্রেণীস্থ লোক সকল বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের তাঁহাদের বৈদিকযুগ-প্রচলিত সদাচার রক্ষা করিতেছেন। কলির প্রভাববৃদ্ধি ও ধর্ম্ম-হানির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কোন কোন সমাজে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, এক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের ১০৮টি পর্য্যন্ত বিবাহ শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ইহা মনে করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে!! ঘৃণার উদ্রেক হয়। কৌলীন্য শব্দের অর্থ দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে।

শচী।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তটি শচী-নাম্নী ব্রহ্ম-বাদিনী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছে। এই সূক্তে ৬টি মন্ত্র আছে। কাহারও যেন সপত্নী না হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য ঐ মন্ত্রগুলি সংকলিত হইয়াছে।

গোধা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রটি গোধা-নাম্নী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত। সপ্তম মন্ত্রটির অর্থ এই যে, হে দেবগণ, আমি আপনাদিগের জপ, হোম ও স্তুতিপাঠাদি বিষয়ে কখনই কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। আমি আপনাদিগের পূজা-আরাধনাদি বিষয়ে কখনই ঔদাস্য বা আলস্যভাব প্রদর্শন করি নাই। বৈদিক বিধি অনুসারে আমি প্রায় সর্ব্বদাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। বেদোক্ত আচার-ব্যবহারে সদাই রত থাকি। দুই হস্তে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করি।

যমী।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তটি, ব্রহ্মবাদিনী যমী-নাম্নী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে পাঁচটি মন্ত্র আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে প্রেতাত্মন্, যে সকল মহাত্মা তপস্যাপ্রভাবে শত্রু কর্ত্তৃক অনাক্রমণীয় হইয়াছেন, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে স্বর্গগামী হইয়াছেন, যাঁহারা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন্, আপনি তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুন। তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে প্রেতাত্মন্, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ-নীতি অনুসারে যাঁহারা রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা

যুদ্ধক্ষেত্রে শরীরের মায়া ত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, যাঁহারা যজ্ঞে সহস্র সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন্, আপনি তাঁহাদের নিকটেই গমন করুন।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই যে, যে সকল প্রাচীন পুণ্যকর্ম্মা লোক পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি হইয়াছেন, পুণ্যধারা প্রবাহিত করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার প্রভাবে যে পুণ্যধামে গিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন্, আপনি তাঁহাদের সেই পুণ্যধামেই গমন করুন। পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ এই যে, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্য-প্রভাবে সূর্য্যদেব রক্ষিত হইতেছেন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া কেবল তপস্যাই করিয়াছেন, হে কৃতান্ত, এই প্রেতাত্মা যেন তাঁহাদের নিকটেই গমন করেন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। পূর্ব্বে এই মন্ত্রগুলি শ্মশানে শবকে চিতায় আরোহণ করাইবার সময় প্রেতাত্মার স্বর্গ-বাসকামনায় পঠিত হইত। অধুনা অন্যান্য মন্ত্র পঠিত হয়।

সার্পরাজ্ঞী।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৯ সূক্তটি সার্পরাজ্ঞী কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৩টি মন্ত্র আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের

অর্থ এই যে, সূর্য্যদেবের অভ্যন্তরভাগে অত্যুজ্জ্বল প্রভা যেন বিচরণ করিতেছে।

এই প্রভা যেন তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। এই সূর্য্যদেব দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও বৃহত্তম হইয়া আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, এই সূর্য্যদেব কেমন উজ্জ্বলরূপে শোভমান হইয়াছেন। এই সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই স্তব হইতেছে। আহা! সূর্য্যদেব কেমন স্বীয় কিরণমালায় বিভূষিত হইয়া আছেন।

শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধা-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্যমহিলা ঋগ্বেদের পাঁচটি মন্ত্র সংকলন করিয়াছেন। যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের মহিমা উহাতে উল্লিখিত আছে।

লোপামুদ্রা।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্ত লোপামুদ্রা-নাম্নী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত। প্রথম মন্ত্রের অর্থ :—

লোপামুদ্রা পতিকে বলিতেছেন, হে স্বামিন্, আমি বহুবৎসর অবধি রাত্রিদিন ক্রমাগত আপনার সেবা করিয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। দেহের অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ সকল বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শিথিল ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আপনার সেবায় অদ্যাপি রত আছি। কখনও আলস্য প্রকাশ করি নাই। আপনার সেবাকেই পরম ধর্ম্ম ও পরম তপস্যা বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, স্ত্রীজাতির পতিই একমাত্র গতি। পতিসেবাই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম। আমার প্রতি আপনার যেন যথেষ্ট অনুগ্রহ থাকে, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শশ্বতী।

আসঙ্গ-নামক রাজার মহিষীর নাম শশ্বতী। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি অঙ্গিরাঃ। শশ্বতী বেদাদি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিতা ছিলেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ৩৪ মন্ত্রটি শশ্বতী কর্ত্তৃক সংকলিত। মহারাজ আসঙ্গ একদা দেবশাপে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধ্বী পতিব্রতা পত্নী শশ্বতী স্বামীর ঈদৃশী দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বামীর দুর্দ্দশা-মোচনার্থ উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উগ্র-তপঃপ্রভাবে মহারাজ আসঙ্গ এই দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর শশ্বতী প্রীত হইয়া স্বামীকে স্তব করিবার জন্য মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

রোমশা।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রটি রোমশা-নাম্নী শিক্ষিতা আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত। রোমশার গাত্র রোমাবলী-সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তাঁহার পতি তাঁহাকে উপহাস করিতেন ও ঘৃণা করিতেন। রোমশা তজ্জন্য দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে, হে স্বামিন্, আমার গাত্রে বেশী লোম থাকিলেও আমার স্ত্রীজনোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অংশে হানি ঘটে নাই। আমি পূর্ণাবয়বা। আমি বিকলাঙ্গী নহি।'

বধ্রিমতী।

ঋগ্বেদের ১১৬ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বধ্রিমতী-নাম্নী শিক্ষিতা আর্য্য-মহিলা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিয়াছিলেন। শিষ্য যেমন গুরুর কথা শ্রবণ করে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তদ্রূপ বধ্রিমতীর আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৩১ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাপদ্বেষী, যাজ্ঞিক ও তাঁহার পত্নী একত্র সম্মিলিত হইয়া বহু গোধনপ্রাপ্তিকামনায় ইন্দ্রের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৪

সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের আর্য্যগণ যখন অনার্য্যজাতির সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নীগণ যজ্ঞশালায় বসিয়া নিজেরাই হোম করিতেন। কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তন বশতঃ যখন পতি ও পত্নী উভয়েই সংস্কৃত-জ্ঞান-বিহীন, মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িল, তখন পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের সূচনা আরব্ধ হইতে লাগিল। তার পর যখন পরিবর্ত্তনশীল কালের দুর্জ্ঞেয় প্রভাবে ধর্ম্মের ও বিদ্যাশিক্ষার অবনতি হইতে লাগিল, তখন পুরোহিতগণও মূর্খ ও বিষয়ভোগাসক্ত হইয়া পড়িল। তখন যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে সমূলে উন্মূলিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরুকুৎসের পত্নী অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সুললিত স্তবে ইন্দ্র ও বরুণকে প্রীত করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্র ও বরুণের কৃপায় অর্দ্ধদেব ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা দুর্গহের পুত্র পুরুকুৎস শত্রু কর্ত্তৃক কারাবরুদ্ধ হইলে পর, রাজার অভাবে রাজ্য অরাজক ও বিদ্রোহপূর্ণ হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া রাজমহিষী স্বয়ং বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণের পূজা করিয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ প্রীত হইয়া ঐ রাজার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজমহিষীর পূজায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়া-

ছিলেন, হে রাজমহিষি, আপনি ইন্দ্র ও বরুণের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করুন। অনন্তর রাজমহিষী যজ্ঞ করিয়া অর্দ্ধ-দেব ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার অভাবে রাজ্য অরাজক এবং বিদ্রোহ ও অশান্তিপূর্ণ হইবে, এই ভাবিয়া তৎকালের রাজমহিষীরা ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা থাকিতেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইত। তাঁহারা এইরূপ দুঃসময়ে শোকে, তাপে ও ভয়ে বিহ্বলা হইয়া রাত্রিদিন রোদন করিতেন না এবং প্রজা-বর্গের হিতচিন্তায় বিরত হইয়া রাজ্য রসাতলে দিতেন না। তাঁহারা এই বুঝিতেন যে, রাজ্যের মঙ্গল ও শান্তি রাজা ও রাজ্ঞীর ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে নির্ভর করে এবং তাঁহাদেরই ধর্ম্মানুষ্ঠানে শৈথিল্য বশতঃ রাজ্যের অশান্তি ও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

ভারতের আর্য্য-মহিলাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান-কথা ঋগ্বেদেও স্থান পাইয়াছিল। ইহা একবার ভাবিলেও ভারতের মৃতপ্রায় ধর্ম্মভাব পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের নবম মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্ব-কালে মহিলাগণ যুদ্ধে সৈনিক-কার্য্যও করিতেন। নমুচির সহিত ইন্দ্রের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র বলিয়া-ছিলেন, নমুচির স্ত্রীসেনা আমার কি করিবে? কিছুই করিতে পারিবে না। নমুচি স্বীয় স্ত্রীসেনাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ করাইত। ইন্দ্র তাহার দুইটি স্ত্রী-

সৈন্যাধ্যক্ষকে কারাবরুদ্ধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ৪৩ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধার্ম্মিক দম্পতী সদা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তথাপি উভয়ে মিলিয়া প্রচুর ঘৃত দ্বারা হোম করিতেছেন এবং দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, হে দেবগণ, আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। আপনারা আমাদের উপর কদাপি কুপিত হইবেন না। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা ভরতের মহিষী রাজ্ঞী শশীয়সী দেবতাদিগের আরাধনা, জপ, হোম, পূজা এবং দানাদি সৎকার্য্যে সদা রত থাকিতেন। তিনি পুণ্যকার্য্যের বলে চিরযৌবনা হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল। তিনি রোগার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও দীনহীন জনগণের প্রতি সদাই কৃপাবর্ষণ করিতেন। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, মর্ত্তলোকে নরনারীগণ তোমাদিগকে সদা পূজা করে। তোমরাও তাহাদিগকে সদা রক্ষা করিও। তোমরা মহান্। এই মন্ত্রপাঠে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও বরুণের পূজা-হোমাদি করিবার অধিকার আছে। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র-নামক গ্রন্থের প্রথম প্রপাঠকের ষষ্ঠ কণ্ডিকায়

"পত্নী চ" এই সূত্রে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, পতির ন্যায় পত্নীও সামগান করিবে। যাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোকের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার নাই, তাঁহারা যদি গোভিল-গৃহ্যসূত্র-নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫ হইতে ১০ সূত্র পর্য্যন্ত দেখেন, তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বিবাহের কুশণ্ডিকার সময়ে নব-বধূকে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

যে পাত্রের সহিত বিবাহ হইতেছে, তাঁহার সহিত ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কি কি কর্ত্তব্য হইবে, তাঁহার গৃহে কিরূপ আচারে চিরজীবন থাকিতে হইবে, তাঁহার আত্মীয়বর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইত্যাদি কথা ও প্রতিজ্ঞা ঐ সকল মন্ত্রে উল্লিখিত আছে। অধুনা সে সকল মন্ত্র পুরোহিত মহাশয়ই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। নব-বধূ উচ্চারণ করে না। নব-বধূর নিজের কর্ত্তব্য নিজে করে না, বুঝে না, সুতরাং ভবিষ্যতে উহা পালন করিবে কিরূপে? নব-বধূর ভ্রাতাকে নব-বধূর হস্তে এক অঞ্জলি লাজ (খৈ) প্রদান করিতে হয়, ঐ অঞ্জলির ভেদ না হয়, এইরূপ সাবধানে নব-বধূকে একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ এক অঞ্জলি লাজ (খৈ) অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ এই যে, 'এই নারী এক অঞ্জলি লাজ (খৈ) লইয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে এবং

এই প্রার্থনা করিতেছে, আমার পতি দীর্ঘায়ুঃ হউন্। শত-বর্ষ পরমায়ুঃ লাভ করুন। আমার দেবর, ভাসুর এবং তাঁহাদের পিতৃব্য প্রভৃতি জ্ঞাতিদিগের শ্রীবৃদ্ধি হউক, তাঁহাদের সকল বিষয়ে উন্নতি হউক্।

নব-বধূ এক্ষণে স্বামীর সগোত্রা হইয়াছেন বলিয়া স্বামীর আত্মীয়-জ্ঞাতিগণ তাঁহারই আত্মীয়-জ্ঞাতিগণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই শিক্ষা বৈদিকযুগে কুশণ্ডিকার সময়ে বধূর হৃদয়ে নিহিত হইত। বধূও পতিগৃহে গিয়া পতির জ্ঞাতিবর্গের উন্নতি কামনা করিত, পতির ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদি স্বজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার মূল-কারণ হইত না। তাহার দোষে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইত না। "জ্ঞাতি-বিবাদ" বলিয়া একটা পদার্থ বৈদিকযুগে অনুভূত হইত না। সুতরাং গৃহে সদা শান্তি বিরাজ করিত। তখন "স্মার্ত্ত"-যুগ বা "সংহিতা"-যুগ আরব্ধ হয় নাই। সুতরাং জ্ঞাতি-বিবাদ-ভঞ্জনের নিমিত্ত বা জ্ঞাতিদিগের স্বত্ব নির্দ্ধারণের জন্য দায়ভাগ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই। কালের "কুটিল গতি" অনুসারে যখন ধর্ম্মভাব ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, বৈদিক যুগের অবসান হইতে লাগিল, তখন সেই যুগের অনুরূপ কর্ত্তব্যপালনার্থ ঋষি-গণ স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়া বৈদিকধর্ম্মহীন জনগণের অশেষ উপকারে প্রবৃত্ত হইলেন। গোভিল ঋষি যে সময়ে "গৃহ্যসূত্র"-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে

স্ত্রীশিক্ষার কিঞ্চিৎ হ্রাসাবস্থা ঘটিয়াছিল। কারণ, বিবাহ-সময়ে নব-বধূকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝাইবার জন্য মন্ত্রের অর্থজ্ঞ একটি বৈদিক ব্রাহ্মণের উল্লেখ "গৃহ্যসূত্রে" দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া নব-বধূকে উহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, এই কন্যা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আগমন করিতেছে এবং পতি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। হে কন্যে, আমরা তোমার সহিত একত্র হইয়া ও জলধারার ন্যায় বলবান্, বেগবান্ ও পরস্পর অভিন্নভাবে স্থিত হইয়া তোমার শত্রু-বর্গকে উৎপীড়িত করিব।

গোভিল ঋষির "গৃহ্যসূত্র"-রচনার সময়ে মন্ত্রের অর্থজ্ঞ একজন ব্রাহ্মণ নব-বধূকে মন্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিতেন। এক্ষণে পুরোহিত যখন নিজেই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝেন না, তখন অপরকে বুঝাইবেন কিরূপে? ইংরাজ, জর্ম্মন্, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির বিবাহ-সময়ে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষায় অনূদিত বাইবেল-নামক ধর্ম্ম-পুস্তকের যে সকল বিবাহ-মন্ত্র পঠিত হয়, তাহা বর ও বধূ বুঝিতে পারে। পুরোহিত মহাশয় কি বলিতেছেন এবং তাহারা দুই জন (বর ও বধূ) কীদৃশ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রতী হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে। সুতরাং তাহারা দুই জন বিবাহকালে মনোযোগ, ভক্তি, প্রেম ও

আহ্লাদের সহিত ঐ সকল দাম্পত্য-বন্ধন-মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীনতম সুসভ্যভূমি ভারতবর্ষের হিন্দু-জাতির বিবাহ-সময়ে যে সকল বৈদিক মন্ত্র পঠিত হয়, তাহার অর্থ না জানেন পুরোহিত, না জানেন বর, না জানেন বধূ এবং না জানেন কন্যা-সম্প্রদাতা পিতা!!! "কি যে সাপের মন্ত্র পড়া হয়," আর কিবা যে তাহার অর্থ, কেই বা তাহার "খোঁজ-খবর" রাখে? ইদানীং এই অধঃপতিত হতভাগ্য ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিপ্লব-সময়ে বিবাহ এবং ব্রত-পূজাদি পবিত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম যে কিরূপ পণ্ড হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমস্তই যেন একটা "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! যে কার্য্য করা হইল, তাহার "মাথামুণ্ড" কিছুই বুঝা হইল না। অথচ, তিল, তুলসী, তাম্র, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অগ্নি ও ৺শালগ্রামশিলার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারিত হইল, কিন্তু তাহার অর্থ-বোধ হইল না। সুতরাং ভবিষ্যৎকালে ঐ মন্ত্রের উপদেশ অনুসারে কোন কার্য্য করাও হয় না এবং ঐ উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করা হয় না।

ঐরূপে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিলে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়, তাহা একবার ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের মূলভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়, সেই জন্য ইহা বহু শতাব্দী

হইতে নানাবিধ অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াও এখনও সমূলে উন্মূলিত হয় নাই এবং কোন কালে যে ইহা সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইবে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, ইহার নাম "সনাতন আর্য্যধর্ম্ম।" দৃঢ়তম বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ উপাদানে ইহার মূলভিত্তি গঠিত হইয়াছে। যাবৎ লোকের সুদৃঢ় ভক্তি-বিশ্বাস থাকিবে, তাবৎ ইহার সমূলে উন্মূলন হইবে না। তবে জ্ঞানাভাবে ইহার যে ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে ও পরেও ঘটিবে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পুরোহিত মূর্খ হওয়াতেই ভারতে ধর্ম্মের ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি নিজেই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝা তো দূরের কথা, বৈদিক মন্ত্র সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করিতেও জানেন না ও পারেন না। সুতরাং পরকে আর কিরূপে উচ্চারণ করাইবেন? এক্ষণে যে কোন প্রকারে পক্ষীকে "রাধাকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করাইতে পারিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। "গোলে হরিবোল দিয়ে" কোন প্রকারে দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই এবং দক্ষিণাটি আদায় করিতে পারিলেই পুরোহিত মহাশয় নিশ্চিন্ত হয়েন। বিবাহকালে, "সপ্তপদীগমন"-সময়ে বরকে একটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাহার অর্থ এই যে, হে বধূ, তুমি চিরকালের জন্য আমার সহচারিণী হও, আমি যেন চির-কাল তোমার সৌহার্দ্দ্য ভোগ করি। তোমার সহিত সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত এই সৌহার্দ্দ্য যেন বিচ্ছেদকারিণী

নারীরা ("ঘর-ভাঙানীরা") বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে। আমাদের হিতৈষিণী ভদ্র-মহিলারা সদুপদেশ-প্রদানাদি-দ্বারা আমাদের এই নূতন সৌহৃদ্য ক্রমে বর্দ্ধিত করিতে থাকুন। এই মন্ত্র দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কোন গৃহ-বিচ্ছেদকারিণী নারীর কূটবুদ্ধির দোষে পরে গৃহে অশান্তি-অনল যেন প্রজ্বলিত না হয় এবং তদ্বিষয়ে বধূ যেন এখন হইতেই সতর্ক থাকেন, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বধূকে বুঝাইবার জন্য পুরাকালে বর এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেন।

"গোভিল-গৃহ্যসূত্রে"র দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ সূত্রে লিখিত আছে যে, বর ও বধূ এক-সঙ্গে একটি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার শেষ ভাগের অর্থ এই যে, সদুপদেশদায়িনী ভদ্র-মহিলারা আমাদের উভয়ের দুইটি হৃদয়কে একটি হৃদয় করিয়া দিন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নব-বধূ একটি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার অর্থ এই যে, হে ধ্রুবতারা, তুমি স্থিরপ্রকৃতি-সম্পন্না। সেই জন্য তুমি ধ্রুব নামে বিখ্যাতা। আমি যেন পতিকুলে তোমার ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইয়া বাস করি। অর্থাৎ পতিকুল পরিত্যাগ করিয়া যেন আমাকে এ জীবনে অন্যত্র কুত্রাপি বাস করিতে না হয়। যদি কদাচিৎ পতির সহিত বিবাদ করিয়া কোন নারী পতিগৃহ ত্যাগ করে এবং অন্যত্র বাস করে, তাহা হইলে সে

পাতকিনী হইবে। কারণ, বিবাহকালে সে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পরে সে ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অনন্তর পতি বধূকে "ধ্রুবাদ্যোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে। ইহার অর্থ এই যে, হে ঈশ্বর, স্বর্গলোক যেমন স্থির ও চিরস্থায়ী, পৃথিবী যেমন স্থিরা ও অচলা, পর্ব্বত সকল যেমন স্থির ও অচল, আমিও তদ্রূপ পতিকুলে যেন স্থিরা ও অচলা হইয়া আজীবন বাস করিতে পারি। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূ, "আমার এই গোত্র ও এই নাম, আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি" এই বলিয়া পতির পাদগ্রহণ করিবে। এই মন্ত্র দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, বধূ যেন পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে, মাতুলালয়ে কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় বা মিত্রের গৃহে সর্ব্বদা উৎসব, আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে যাইবার জন্য চঞ্চলা না হয়েন। সর্ব্বদা গৃহে থাকিয়া, গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতিপুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত থাকাই বধূর একমাত্র মুখ্য কার্য্য। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল গৌণ কার্য্য। কারণ, বিবাহকালে পাত্রীকে আর একটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাহার অর্থ এই যে, আমাদের রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ্বর আমাদের জন্য তাদৃশ উত্তম পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, যে কল্যাণকর বিঘ্নশূন্য পথ অবলম্বন করিলে আমি পতিকুলে কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারি।

এই মন্ত্র দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পতিকুলে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকাই পত্নীর একমাত্র মুখ্য কার্য্য। কুটুম্বমিত্রাদির গৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য গৌণ কার্য্য। নিমন্ত্রণরক্ষা করায় দোষ দেওয়া হইতেছে না। নিমন্ত্রণ-রক্ষার ব্যপদেশে তথায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া গৃহকৃত্যে অবহেলা করাই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। গৃহকৃত্যে অবহেলা করিয়া পরগৃহে উৎসব-আমোদে মত্ত হইতে নিষেধ করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বকালে বর ও বধূই যে কেবল বিবাহকালে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিত, তাহা নহে, কিন্তু বর বিবাহান্তে যখন কর্ণীরথ-নামক রথে বধূকে আরোহণ করাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন করিত, তখন কুলশীলসম্পন্না পতিপুত্রবতী মহিলারা "ইহ গাবঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বধূকে ঐ রথ হইতে নামাইতেন। এই মন্ত্রটির অর্থ এই যে, এই বধূ ও বরের গৃহে ধেনু ও ঘোটকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক। রাশি রাশি দুগ্ধ ঘৃত-নবনীতাদি প্রদানের জন্য বহুসংখ্যক ধেনু রক্ষিত হউক এবং গাড়ী টানিবার জন্য ও পৃষ্ঠে মানুষ বহিবার জন্য বহুসংখ্যক ঘোটক রক্ষিত হউক। এই গৃহে উত্তম পুত্র-পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করুক্। যে দেবতার অনুগ্রহে সহস্র মুদ্রা দক্ষিণাদানের উপযুক্ত যজ্ঞ সকল সম্পাদিত হইতে পারে, সেই সূর্য্য-দেবতা এই গৃহে সর্ব্বদা অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। পতি

নিজ গৃহে আসিয়া হোম করিবার সময় "ইহ ধৃতি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধু, এই গৃহে তুমি স্থিরমতি হইয়া আনন্দের সহিত কালযাপন করিও। আমাতে তোমার অচলা মতি হউক। আমার আত্মীয়গণের সহিত তোমার মনের মিলন হউক। আমার প্রতি তোমার আসক্তি হউক। আমার সহিত তুমি আনন্দের সহিত কালযাপন কর।

বর্ত্তমান সময়ের নব-বধূ এইরূপ মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়া ভবিষ্যতে তাহার সহিত তাহার পতির ও পতির জ্ঞাতিদিগের মনের প্রায় মিলন হয় না। সুতরাং তাহার পতির চরণে তাহার অচলা ভক্তি হইবে কিরূপে? সে পতির সহিত পতিকুলে আনন্দে কালযাপন করিবে কিরূপে? সে যদি বুঝিত যে, সে বিবাহকালে পবিত্র হোমাগ্নি ও ৺শালগ্রামশিলার সম্মুখে ভবিষ্যতে পতির চরণে অচলা মতি রাখিবার জন্য বেদমন্ত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে বৈদিক শাসনবাক্য চিরজীবন মানিয়া চলিত। যদি সে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পতিচরণে তাহার দৃঢ়ভক্তি ও অচলা মতি থাকিত। কারণ, নারীজাতি সাধারণতঃই ধর্ম্মভীরু। নারীজাতি যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রতি যে উপদেশ ও আদেশ হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-সম্পৃক্ত, উহা ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত সম্বদ্ধ,

এইরূপ বুঝিতে পারিলে ধর্ম্মভীরু নারীজাতি ঐরূপ আদেশ উপদেশ কখনই উল্লঙ্ঘন করিবে না। কারণ, সাধারণতঃ নারীজাতির এই ধারণা যে, ধর্ম্ম-সম্পৃক্ত কোন বিষয় উল্লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হয়। পূর্ব্বকালে বিবাহের পর বর, বধূকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করিলে কুলশীলসম্পন্না পতিপুত্রবতী পুরস্ত্রীরা সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাদের কল্যাণ-কামনা করিতেন। পুরস্ত্রীগণ সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন, এ কথা শুনিয়া এক্ষণে অনেকে বিস্মিত হইবেন। এক্ষণে সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে শুভ বৈদিক-মন্ত্র পাঠের পরিবর্ত্তে "হুলুহুলু" ধ্বনিমাত্র পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেলে প্রাচীন রীতির এইরূপ আর কোন চিহ্নই থাকিবে না।

বিবাহের পর পতিগৃহে আসিয়া নারী গৃহিণীপদবাচ্যা হয়েন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইষ্টকা, চূর্ণ, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও লৌহাদি উপাদানে নির্ম্মিত গৃহ গৃহই নহে, উহা গৃহ শব্দের গৌণ অর্থ। গৃহিণীই গৃহ শব্দের মুখ্য অর্থ, গৃহিণীই গৃহের দেবতা। গৃহিণীই গৃহকর্ম্মের প্রধান উপযোগিনী। পত্নীর জন্যই গৃহের প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিতেছেন, গৃহের মূলদেবতারূপিণী সেই পত্নী যদি পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং পতির বশবর্ত্তিনী হয়েন, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রম তুল্য মহাসুখকর স্থান

ত্রিভুবনে আর কুত্রাপি নাই। এই জন্য অন্যান্য আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য প্রার্থনা করে বলিয়া ইহা অন্যান্য আশ্রমের আশ্রয়স্বরূপ। যিনি গৃহ শব্দের মুখ্য অর্থ, সেই গৃহিণী যদি গৃহের ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে অধিকারিণী না হয়েন, তাহা হইলে "সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে" এই শাস্ত্রবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কালের অবোধ্য প্রভাবে সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নতুবা এক্ষণে পুরুষগণ যে সকল শ্রাদ্ধ-হোম-পূজাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালে নারীগণও তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতেন। কাল-প্রভাবে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও কালে লয় প্রাপ্ত হয়েন। স্বর্গের অমরাবতী হইতেও শ্রেষ্ঠা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী ও শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগরীই যখন কালপ্রভাবে শ্রীভ্রষ্টা হইয়া গিয়াছে, তখন স্ত্রীলোকের বেদপাঠ, হোম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দেব-দেবীগণের পূজা প্রভৃতি গৃহস্থ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

মৈত্রেয়ী।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈরাগ্যবশতঃ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ি, আমি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। পত্নী বিদ্যমান থাকিতে পতির সন্ন্যাস-আশ্রম-গ্রহণে ইচ্ছা হইলে পতিকে পত্নীর অনুমতি লইতে হয়। পত্নী বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার অনুমতি না লইয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পতির সন্ন্যাসগ্রহণ শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পাছে তোমার ও তোমার সপত্নী কাত্যায়নীর সাংসারিক কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য অগ্রে তোমাদিগকে সমভাবে আমার সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া পরে সন্ন্যাসী হইব। আমি তোমাদিগকে যে সম্পত্তি দিয়া যাইব, তাহাতে তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের জন্য কোন কষ্ট হইবে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও তাঁহার সম্পত্তি বড় কম ছিল না। তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। মিথিলাধিপতি মহারাজ জনকের কঠিন, কঠিন শাস্ত্রীয় প্রশ্নের সদুত্তর-দানের জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজের নিকট হইতে অনেকবার সহস্র

ধেনু এবং বহু সহস্র "ভরি" সুবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। এই সহস্র ধেনুর দুই দুইটি শৃঙ্গ দশ "ভরি" পরিমিত সুবর্ণে ভূষিত করিয়া মহারাজ মহর্ষিকে বহুবার দান করিয়াছিলেন। এক সহস্র ধেনুর প্রত্যেক শৃঙ্গে দশ ভরি পরিমিত স্বর্ণ থাকিলে দুই সহস্র শৃঙ্গে বিংশতি সহস্র ভরি সুবর্ণ ছিল। এইরূপ বিংশতি সহস্র ভরি সুবর্ণ-ভূষিত-শৃঙ্গযুক্ত ধেনু তিনি অনেকবার পাইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিলে সাধারণতঃ অনেক লোক যেমন দরিদ্র বলিয়া বুঝে, তিনি সেইরূপ দরিদ্র ছিলেন না। তিনি অনেক আধুনিক ঋণগ্রস্ত উপাধিলোলুপ ভারতীয় রাজা মহারাজ অপেক্ষা অর্থবান, সুখী, নিশ্চিন্ত ও সদ্ব্যয়ী ছিলেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সৎকার্য্যে যেরূপ ব্যয় করিতেন, তাহা শ্রবণ করিলে অনেক আধুনিক আত্মাভিমানী উচ্চ-উপাধি-ধারী ভূস্বামী ও ধনী বিস্মিত হইবেন। মহর্ষির আশ্রমে বহু সহস্র শিষ্য অন্নবস্ত্র পাইয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। যাঁহার গৃহে নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠানে বহু সহস্র মণ পরিমিত ঘৃত অগ্নিসাৎ হইত, যাঁহার আশ্রমে অসংখ্য অতিথি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রাপ্ত হইত, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইতে পারেন না। যে ঋষি, মাত্র দশ সহস্র ছাত্রকে অন্নবস্ত্র দিয়া গৃহে রাখিয়া অধ্যয়ন করাইতেন, তিনি "কুলপতি" আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ কুলপতি মহর্ষিগণ অপেক্ষাও বড় ছিলেন। মহামুনি ব্যাসের ষষ্টিসহস্র ছাত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে দুই বেলা অন্নব্যঞ্জন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ভোজন করাইয়া স্বগৃহে রাখিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। প্রতিদিন ষষ্টিসহস্র ছাত্রকে দুই বেলা ঐরূপে ভোজন করান যে কিরূপ মহাব্যাপার, তাহা একবার মনে করিলে কে না বিস্মিত হয়? পূর্ব্বকালের রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় মহাদাতা প্রকৃত রাজা মহারাজ তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া সাহায্য করিতেন। তাই মহর্ষিগণ এত অধিক ব্যয় করিতে পারিতেন। তাঁহারা ক্রিয়াবান ছিলেন। সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের ধনাভাব হইত না। তাঁহারা কাহারও নিকটে যাচ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা শ্রাদ্ধ করিবার সময় যে একটি মন্ত্র পাঠ করিতেন, সেই মন্ত্রের অনুযায়ী কার্য্যও করিতেন। সেই মন্ত্রের অর্থ এই যে, আমাদের গৃহে প্রভূত অন্ন হউক্। আমরা যেন বহু অতিথিকে লাভ করিয়া ভোজন করাইতে পারি। আমাদের নিকটে লোক সকল আসিয়া যাচ্ঞা করুক। আমরা যেন ঈশ্বরের কৃপায় কাহারও নিকটে গিয়া কোন বিষয় কদাপি যাচ্ঞা না করি। যে মহর্ষিগণ এই সকল শাস্ত্রবাক্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা কি সর্ব্বদা যাচ্ঞাকারী দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হইতে পারেন? কখনই না। তাঁহারা মহান্ ও তেজস্বী ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান ও

শিষ্যবর্গ আচার, বিনয়, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা-বিহীন হওয়াতেই তেজোবিহীন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই আধুনিক "বড়লোক"দিগের নিকটে ভিক্ষুক বলিয়া গণ্য হইতেছে। যাহারা পূর্ব্বে ভৃত্য ছিল, কালপ্রভাবে তাহারা প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর যাঁহারা প্রভু ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ আজ তাহাদের ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা কালের কুটিলা বিচিত্রা গতি!! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নানাশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মৈত্রেয়ীকে বিবাহ করিবার পর হইতেই তিনি তাঁহাকে বহু আধ্যাত্মিক তত্ত্বশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বকালে পতি বিবাহের পর পত্নীকে গৃহে আনয়ন করিয়াই শাস্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতেন।

পতির নিকটে পত্নীর অধ্যয়নের যেরূপ সুবিধা ঘটে, এরূপ সুবিধা আর কাহারও নিকটে ঘটে না। মৈত্রেয়ী মুক্তিতত্ত্ব-শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্র বুঝিবার ও বিচার করিবার প্রণালী অতি উত্তম ছিল। তিনি কোন বিষয় যতক্ষণ উত্তমরূপে না বুঝিতেন, ততক্ষণ কিছুতেই বিরত হইতেন না, কিম্বা "হুঁ" দিয়া "সায়" দিতেন না। শাস্ত্রচর্চ্চায় পতি ও পত্নী সদাই রত থাকিতেন। গৃহকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য, আশ্রমে লোকের অভাব ছিল না। সুতরাং তপোনুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনে তাঁহাদের কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইত না। একদিন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের হঠাৎ সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বেদও বলিয়া থাকেন যে, "যে দিনে যে মুহূর্ত্তে সংসারে সহসা বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" তাই সে দিন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ণ বৈরাগ্য উদিত হইয়াছিল বলিয়া সেই দিনই তিনি মৈত্রেয়ীর নিকটে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে সমভাবে প্রদান করিবেন এবং পরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, এই কথা শুনিয়া মহাপণ্ডিতা মৈত্রেয়ী তাঁহাকে বলিলেন :—"হে প্রিয়তম স্বামিন্, বিবিধ ধনরত্নাদি-পূর্ণ সসাগরা সমগ্র পৃথিবীকে লাভ করিলেও আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। আমি যদি সমগ্র পৃথিবীরও অধীশ্বরী হইতাম, তথাপিও আমার মহাভিলাষ পূর্ণ হইত না। আমি আপনার গো-সুবর্ণ-গৃহ-ক্ষেত্রাদি ধন লইয়া কি করিব? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া তজ্জনিত পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিলেও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ, সেই পুণ্যের ক্ষয় হইলেই পুনরায় মর্ত্তলোকে পতন হইয়া থাকে। সুতরাং আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে কিরূপে?

আমি অমর হইতে চাই। আমি অমৃতত্বপ্রার্থিনী নারী। আমি নির্ব্বাণমুক্তির অভিলাষিণী। পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ-লোক বা জ্যোতির্লোক এবং স্বর্গলোকেও আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। আমি সত্যলোক, জ্ঞান-লোক, আনন্দলোক বা অমৃতলোকে যাইতে ইচ্ছুক। সকল লোকের উপরে এই লোক। এই মহালোককে আশ্রয় করিয়াই অন্যান্য লোক থাকে। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে ইহা লব্ধ হয় না। এই লোক প্রাপ্ত হইলে মানুষ আর এই মর্ত্তলোকে ফিরিয়া আইসে না। নশ্বর রত্ন, সুবর্ণ, গো, গৃহ, শস্য, ক্ষেত্র ও যানবাহনাদি বস্তু উপভোগ করিবার জন্য পুনরায় লালায়িত হয় না। সুতরাং হে ভগবন্ স্বামিন্, আমি আপনার নশ্বর সুবর্ণ, রত্ন, ক্ষৌমবস্ত্র, গো, গৃহ ও শস্যক্ষেত্রাদি বস্তু লইয়া কি করিব? এই সমস্ত বস্তু আমাকে অমৃতলোকে লইয়া যাইতে পারিবে না। এই সমস্ত বস্তুর উপভোগে আসক্ত থাকিলে অমর হইতে পারিব না। অপার অমৃত-সাগরে বিলীন হইতে পারিব না। আপনার এই সমস্ত ধন লাভ করিয়া কিম্বা ধনব্যয়সাধ্য অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব কি?” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “না, এই বিশাল পৃথিবী-সাম্রাজ্য লাভ করিলেও মুক্তি লাভ করিয়া অমর হইতে পারিবে না। এমন কি, অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেও, মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। তবে এই

সকল নশ্বর ধন লাভ করিয়া এইমাত্র ফল হইবে যে, পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, অট্টালিকা, সুবর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, শস্যক্ষেত্র, নানাবিধ যান, হস্তিঘোটকাদি বাহন সমূহ, উত্তমোত্তম ঘৃত-দুগ্ধ-ক্ষীরাদি-বস্তু-প্রদায়িনী বহু ধেনু এবং অন্যান্য বহুবিধ সুখোপকরণ পদার্থ সকল উপভোগ করিয়া যেমন ধনবান্ ব্যক্তির জীবনযাত্রা সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, তদ্রূপ তোমারও জীবনযাত্রা সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইবে, এই-মাত্র সামান্য লাভ। নতুবা বিশেষ একটা কিছু নূতন অপূর্ব্ব ফললাভ হইবে না। দরিদ্র কিম্বা মধ্যমবিত্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রা অপেক্ষা তোমার জীবনযাত্রা অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বাহিত হইবে। এইমাত্র বিশেষ। এইমাত্র লাভ। নতুবা মরণান্তে দরিদ্র ও মধ্যমবিত্ত ব্যক্তির যে দশা হইবে, তোমারও সেই দশা হইবে। তাহা-দিগকেও পুনরায় জন্মিতে হইবে এবং পুনরায় মরিতে হইবে, তোমাকেও পুনরায় জন্মিতে হইবে এবং পুনরায় মরিতে হইবে। এই জন্ম-মরণ-প্রবন্ধ একেবারে ঘুচিবে না। দরিদ্র ও মধ্যমবিত্ত ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দতায় যেরূপ দুঃখ-সম্পর্ক আছে, তদ্রূপ ধনবান্ ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দতাও দুঃখসম্পৃক্ত। তবে যাহারা দারিদ্র্য-দুঃখ-সন্তাপে প্রপীড়িত, তাহাদের জীবনযাত্রা অপেক্ষা তোমার জীবনযাত্রা উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহিত হইবে। এইমাত্র তোমার লাভ হইবে। নতুবা তাহাতে মুক্তিপ্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা নাই।"

সাধ্বী বিদুষী মৈত্রেয়ী পতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়তম স্বামিন্, যে সকল বস্তু দ্বারা আমার মোক্ষলাভ হইবে না, আমি অমর হইতে পারিব না, ক্রমাগত জন্ম-মরণ-চক্রে সম্বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিব, কোন কালেই এই চক্রের নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব না, তাদৃশ বিষয় সকল লইয়া আমি কি করিব? আমার অভীষ্ট ত তাহাতে সিদ্ধ হইবে না। অতএব প্রিয়তম, আপনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝেন, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। যে উপায় অবলম্বন করিলে, যে বস্তু পাইলে মুক্তিলাভ করিতে পারি, পরমাত্মা পরমেশ্বরে বিলীন হইতে পারি, জন্ম-মরণ-চক্র ছিন্ন-ভিন্ন করিতে পারি, সেই উপায় আমাকে বলিয়া দিন।" বিদুষী প্রিয়তমা পত্নী মৈত্রেয়ীর ঈদৃশ মহাসন্তোষজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহাপ্রীত হইলেন এবং প্রিয়বাদিনী প্রিয়াকে বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি, তুমি ইতঃপূর্ব্ব হইতেই যেমন আমার প্রিয়কারিণী ও প্রিয়বাদিনী হইয়া প্রিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ, তদ্রূপ এক্ষণেও আমার চিত্তবৃত্তির অনুকূলা হইয়া সুমধুর বচনবিন্যাসে আমার অসীম আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছ। আমি তোমার মনের অভিপ্রায় শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। অতএব নিকটে এস, বস, আমি তোমার অভীষ্ট ও পৃষ্ট

বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। এই নশ্বর জগতে পত্নী পতির অভিলাষসিদ্ধির জন্য পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই পতিকে ভালবাসিয়া থাকে। যে পতি, যে পত্নীর সকল কামনা পূর্ণ করিতে পারে না, সে পত্নী সে পতির উপরে তত সন্তুষ্ট থাকে না এবং সেই জন্যই সংসারে দাম্পত্য-কলহ উৎপন্ন হয়। পতি পত্নীর কামনা সকল পূর্ণ করিবার জন্যই এ সংসারে পত্নীকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজ আত্মার বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে। অর্থাৎ পত্নী রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, নিঃস্বার্থভাবে সেই আনন্দ উৎপাদন করিবার জন্যই যে, পতি পত্নীকে ভালবাসেন, তাহা নহে, কিন্তু ঐ প্রকার অলঙ্কার পাইয়া আনন্দিত হইলেই পত্নী পতিকে অপেক্ষাকৃত বেশী ভালবাসিবেন, এই আশায় নিজের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই, আত্মার এইরূপ তৃপ্তিসাধনের জন্যই পতি পত্নীকে এ সংসারে ভালবাসিয়া থাকে। পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই কেবল পিতা পুত্রকে ভালবাসেন না, কিন্তু জীবিত অবস্থায় পুত্রের সেবা ও পুত্রের যশঃ-শ্রবণ-কামনায় এবং মরণের পর বংশরক্ষা ও জলপিণ্ডাদি কামনায় পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, সযত্নে প্রতিপালন করেন,

সৎশিক্ষা দেন এবং সৎপথে পরিচালিত করেন। ভৃত্য অর্থসঞ্চয় পূর্ব্বক স্বদেশে গিয়া শস্যলাভার্থে ভূমিখণ্ড ক্রয় করুক, স্ত্রীপুত্রাদিপালনে সমর্থ হউক, উত্তম অবস্থাপন্ন হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া নিঃস্বার্থভাবে এ জগতে কোন প্রভু কোন ভৃত্যকে ভালবাসে না, অন্ন-বস্ত্র ও বেতন দিয়া রাখে না, কিন্তু নিজের গৃহকর্ম্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত এবং নিজের ও পরিবারবর্গের সুখশান্তির নিমিত্তই ভৃত্যকে ভালবাসিয়া থাকে। কার্য্যসমর্থ ঘোটক ঘাসাদি বস্তু ভক্ষণ করিয়া নিজের অভিলাষ পূর্ণ করুক, এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কেহ কোন কার্য্যসমর্থ ঘোটককে কোন কার্য্য না করাইয়া ভালবাসিয়া স্বগৃহে প্রতিপালন করে না কিম্বা ঘোটকসেবায় নিযুক্ত ভৃত্যদ্বারা সাধারণের দুর্লভ অঙ্গমর্দ্দনাদি সেবা করায় না, কোন প্রভু তজ্জন্য ব্যয়ভার বহন করে না, কিন্তু ঘোটক প্রভুকে বহন করিয়া কিম্বা প্রভুর গাড়ী টানিয়া প্রভুর আত্মার তৃপ্তিসাধন করিবে বলিয়াই প্রভু ঘোটককে ভালবাসিয়া থাকে।

এ জগতে লোক যাহা যাহা ভালবাসে, নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের কামনা পূর্ণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজের আত্মার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে। এমন কি, যে সকল সাধু মহাত্মা সদা নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে ব্রতী, তাঁহারাও পরোপকার করিলে তাঁহাদের আত্মার

পরিতৃপ্তি হয় বলিয়া কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদের সন্তোষ উৎপন্ন হইবে বলিয়া তাঁহারা পরোপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। যে দিকেই যাও না কেন, দেখিতে পাইবে যে, আত্মার তৃপ্তিই একমাত্র চরম তৃপ্তি। এ জগতে কেহ আত্মাকে অতৃপ্ত রাখিতে ইচ্ছা করে না। আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও আত্মা অতৃপ্ত থাকুক, এই প্রকার কামনা কাহারও হয় না। অতএব আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পদার্থ। এই আত্মাই অতি প্রিয় বস্তু বলিয়া অন্যান্য পদার্থ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব হে প্রিয়তমে মৈত্রেয়ি, এই প্রিয়তম আত্মাকে দর্শন করা, গুরু ও বেদান্ত হইতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক মহোপদেশবাক্য শ্রবণ করা এবং শ্রবণানন্তর ইহার বিরুদ্ধ কুতর্কজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সৎ ও অনুকূল তর্কদ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত করা উচিত। গুরূপদিষ্ট ও বেদান্ত-উপনিষৎ কর্তৃক প্রদর্শিত এই আত্মতত্ত্ব দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত ও সিদ্ধান্তিত হইলে পর একাগ্রচিত্তে নিষ্কামভাবে ইহার ধ্যান করিতে হয়। আত্ম-বিষয়ক দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান সুসম্পাদিত হইলে পর সাধকের ভেদদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকের আত্মজ্ঞান যতক্ষণ সুসিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ ভেদদৃষ্টি বা দ্বৈতভাব থাকে। হে প্রিয়তমে, সমদৃষ্টি জন্মিলে ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি

ক্ষত্রিয়, ইনি বৈশ্য, ইনি শূদ্র এইরূপ জাতিভেদজ্ঞান থাকে না। তখন ইহা পৃথিবীলোক, ইহা জ্যোতির্লোক, তাহার উপরে স্বর্গলোক এইরূপ লোকভেদজ্ঞান থাকে না। তখন সেই স্বর্গলোকে উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয়া সুন্দরী স্বর্গনারী, অমৃতের হ্রদ, নন্দনকানন ও কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থে ভেদদৃষ্টি থাকে না। তখন মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি লোকে পার্থক্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়। আত্মময় বলিয়া বোধ হয়। তখন একমাত্র জ্ঞানময় আনন্দময় নিত্য আত্মার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। তখন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কোন জাগতিক নশ্বর বস্তুই বস্তুত্বরূপে লক্ষিত হয় না। তখন এই নশ্বর মায়াময় কল্পিত মিথ্যাভূত ভূমণ্ডলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। পরমাত্মার অস্তিত্বেই ইহার অস্তিত্বের অবভাস হয় মাত্র। নতুবা বাস্তবিক ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। যেমন আর্দ্র কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহা হইতে ধূম ও স্ফুলিঙ্গ-পদার্থ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিনির্গত হয়, তদ্রূপ, অয়ি প্রিয়তমে মৈত্রেয়ি, মহামহিম নিত্যশুদ্ধ নিত্যজ্ঞানময় নিত্যমুক্ত এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে অযত্নসাধ্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার ন্যায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ,

ইতিহাস, পুরাণ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা এবং অনুব্যাখ্যা প্রভৃতি বিনির্গত হইয়াছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া যেমন অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তন্নিমিত্ত প্রাণিগণকে যেমন স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা তাঁহার অযত্নপ্রসূত কার্য্য। এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোনরূপ ক্লেশ বা আয়াস বা যত্ন করিতে হয় নাই। তিনি বিজ্ঞানঘন, তাঁহার বস্তুতঃ ভিতর-বাহির না থাকিলেও লৌকিক বোধার্থ বলিতে হইবে যে, তাঁহার ভিতরেও বিজ্ঞান, বাহিরেও বিজ্ঞান। মিশ্রিখণ্ড বা লবণশিলা যেমন ভিতরে ও বাহিরে সকল অংশেই মিষ্ট বা লবণময়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞান-ঘন অর্থাৎ বিজ্ঞানেরই একটি সর্ব্বব্যাপী জমাট পদার্থ। বিজ্ঞানময় ও নামরূপবর্জ্জিত। জাগতিক বস্তুর ন্যায় তিনি নামরূপযুক্ত নহেন। যেমন সৈন্ধব-শিলাখণ্ডের অগ্র-পশ্চাৎ ভিতর-বাহির সকল ভাগই লবণ-রসময়, যেমন তুষার-খণ্ডের সকল ভাগই শীতল, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞানঘন পদার্থ। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল সারগর্ভ অমৃতময় উপদেশবাক্য শ্রবণে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রিয়তম প্রভো! আপনার উপদেশের এই অংশটুকুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। এক পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা ব্রহ্মে সগুণত্ব,

নির্গুণত্ব, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ও উদাসীনত্ব, সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্ম সকল এক পদার্থে কি প্রকারে সমাবেশিত হইতে পারে? আপনি পরমেশ্বরকে নিত্যমুক্ত পুরুষ বলিয়াছেন, কিন্তু যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁহাতে ইচ্ছাদি কোন গুণই তো থাকিতে পারে না। যাঁহার ইচ্ছা, চেষ্টা, যত্ন, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ লুপ্ত হইয়াছে, তিনিই মুক্তপুরুষ। পরমেশ্বর যখন বিশ্বপদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, ক্রিয়া আছে। ইচ্ছা, চেষ্টা এবং ক্রিয়া বিনা কখনই কুত্রাপি কেহ কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে না। যিনি জগৎ-স্রষ্টা, তিনি উদাসীনই বা কিরূপে হইতে পারেন? যিনি সগুণ, তিনি নির্গুণই বা কিরূপে হইতে পারেন? কারণ, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন। উষ্ণত্ব ও শীতলত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম যেমন অগ্নিতে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ নির্গুণত্ব ও সগুণত্বও একপদার্থে থাকিতে পারে না।

আপনি একবার আত্মাকে বিজ্ঞানময় নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুনশ্চ তাহাকেই আবার নামরূপরহিত বলিয়া বিশেষিত করিতেছেন। যিনি নামরহিত, তিনি কোন নাম দ্বারা কোন প্রকারেই বিশেষিত হইতে পারেন না। অগ্নি যেমন উষ্ণত্ব ও শীতত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে না; তদ্রূপ এক আত্মাও, বিরুদ্ধ

ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারেন না। এই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা কি প্রকারে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারেন? হে প্রিয়তম স্বামিন্, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর করিয়া দিন।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "অয়ি প্রিয়তমে, আমি সন্দেহভ্রান্তিজনক কোন কথাই বলি নাই, আমি সকল কথাই সত্য বলিয়াছি। নামরূপবর্জ্জিত পরমাত্মাকে বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞানঘন পদে অভিহিত করাতে তুমি যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আবেশ হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা বৃথা আশঙ্কা। কারণ, আমি এক পদার্থের উপরে কখনও বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ করি নাই। তুমি নিজেই এক পদার্থে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ বুঝিয়া স্বয়ং ভ্রান্তি-জালে পতিত হইয়াছ। তোমাকে এইবার উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। মনোযোগ দিয়া শুন। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা মায়া বা ভ্রান্তি নিবন্ধন যখন আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নিজের সৎস্বরূপতা, জ্ঞান-স্বরূপতা ও আনন্দস্বরূপতা ভুলিয়া গিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত একীভাবাপন্ন হইয়া যান এবং শরীরের ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন। তখন তিনি নিজেকে শরীরস্বরূপ ও ইন্দ্রিয়াদিস্বরূপ বলিয়া বোধ করেন। প্রবল মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি-

দোষই এইরূপ বোধের মূল কারণ এবং সেই জন্যই এই আত্মা তখন নিজেকে আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি মূক, আমি পঙ্গু এইরূপ মনে করে। স্থূলত্ব, কৃশত্ব, কৃষ্ণত্ব ও গৌরত্বাদি পদার্থ শরীরের ধর্ম্ম এবং অন্ধত্ব, বধিরত্ব, মূকত্ব ও পঙ্গুত্বাদি ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম। আত্মা, প্রবল অজ্ঞানবশতঃ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত এক হইয়া যায় বলিয়া তখন শরীরের ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মকে নিজেতে বৃথা আরোপিত করিয়া লয়। বস্তুতঃ আত্মা শরীর বা ইন্দ্রিয়স্বরূপ নয়। আত্মা সৎস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। স্থূলত্বাদি শরীরধর্ম্ম এবং অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাতে থাকে না। যে যাহার ধর্ম্ম, সে তাহাতেই থাকে। জড়ের ধর্ম্ম জড়েতে থাকে এবং শরীরের ধর্ম্ম শরীরে থাকে। জন্মজন্মার্জ্জিত অজ্ঞানবশতঃ চেতন, নিজেকে জড় বলিয়া মনে করে এবং জড়ের ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যেমন চক্ষু রোগবশতঃ পীত হইয়া গেলে মানুষ, শুভ্রবর্ণ শঙ্খকেও পীতরূপ দেখে, যেমন সে দূরত্বাদি হেতু বা নেত্রের কোন দোষ হেতু 'ঝিনুক্'কে রৌপ্যখণ্ড বলিয়া মনে করে, যেমন অন্ধকার ও অসাবধানতাবশতঃ মানুষ, পথে পতিত রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য, জন্মজন্মার্জ্জিত প্রবল অজ্ঞানের প্রভাবে যখন বিমোহিত হয়, তখন তাহার

আত্মা, জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। তখন সেই জীবাত্মা জড়ের অধীন হইয়া গিয়া নিজের প্রকৃতস্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং জড়ের ধর্ম্মগুলি নিজেতে আরোপিত করিয়া লয় মাত্র। জড়ের ধর্ম্ম তাহাতে বস্তুতঃ সংলগ্ন হইয়া যায় না। যাবৎকাল পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বোধ হয় না, যতক্ষণ বিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার উজ্জ্বল আলোক উদিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হৃদয়গহ্বর হইতে বিদূরিত হয় না। তাবৎকাল পর্য্যন্ত ভ্রান্তি-সাগর-স্বরূপ এই সংসারে মানুষকে জন্মিতে হইবে ও মরিতে হইবে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণ উজ্জ্বল আলোক উদিত হইলেই মানুষের হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ ও সকল সন্দেহের ছেদ হইয়া যায় এবং সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যায়। তখন মানুষের দুঃখময় জীবাত্মা, বিজ্ঞান ও আনন্দের অপার মহাসমুদ্রস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ, এক, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তি, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল বা নদীর জল সাগরজলে মিশিয়া যাইবে। এই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীভাব হওয়া বা জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া এক হওয়াই মোক্ষ বা কৈবল্য। আত্মা একই পদার্থ। জীবাত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র একটা পদার্থ নাই। এই আত্মাই মায়ার সহিত সম্বদ্ধ হইলেই সগুণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

জড়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নিজের প্রকৃত নির্গুণ বা তুরীয় স্বরূপতা ভুলিয়া গিয়া মায়া-সম্বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে রত হইয়া পড়েন। যখন সৃষ্টিকার্য্যে বিরত হয়েন, তখন স্বস্বরূপে অবস্থিত হয়েন। নিজের প্রকৃতস্বরূপে অবস্থিত হইলেই পূর্ণ বা তুরীয় বলিয়া কথিত হয়েন, ইহাই আত্মার নির্গুণাবস্থা। এই পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় পদার্থ। অজ্ঞানবশতঃ মানুষ দুই বলিয়া মনে করে। তাঁহার অস্তিত্বই বাস্তব। জড়ের অস্তিত্ব ব্যবহারিক ও কল্পনা-মাত্র। মানুষ মুক্ত হইলেই সেই তুরীয় পদার্থে লীন হইয়া যায়। উহাতে বিলীন হইলে মানুষ আর জন্মে না ও মরে না। নশ্বর কল্পনাময় ভূমণ্ডল তখন আত্মময় বলিয়া বোধ হয়। তখন অন্য জড় বস্তুর বস্তুত্বই অনুভূত হয় না।

ধনরত্নগৃহাদি জড়পদার্থের সত্তা ব্যবহারিক সত্তামাত্র। ইহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই। এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বরই পরম সৎপদার্থ। ব্রহ্মবিদ্যার উজ্জ্বল আলোক উদিত হইলে ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন আত্মা নিজের প্রকৃতস্বরূপে অবস্থিত হয়েন। যতকাল মানব-হৃদয় অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততকাল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয়। যেমন জলাধার বিনষ্ট হইলে চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতিবিম্বমাত্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্রসূর্য্যাদির বিনাশ হয় না, তদ্রূপ শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ আবরণ বা 'উপাধি'

বিনষ্ট হইলে বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ নিত্যস্বরূপ আত্মার বিনাশ হয় না। নশ্বর ভৌতিক আবরণ বিনষ্ট হইলে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জীবাত্মাও বিনষ্ট হয় না, কেবলমাত্র তাঁহার জৈবভাবটি অপসৃত হইয়া যায়। পরমাত্মবিজ্ঞানই সর্ব্ব-শ্রেয়স্কর। এই পরমাত্ম-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞান, কুসংস্কার, ভ্রম ও সন্দেহ এবং নানাবিধ অকথ্য দুঃখস্বরূপ নক্রকুম্ভীরগণে পরিব্যাপ্ত, দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায়ই নাই। পরমাত্ম-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক উদিত হইলে ইনি জ্ঞাতা, এটি জ্ঞেয় এবং ইহা জ্ঞান, এইরূপ ত্রিত্বভাব থাকে না। তখন এই ত্রিত্বভাব একমাত্র নিত্যজ্ঞানস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তখন ইনি নমস্য, আমি নমস্কার-কর্ত্তা এবং ইহা নমস্কার, এইরূপ ত্রিত্বভাব থাকে না। তখন আমি দ্রষ্টা, ইনি দৃশ্য এবং ইহা দর্শনপদার্থ, এইরূপ ত্রিত্বভাব থাকিবে না। তখন সমস্তই এক বলিয়া বোধ হইবে। যেমন অগ্নি দ্বারা অগ্নি দগ্ধ হয় না, যেমন প্রদীপ দ্বারা প্রদীপ প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশস্বরূপ আত্মা, অন্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না। যে পদার্থ স্বপ্রকাশ বা স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, তাহা অন্য প্রকাশের সাহায্যে প্রকাশিত হয় না। সূর্য্যকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য সূর্য্যের প্রয়োজনই হয় না। অয়ি প্রিয়তমে মৈত্রেয়ি, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাতা

বা প্রকাশয়িতা, যিনি মানুষের বাক্য ও মনের অতীত, যখন মানুষ তৎস্বরূপ হইয়া যাইবে, যখন মানুষ মুক্ত হইয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কি উপায়ে জানিবে? তখন তাঁহার জ্ঞাতা অন্য আর কেহ থাকে না। তখন একমাত্র নিত্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি জ্ঞানময় মুক্ত পরমাত্মা বিদ্যমান থাকেন। মানুষ, জ্ঞান-বৈরাগ্যপ্রভাবে মুক্ত হইয়া গেলে—পরমেশ্বরে লীন হইয়া গেলে আর সে ভীষণদুঃখপ্রদ জন্মমরণচক্রে পুনরায় ঘূর্ণিত হয় না। তখন তাহার এই চক্রঘূর্ণনদুঃখের আত্যন্তিক অবসান হয়।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধ্বী মৈত্রেয়ী অত্যন্ত প্রীতা হইলেন। পতির উপদেশপ্রভাবে পত্নীর জ্ঞান ও বৈরাগ্য উদিত হইল এবং সংসারে আসক্তি লুপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে তিনি স্বামীর সহিত মুক্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের যে ভারতে যে সময়ে স্বামী স্ত্রীকে ঈদৃক্‌রূপে সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্ব সহজভাবে উপদেশ করিতেন, আমাদের সে ভারতের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় যেন সেইরূপ দিন আমরা দেখিতে পাই, ইহাই জ্ঞানময় পরমেশ্বরসমীপে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। এক্ষণে ভারতে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হয় না, কিন্তু মৈত্রেয়ীর ন্যায় চিরজীবন সধবা থাকিয়া স্বামীর সহিত মুক্তিপথাবলম্বিনী হইতে পারে।

গার্গী।

পূর্ব্বকালে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এক মহাপণ্ডিতা আর্য্য-মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গার্গী। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি বচক্নু। সেই জন্য গার্গীর অপর নাম বাচক্নবী। গার্গী বেদবেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন বলিয়া তৎকালের মহর্ষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মবাদিনী এই উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তর্কবিতর্ক করিতেও ভয় পাইতেন না। একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্ক করিবার সময় গার্গী যেরূপ অকুতোভয়তা, অসীম সাহস ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত যখন তাঁহার শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল, তখন তিনি যুবতী ছিলেন মাত্র। তখন তাঁহার বেশি বয়ঃক্রম হয় নাই। অল্প বয়সেই তিনি বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ শেষ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে বিষয় লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন সে বিষয়ে যতক্ষণ সুমীমাংসা ও সুসিদ্ধান্ত না হইত, ততক্ষণ তিনি কোন ক্রমেই তাহা না বুঝিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী অবলোকন করিয়া বড় বড় ঋষিরাও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তিনি মহর্ষিগণের সহিত ঘোর তর্ক করিতেন বটে, কিন্তু কোন

মহর্ষির মর্য্যাদার হানি করিতেন না। তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রণাম করিতেন। যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য সম্মান, তাঁহাকে সে সম্মান দিতে তিনি কখনই ত্রুটি করিতেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠব্রাহ্মণনামক অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে মহর্ষে, উপনিষৎ বলেন, সমস্ত পৃথিবী জলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, পৃথিবী খনন করিলেই যখন জল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন স্তুতরাং পৃথিবী জলের উপরেই নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত। জল হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব জলই পৃথিবীর উপাদান-কারণ। কিন্তু মহর্ষে, এই জল কাহার উপরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত? অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?" মহর্ষি বলিলেন, "জল, বায়ুর উপরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। কারণ, বায়ুই জলের উপাদান-কারণ।" গার্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়ু কাহার উপরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত?" মহর্ষি বলিলেন, "বায়ু অন্তরীক্ষে (আকাশে) ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।"

গার্গী। অন্তরীক্ষ কাহার উপরে অবস্থিত?

মহর্ষি। অন্তরীক্ষলোক গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থিত।

গার্গী। গন্ধর্ব্বলোক কোথায় অবস্থিত?

মহর্ষি। গন্ধর্ব্বলোক আদিত্যলোকে অবস্থিত।

গার্গী। আদিত্যলোক কাহার উপরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ?

মহর্ষি। আদিত্যলোক চন্দ্রলোকের উপরে অবস্থিত।

গার্গী। চন্দ্রলোক কাহার উপরে অবস্থিত ?

মহর্ষি। চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকের উপরে অবস্থিত।

গার্গী। নক্ষত্রলোক কাহার উপরে অবস্থিত ?

মহর্ষি। নক্ষত্রলোক ইন্দ্রলোকের উপরে অবস্থিত।

গার্গী। ইন্দ্রলোক কোথায় অবস্থিত ?

মহর্ষি। ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গার্গী। প্রজাপতি লোক কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত ?

মহর্ষি। প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গার্গী। ব্রহ্মলোক কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত ?

মহর্ষি বলিলেন, "গার্গি! আর জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি তোমার প্রশ্নের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছ। প্রশ্নের রীতি অতিক্রম করিও না। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সদাচারপরম্পরাক্রমে প্রশ্ন করিবার যে একটি নীতি নিরূপিত আছে, তদনুসারে প্রশ্ন কর। তুমি যে লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই ব্রহ্মলোক—সেই সত্যলোক কাহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত ও আশ্রিত। সেই ব্রহ্মাই সকল লোকের আশ্রয়দাতা। সেই ব্রহ্মলোককে আশ্রয় করিয়াই সকল লোক অবস্থিতি করে। আত্মজ্ঞানগম্য

এবং উপনিষৎপ্রমাণবোধ্য পদার্থকে কেবলমাত্র অনুমান-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় না। অনুমান সেখানে পৌঁছিতেই পারে না। এই জন্য গীতায় ইহাকে "প্রত্যক্ষাবগম" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা অনুমানগম্য পদার্থ নয়। সেই ব্রহ্মলোক আনুমানিক প্রশ্নোত্তরের বিষয় নহে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি মহাতপস্যাবলে মানুষ যদি নিজে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিরই সূক্ষ্মতম দুর্ব্বোধ্য ব্রহ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। কেবলমাত্র বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না। তিনি সাধারণ বাক্য ও মনের অতীত। মহর্ষির এইরূপ কথা শুনিয়া গার্গী সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসায় বিরত হইলেন এবং মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উপবিষ্ট আছেন। গার্গী তথায় উপস্থিত হইয়াই যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে নিবেদন করিলেন, "হে পূজ্যবিজ্ঞ মহর্ষিগণ, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করুন। আপনারা যদি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন করি। মহর্ষি

যাজ্ঞবল্ক্য যদি ঐ প্রশ্ন দুইটির সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করিতে পারেন।" গার্গীর এই কথা শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ গার্গীকে "স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর" এই অনুমতি প্রদান করিলেন। গার্গী বলিলেন, "হে মহর্ষে, আমি আপনাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।" নিজের প্রশ্ন দুইটি যে বড়ই কঠিন, তাহা জানাইবার জন্য গার্গী দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রশ্ন দুইটির কঠিনতা প্রথমতঃ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হে মহর্ষে, এই ভূমণ্ডলে অসীমশৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ভীমপরাক্রম বারাণসীর মহারাজ এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী বীরশিরোমণি বিদেহদেশাধিপতি মহারাজ জনক, উভয়ে শীঘ্রসংহারক তীক্ষ্ণবাণ লইয়া যেমন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তাদৃশ তীক্ষ্ণবাণস্বরূপ দুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।" অনন্তর গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহর্ষে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধদেশস্থিত স্বর্গলোক, অধোদেশস্থিত মর্ত্ত্যলোক এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষলোকের মধ্যে যে সকল নশ্বর পদার্থ, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত

সম্বদ্ধ হইয়া যে সূত্রেতে একীভাবে অবস্থিত, সেই সূত্রটি ওতপ্রোতভাবে কোথায় অবস্থিত ?”

মহর্ষি বলিলেন, “গার্গি, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার উত্তর দিতেছি। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধলোক স্বর্গে, মধ্যলোক অন্তরীক্ষে এবং অধোবর্ত্তী মর্ত্তলোকে যে সকল নশ্বর পদার্থ, ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থিত আছে, উহাদের সমষ্টির নাম সূত্র। পৃথিবী যেমন জলের উপরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ সেই অভিব্যক্তসূত্র পদার্থ ত্রিকালেই অনভিব্যক্ত আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।” গার্গী এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, “হে মহর্ষে, যেহেতু, আপনি আমার কঠিন দুর্ব্বিজ্ঞেয় প্রশ্নের দুর্ব্বিজ্ঞেয় উত্তর দিতে পারিয়াছেন, সেই হেতু আমি আপনাকে প্রণাম করিলাম। অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ, মদুক্ত সূত্র-পদার্থটি কি ? তাহাই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন না, আর আপনি প্রশ্ন শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ এই সূত্রের আশ্রয়টিকে পর্য্যন্ত অবগত হইয়া যখন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন, তখন আমি আপনাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিলাম। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছি। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন।”

মহর্ষি বলিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।"

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহর্ষে, স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্ত্যলোকে যে যে নশ্বর পদার্থ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আছে, সেই পদার্থের সমষ্টিকে শাস্ত্রে সূত্র কহে। আপনি বলিয়াছেন, বস্তু-সমষ্টিস্বরূপ সেই সূত্র, অব্যাকৃত ও অনভিব্যক্ত আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অনভিব্যক্ত আকাশের আশ্রয়টি কে? সেই আকাশ কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত?" মহর্ষি এই কঠিন প্রশ্নের উত্তম উত্তর দিতে পারিবেন না, এইরূপ মনে করিয়া গার্গী পুনরায় এই প্রশ্নটি আবৃত্তি করিলেন। মহর্ষি অগ্রে প্রশ্নটিই উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, তার পর উত্তর দিতে যেন চেষ্টা করেন, এই অভিপ্রায়ে গার্গী প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মহর্ষি গার্গীর এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তদ্বিষয়ে কোন কথা না কহিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে গার্গি! প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ বলেন, তিনিই এই অনভিব্যক্ত আকাশের আশ্রয়—যাঁহার কোনকালেই ক্ষরণ বা ক্ষয় নাই বলিয়া যিনি অক্ষর বা অবিনাশী পরমেশ্বর, যাঁহাকে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ পরমাত্মা পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। ইহা প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের

কথা। ইহা আমার মনঃকল্পিত কথা নয়। আমি কখনই কল্পিত বা অসত্য কথা বলি না। তুমি যে প্রশ্নটি দুইবার আবৃত্তি করিয়াছ, ইহাতে এই মনে হয় যে, আমি যেন প্রশ্নটিই আদৌ উত্তমরূপে বুঝিতে পারি নাই। আমি তোমার প্রশ্ন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। প্রশ্নটি একবার আবৃত্তি করিলেই যথেষ্ট হইত। দুইবার আবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।"

গার্গী বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, বুঝিলাম যে, পরমাত্মা পরমেশ্বরই সেই অনভিব্যক্ত আকাশের আশ্রয়। কিন্তু সেই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর কি প্রকার পদার্থ? বিষদভাবে তাহার কিঞ্চিৎ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

মহর্ষি বলিলেন, "সেই পরাৎপর পরমপুরুষ পরমেশ্বর পরব্রহ্ম স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, লোহিতও নহেন, পীতও নহেন, শুভ্রও নহেন, কৃষ্ণও নহেন, তৈল-ঘৃতাদির ন্যায় স্নেহ-পদার্থও নহেন। তিনি ছয়াও নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, তিনি কোন বিষয়ে আসক্ত নহেন, তিনি রস নহেন, গন্ধ নহেন, রূপ নহেন, শব্দ নহেন ও স্পর্শও নহেন। তিনি নেত্ররহিত, কর্ণ-রহিত, বাগিন্দ্রিয়-রহিত, তেজো-রহিত, প্রাণ-রহিত, মুখ-রহিত, হস্ত-রহিত, পদ-রহিত, রূপ-রহিত, রস-রহিত, গন্ধ-রহিত, স্পর্শ-রহিত। তিনি ছিদ্র-রহিত, ব্যবধান-রহিত, অন্তর-রহিত, বাহ্য-রহিত,

আদি-রহিত এবং অন্ত-রহিত। তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না বা বিনাশ করেন না এবং তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না বা বিনাশ করিতে পারে না। তিনি এক অর্থাৎ স্বসজাতীয় দ্বিতীয়-রহিত৭। যেমন মনুষ্য-জাতির মধ্যে যাদব ছাড়া অন্য একটি মনুষ্য মাধব আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মের সজাতি অন্য একটি ব্রহ্ম নাই। তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্ববিজাতীয় অপর-রহিত। যেমন মনুষ্য-জাতি হইতে ভিন্নজাতীয় কুক্কুরাদি জন্তু আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বিজাতীয় স্বতন্ত্র কোন বস্তুই নাই। সমস্ত বস্তুই তাঁহার অংশ। তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তিনিই সমস্ত বস্তুর উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। তাঁহার অস্তিত্ব ছাড়া স্বতন্ত্র কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। অন্য বস্তুর অস্তিত্ব মায়াময় ও কল্পিতমাত্র। উহা বাস্তব নহে। তিনি সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। হে গার্গি! পরম-পুরুষ সর্ব্বশক্তিশালী পরমেশ্বর প্রাণীদিগের মহোপকারার্থ সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কঠোর শাসনে পরিচালিত সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার কঠোর শাসনভয়ে যেন কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া আলোক-প্রদানাদি স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য করিতেছে। তাহারা নিয়মিত দেশে নিয়মিত কালে উদয়-অস্ত-বৃদ্ধিলয়াদি কার্য্যে নিয়মিতরূপে ব্যাপৃত রহিয়াছে। হে গার্গি! সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের সুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গলোক,

জ্যোতির্লোক ও এই পৃথিবী সুনিয়মে রক্ষিত হইতেছে। তিনি যদি এই তিন লোককে ধরিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে অতি গুরু-ভারাক্রান্ত এই তিন লোক রসাতলে বিলীন হইয়া যাইত এবং হঠাৎ জ্যোতির্লোক এই মর্ত্ত-লোকে পতিত হইত। হে গার্গি! তাঁহারই প্রকৃষ্ট শাসন-গুণে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বস্তু সমূহের বয়ঃক্রমনিরূপক মাস, বৎসর, দিবা, রাত্রি ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি মহাকালের অংশগুলি যথানিয়মে গাতায়াত করিতেছে। যেমন কোন প্রভুর আজ্ঞাপালক ভৃত্যবর্গ সাবধানে প্রভুর আয়-ব্যয়ের সংখ্যা গণনা করে, তদ্রূপ মহাকালের অংশভূত এই বৎসর, মাস, ঋতু, দিবারাত্রি, দণ্ড, পল ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি খণ্ডকাল সকল, বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বরের বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে। হে গার্গি, সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট শাসনগুণে হিমালয়াদি পর্ব্বত হইতে উৎপন্না পূর্ব্বদিক্‌গামিনী গঙ্গা প্রভৃতি নদী এবং পশ্চিমদিক্‌গামী সিন্ধু প্রভৃতি নদ যথানিয়মে প্রবাহিত হইতেছে। হে গার্গি! বহুক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পুণ্যবান্ জ্ঞানী দাতারা যে গোসুবর্ণ-রত্নাদি ধনদান করেন এবং সাধুগণ যে ঐ সকল দাতাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাও সেই অবিনাশী পরমেশ্বরেরই শাসনমহিমা। সাধুজন-প্রশংসিত দানাদি সৎকার্য্যের ফল পরলোকে লব্ধ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের

সুবিচার করিয়া, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে ঠিক তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। পরমেশ্বরই দাতার দানজনিত ফলের সংযোজয়িতা। পরমেশ্বরই সেই দাতাকে তাহার দান-জনিত ফলভোগ করাইয়া থাকেন। হে গার্গি, সেই পরমেশ্বরেরই উৎকৃষ্ট শাসনগুণে দেবতাগণ, স্ব স্ব তৃপ্তির জন্য অন্যান্য বহু উত্তমোত্তম বস্তু সংগ্রহের সামর্থ্য সত্ত্বেও, যজ্ঞকর্ত্তার প্রদত্ত ঘৃত, ফল, চরু, পিষ্টক প্রভৃতি বস্তু ভক্ষণের জন্যই আশান্বিত হইয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বরেরই শাসনবলে মহানুভব পিতৃলোক পুত্র-পৌত্রাদির প্রদেয় শ্রাদ্ধান্ন মাত্র ভোজনের নিমিত্ত পুত্র-পৌত্রাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। হে গার্গি! সেই সর্ব্ব-কর্ম্মফলদাতা সুবিচারক সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের মহিমা না বুঝিয়া, না শুনিয়া, যাহা কিছু জপ-হোম-পাঠাদি পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল বিনশ্বর।

উক্তবিধ কর্ম্ম-অনুষ্ঠায়ী লোক সকল স্ব স্ব কর্ম্মফল-ভোগের পর ভীষণ নক্র-কুম্ভীরাদি তুল্য দুঃখ-শোক-পূর্ণ এই সংসার-সাগরে পুনরায় পতিত হয়েন। কিন্তু উপনিষৎ-বেদান্ত-বেদ্য, মঙ্গলময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, পরমাত্মা পরমেশ্বরের মহিমা জানিয়া শুনিয়া ও ধ্যান করিয়া সেই জ্ঞান, ধ্যান ও সমাধির বলে তাঁহাতে একবার আত্যন্তিকরূপে লীন হইতে পারিলে আর ভীষণ জন্ম-মরণ-

চক্রে ঘূর্ণিত হইতে হয় না। যাহার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান সংসাধিত হয়, সে ব্যক্তি আর এই নশ্বর লোকে ফিরিয়া আইসে না। সে ব্যক্তি অপার অমৃত আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া অমৃত আনন্দের সহিত মিলিয়া যায়। সে ব্যক্তি তখন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সে আর এ জগতে ফিরিয়া আইসে না। এই জীবের সহিত পরমাত্মা পরমেশ্বরের ঐক্যজ্ঞানই সমস্ত উপনিষৎ-বেদান্ত শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য, প্রধান প্রতিপাদ্য সার বস্তু। পরমেশ্বরের তত্ত্বশ্রবণ, পরমেশ্বরের তত্ত্বমনন, পরমেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান, পরমেশ্বরতত্ত্বধ্যান, পরমেশ্বরতত্ত্বে সমাধি ব্যতিরেকে মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায়ই নাই। তাঁহাকে জানা ব্যতীত, তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত, তাঁহাতে বিলীন হওয়া ব্যতীত মুক্ত হইবার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। হে গার্গি! সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই মর্ত্ত্যলোক হইতে চলিয়া যায়, সে ব্যক্তি বড়ই দীন, হীন, ক্ষুদ্র ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত। আর যে ব্যক্তি তাঁহার মহিমা জানিয়া এই মর্ত্ত্যলোক হইতে চলিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ। হে গার্গি! সেই অবিনাশী পরমেশ্বর সকল বস্তু দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি সকল বিষয় জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সকলে জানিতে পারে না। তিনি সকল পদার্থের দ্রষ্টা, মন্তা, শ্রোতা ও বিজ্ঞাতা। সেই

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে আকাশাদি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডই অবস্থিত।"

গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার মহাসন্তোষজনক উত্তর শ্রবণ করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে উপবিষ্ট অন্যান্য মহর্ষিদিগকে বলিলেন, "হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনারা পরমতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে অদ্য এই অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকটে ঋণী হইয়াছেন। এই ঋণ-পরিশোধের জন্য আপনারা যদি এক্ষণে তাঁহার শ্রীচরণকমলে স্ব স্ব মস্তক অর্পণ করেন, তাহা হইলেই সেই মহাঋণের কিঞ্চিন্মাত্র ঋণ পরিশোধ করা হইল, ইহাই বুঝিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিবেন। নতুবা আশ্বাসপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। এই মহাঋণ হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। আর ইঁহাকে শাস্ত্রবিচারে জয় করা তো বহু দূরের কথা। ইঁহাকে শাস্ত্রবিচারে জয় করিব, এইরূপ কথাও আপনারা মনে ভাবিবেন না। কারণ, আপনাদের মধ্যে ঈদৃশ জ্ঞানী কেহই নাই, যিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জয় করিতে সাহসী হইতে পারেন। কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আমার এই কঠিন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মবাদিনী তেজস্বিনী গার্গী নিবৃত্ত হইলেন।

যে দেশে জ্ঞানিগণ-চূড়ামণি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কোন একটি মহিলা দার্শনিক প্রশ্ন করিবার সময় শাস্ত্র-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে মহাসাহসের সহিত বলিতে পারিতেন যে, প্রবল-প্রতাপান্বিত বারাণসী-রাজ ও বিদেহরাজ জনকের সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় দুইটি কঠিন প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, যে দেশের একটি মহিলার কঠিন দার্শনিক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভাব মহর্ষিগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই দেশের স্ত্রীশিক্ষা যেরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, পৃথিবীর কোন খণ্ডেও সেরূপ হয় নাই। কারণ, বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যাশিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন যে, আমি সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উচ্চতম অধ্যাত্মবিদ্যাস্বরূপ। ভারতের মহিলাই পৃথিবীর মধ্যে সকল জাতি অপেক্ষা এই বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগেও কাশীধামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর ন্যায় পুরাতন মহানগরী পৃথিবীমধ্যে কুত্রাপিও ছিল না। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও ইহা দৃষ্ট হয় যে, কাশী নগরীতে ঈদৃশ ধনী বণিকের বাস ছিল যে, যাঁহার বাটীতে ৫০০ শত পরি-চারিকা ও তাহাদের পতিরাও এক সঙ্গে কার্য্য করিত। কাশীতে পূর্ব্বে যেরূপ বলবান্ লোক দেখিতে পাওয়া যাইত, অধুনা সেরূপ বলবান্ সাহসী লোক দৃষ্ট হয় না।

ভক্ষ্যপেয় দ্রব্যের দিন দিন মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলী ও সাহসীর সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। "কাশীধাম-সম্ভূত বীরপ্রবরের তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার এই প্রশ্ন," গার্গীর এইরূপ কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে কাশী বীরবত্তায় গৌরবিণী ছিল।

বৈদিক যুগের শিক্ষিতা মাতা।

বৈদিক যুগে পুত্র-কন্যাদিগের ধর্ম্ম-জীবন সংগঠনার্থ মাতাকে সুশিক্ষা লাভ করিতে হইত। পুত্র-কন্যাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মশিক্ষার বীজ বপন করিবার জন্যই মাতার শিক্ষার প্রয়োজন হইত। তখনকার লোকের এই সংস্কার ছিল যে, মাতা সুশিক্ষিতা না হইলে পুত্রকন্যাদিগের সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে না। পুত্রকন্যাগণ মাতার নিকটে শিক্ষালাভ করিবার যেরূপ সুযোগ পায়, অপরের নিকটে তাদৃশ সুযোগ পাইতে পারে না। বাল্যকালে ধর্ম্মজীবন যেরূপ সুন্দররূপে, সহজভাবে এবং দৃঢ়রূপে সংগঠিত হইতে পারে, যৌবনে কিম্বা বার্দ্ধক্যে তদ্রূপ গঠিত হইতে পারে না। বংশদণ্ডকে অপক্ক অবস্থায় যেরূপ নমনশীল করা যাইতে পারে, পক্ক অবস্থায় তদ্রূপ করিতে পারা যায় না। বাল্যকালে সরল, বিশাল, পবিত্র-স্বভাবরূপ উত্তম ভিত্তি যেমন সুদৃঢ়রূপে গঠিত হইতে

পারে, যৌবনে কিম্বা বার্দ্ধক্যে তদ্রূপ গঠিত হইতে পারে না। বাল্যাবস্থায় ঐরূপ ভিত্তির উপরে স্থাপিত ধর্ম্মভাব স্থায়ী হইতে পারে। শাস্ত্র বলেন, "ধর্ম্মই একমাত্র চির-স্থায়ী পদার্থ। ধর্ম্ম ছাড়া সমস্তই অসার ও বিনশ্বর বস্তু। ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র বন্ধু। মানুষ মরিয়া গেলে সকল বস্তু পড়িয়া থাকে। কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না। শরীর পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়। একমাত্র ধর্ম্মই তাহার সঙ্গে যায়।" বাল্যকালে সুশিক্ষিতা মাতার নিকটে শিক্ষালাভ করিলেই ঈদৃশ অবিনশ্বর পরমবন্ধুস্বরূপ ধর্ম্মকে লাভ করিতে পারা যায়।

বৈদিকযুগে ধর্ম্মশিক্ষাদান-বিষয়ে মাতারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ইহা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তক আড়ম্বর-পটু নব্য বক্তাদিগের কথা নয়, ইহা প্রাচীনতম সভ্যদেশ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জ্ঞান-শাস্ত্র উপনিষদের কথা। বৃহদারণ্যকউপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ জনককে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শিক্ষিতা জননীর প্রাধান্য বিঘোষিত হইয়াছে। একদা মহারাজ জনক পণ্ডিতমণ্ডলী-সুশোভিত রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তথায় সহসা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি সম্মান-প্রদানের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে,

আপনি কি পুনরায় স্বর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গযুক্ত গোধন লাভ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ? কিম্বা আমার সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য দুরুত্তর প্রশ্ন সকল শুনিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ?” মহর্ষি বলিলেন, “মহারাজ, আমি উভয়ের জন্যই আসিয়াছি। স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গযুক্ত সহস্র ধেনু গ্রহণ এবং মহারাজার কঠিন প্রশ্নশ্রবণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।”

ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার মহারাজ জনকের কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর-দানের জন্য, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজের নিকট হইতে বিংশতি ভরি-পরিমিত স্বর্ণে মণ্ডিত শৃঙ্গদ্বয়যুক্ত সহস্র ধেনু লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারে মহর্ষি বিংশতি সহস্র ভরি উত্তম স্বর্ণ এবং সহস্র হৃষ্টপুষ্ট হস্তি-তুল্য বৃহৎ ধেনু পারিতোষিকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহর্ষে, আবার সেইরূপ সুবর্ণ ও ধেনু লাভ করিতে আসিয়াছেন কি ? জনকের রাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের আগমনটি তো বড় সহজ আগমন নয়। তিনি রাজসভায় আসিলেই মহারাজের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, আর তাহার উত্তর দিতে পারিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত পারিতোষিকলাভ! অনেকের এই ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, প্রাচীনকালে সুবর্ণের অধিক মূল্য থাকিলেও, ধেনুর মুল্য কম ছিল। কেহ কেহ বলেন, ধেনুর মুল্যই ছিল না। ধেনু অনেক জন্মিত এবং

গোবধ ছিল না বলিয়া বিনামূল্যেই ধেনু পাওয়া যাইত। বিনামূল্যে তৎকালে ধেনু পাওয়া গেলে শাস্ত্রে শ্রাদ্ধের সময় "চন্দন-ধেনু" ও "ধেনু-মূল্যের" জন্য স্বর্ণরজতাদির ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইত না। অধুনা ধর্ম্মবিপ্লব-যুগে ধেনু-দানরূপ পুণ্যকর্ম্মে ধেনু-মূল্যের পরিমাণ দেখিয়া প্রাচীনকালের ধেনু-মূল্য নির্দ্ধারণ করা ঠিক নয়। কারণ, প্রয়াগে একবার কুম্ভ-মেলার সময় বেণীঘাটে স্নান করিতে গিয়া দেখা গেল, ঘাটের পাণ্ডারা একটিমাত্র পয়সা লইয়া মূর্খ যাত্রীদিগকে বহু সহস্রবার একটিমাত্র ধেনুর পুচ্ছ ধরাইয়া গোদান করাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ কিম্বা কোন শুভযোগ উপস্থিত হইলে পুণ্য-নদীতীরে পাণ্ডারা এইরূপে অজ্ঞ লোকদিগকে এক পয়সা লইয়া গোদান করাইয়া থাকে। যে কালে এক পয়সায় একটি বৃহতী ধেনু পাওয়া যায় এবং বহু সহস্রবার তাহার উৎসর্গ সম্পন্ন হইতে পারে, সেই কাল যে, ধর্ম্মবিপ্লবের যুগ, তাহা বলাই বাহুল্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যদি প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য সহস্র হস্তিতুল্য বৃহৎ ধেনু এবং বিংশতি সহস্র ভরি উত্তম সুবর্ণ দিতে হয়, তাহা হইলে রাজ-কোষাগার শূন্য হইয়া পড়িবে, এইরূপ মনে করিয়া মহারাজ জনক কৌতুকচ্ছলে মহর্ষিকে তাঁহার পুনরাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। মহর্ষির পুনরাগমনে মহারাজ কিঞ্চিন্মাত্রও অসন্তুষ্ট হয়েন নাই।

যদি মহারাজ অসন্তুষ্টই হইতেন, তাহা হইলে মহর্ষির আগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইতেন না। তৎকালের রাজারা দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়াও গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা উপযুক্ত পাত্রকে পুরস্কার দানে সম্মানিত করিতে কিম্বা তাঁহার অভিলাষ পূরণ করিতে কখনও ত্রুটি করিতেন না। একদা মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন এবং মৃৎপাত্রে ভোজন করিতেছিলেন। তাঁহার যখন ঈদৃশী ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তখন বরতন্তু মুনির ছাত্র কৌৎস গুরুদক্ষিণা-প্রার্থী হইয়া মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কৌৎস, মহারাজ রঘুর দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না। কারণ, চাতকপক্ষীও শরৎকালের জলশূন্য মেঘকে 'জল দাও' বলিয়া উৎপীড়িত করে না। আমি মানুষ হইয়া আপনাকে এ অবস্থায় কিরূপে কষ্ট দিব ? আমি স্থানান্তর হইতে গুরু-দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া কৌৎস গমনোন্মুখ হইলে মহারাজ রঘু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি স্থানান্তরে যাইবেন না। আমার নিকটে বিফল-মনোরথ হইয়া স্থানান্তরে গেলে এ জগতে আমার একটি কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। আপনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ। সুতরাং আমার পবিত্র যজ্ঞশালাই আপনার থাকিবার উপযুক্ত

স্থান। তথায় দুই দিন মাত্র বাস করুন। এই সময়ের মধ্যেই আমি আপনার প্রার্থিত চতুর্দ্দশ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা-রূপ গুরুদক্ষিণা যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আপনাকে দিব।” এই বলিয়া মহারাজ রঘু, কুবেরের অলকাপুরী অভিমুখে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা রথ সজ্জিত করা হইল। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বরাত্রে শাস্ত্রনিয়মানুসারে মহারাজ সেই রথে শয়ন করিয়া রহিলেন। কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে কোষাগারের অধ্যক্ষ মহারাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ, অদ্য প্রাতঃকালে কোষাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, কোষাগার সুবর্ণ-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।” মহারাজ রঘু, এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া কৌৎসকে বলিলেন, “হে বিদ্বন্ ব্রাহ্মণ, আপনাকে এই কোষাগারস্থিত সমস্ত সুবর্ণই গ্রহণ করিতে হইবে।” কৌৎস বলিলেন, “মহারাজ, আমি চতুর্দ্দশ কোটির অধিক এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না।” মহারাজ বলিলেন, “যখন আপনার জন্যই এই সুবর্ণরাশি কুবের কর্ত্তৃক গোপনে প্রেরিত হইয়াছে, তখন আমি চতুর্দ্দশ কোটি বাদে অবশিষ্ট স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি কেন লইব? আপনাকে সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে। দাতা, কোষাগারের সমস্ত সুবর্ণ দান করিতে উদ্যত এবং গ্রহীতা ব্রাহ্মণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত সুবর্ণ গ্রহণ করিতে কোন প্রকারেই স্বীকার করিতেছেন

না। এইরূপ বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়া অযোধ্যা নগরীর অধিবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল এবং দাতা ও গ্রহীতার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল। মহারাজ রঘু, কৌৎসের প্রার্থিত চতুর্দ্দশ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা, উষ্ট্র ও ঘোটকীর পৃষ্ঠে স্থাপিত করাইয়া বরতন্তু মুনির আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ঋষিদিগের আশ্রমে ঐরূপ পর্ব্বতসম সুবর্ণরাশি পড়িয়া থাকিত। অন্য কেহ উহা স্পর্শ করিত না। এই জন্য ঐরূপ পবিত্র যুগের বহু সহস্র বর্ষ পরে গ্রীক ঐতিহাসিক পণ্ডিত ম্যাগাস্থিনিস্ ভারতীয় লোকের নিস্পৃহতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা ও চৌর্য্যাদি দোষ-বিহীনতা অবলোকন করিয়া এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, ভারতের পথে জঙ্গলে যত্র তত্র সুবর্ণরাশি পড়িয়া থাকিলেও কেহ স্পর্শ করিত না। চোর বা অসতী কাহাকে বলে, এ দেশের লোক তাহা জানিত না। গ্রীকদিগের এ দেশে আসিবার বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দেশের সামাজিক অবস্থা ও দেশীয় লোকের মন যে কতদূর উন্নত, উত্তম ও পবিত্র ছিল এবং দেশের লোক যে কতদূর সুসভ্য ছিল, তাহা কালিদাসের রঘুবংশাদি কাব্যে ও নাটকে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়।

কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন, রঘুর পিতার রাজত্ব-সময়ে চৌর্য্য কথাটি শাস্ত্রে (অভিধানে)ই নিবদ্ধ ছিল, ইহা কার্য্যতঃ দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত

কৌৎসের উপাখ্যানটিকে কবির কল্পিত অসত্য বলিয়া যদি মনে করেন, তাহা হইলে এ স্থলে স্পষ্টরূপে ও নির্ভয়ে ইহা বলা যাইতে পারে যে. তিনি সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কোন কবির কোন কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতেই পারেন না। কারণ, ঐ সকল কবিগণ, যখন কোন এক ব্যক্তির বিষয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন সেই ব্যক্তি, যে সময়ে ও যে দেশে উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ের ও সেই দেশের লোক-চিত্র ও সমাজচিত্র নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং সেই ব্যক্তির নাম হলধর বা জলধর ছিল কি না? তাঁহার কন্যার নাম দ্রবময়ী বা জগদম্বা ছিল কি না? সেই দেশের সেই সময়ের অমুকনাম্নী কোন নারী সামবেদের অমুক অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন কি না?

রাজা হলধর সত্য সত্যই চতুর্দ্দশ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া নিধিরাম-নামক ছাত্রকে দিয়াছিলেন কি না, ইত্যাদি কথার সত্যতা-নির্দ্ধারণের জন্য যাঁহারা আহার-নিদ্রা বাদ দিয়া তর্ক করিতে বসেন, তাঁহাদের পক্ষে কাব্য-নাটকাদি গ্রন্থপাঠ বিড়ম্বনা মাত্র। কোন মহাকবির গ্রন্থপাঠ করিয়া কিম্বা বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-জনকের কথা পাঠ করিয়া এই-টুকুই দেখিতে হইবে যে, তৎকালে সেই স্থানে সেই

রাজার রাজত্বসময়ে কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সূক্ষ্ম দর্শন-শাস্ত্রের উত্তম উত্তর দিতে পারিলেই তিনি সেই দেশের রাজা এবং অন্যান্য ভূস্বামিগণের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত পারিতোষিক এবং অত্যধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।

তা, জনকই দিউন, আর যাজ্ঞবল্ক্যই লউন, কিম্বা হলধরই দিউন্, বা জলধরই লউন, ইহাতে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের অণুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। লৌকিক ইতিহাস-রচনায় নাম ধাম প্রভৃতির নির্দ্দেশের অণুমাত্র পার্থক্য হইলে অবশ্য অনেক ক্ষতি হয় বটে। কিন্তু ইতিহাস ছাড়া অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। মহারাজ জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে অনেকবার বহুধন দান করিয়াছিলেন। তৎকালের ঋষিগণ এই প্রকার বহু ধন লাভ করিতেন বলিয়াই ষষ্টি সহস্র ছাত্রকে দুইবেলা অন্ন দিয়া নানাশাস্ত্র পড়াইতে পারিতেন এবং মহাব্যয়সাধ্য বড় বড় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিতেন, এইরূপ কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের এই অদ্ভুত পারিতোষিকপ্রাপ্তির কথা স্থান পাইয়াছে। মহর্ষি কেবল মাত্র পারিতোষিক-লাভের জন্যই জনকের রাজসভায় সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন না। কারণ, তাঁহার নিজের আশ্রমে ছাত্র-অধ্যাপন ও তপোনুষ্ঠানাদি কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সেই জন্য যখন

তিনি কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন, সেই সময়ে জনকের রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। তিনি মহারাজ জনকের কোন উপকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা জনক জিত্বা-নামক কোন একটি আচার্য্যের নিকটে শ্রুত উপদেশগুলি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শুনাইতেছিলেন। শুনাইতে শুনাইতে প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রজ্ঞতা-নামক পদার্থের কথা উঠিল। প্রজ্ঞতা পদার্থটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি উত্তমরূপে উহা জনককে বুঝাইয়া দিলে জনক অতিশয় উপকৃত হইয়া মহর্ষিকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃহৎ বৃষ দক্ষিণা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, আমি উহা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আমার পিতা আমাকে এই উপদেশ করিয়াছেন যে, শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-দানে কৃতার্থ না করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিও না। পিতার এ কথা আমি সম্পূর্ণ-রূপে অনুমোদন করি ও পালন করি। মহর্ষি প্রসঙ্গক্রমে মাত্র একটি বিষয় জনককে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া হস্তিতুল্য সহস্র বৃষদক্ষিণা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জনক, অন্যান্য গুরুর নিকটে কি কি উপদেশ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, তাহাই এ ক্ষেত্রে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে শুনাইতেছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ সকল উপদেশের মধ্যে যাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাই মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সুতরাং প্রসঙ্গাগত অপর আচার্য্যের কথা বুঝাইয়া দিতেছিলেন এবং স্বয়ং প্রধানতঃ কোন তত্ত্ব উপদেশ করিতেছিলেন না বলিয়া মহর্ষি, জনকের এই পারিতোষিক গ্রহণ করেন নাই। জনক আচার্য্য জিত্বার নিকটে যে উপদেশটি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপে শুনাইতেছিলেন ঃ—

"শিলিনের পুত্র জিত্বা-নামক আচার্য্য আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ঋগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম। তাঁহার এ কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ, কোন মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি, যেমন সত্য কথা কহিয়া থাকেন, আচার্য্য জিত্বাও আমাকে তদ্রূপ সত্যকথাই বলিয়াছেন। আচার্য্য জিত্বা, মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যবান্ মহাপুরুষ। সুতরাং ঈদৃশ মহাত্মা কখনই মিথ্যা কথা কহিতে পারেন না। শৈশবে স্বয়ং মাতা যাঁহার সুশিক্ষাদাত্রী ছিলেন, তদনন্তর যাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতা, যাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎপরে উপনয়ন-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত যাঁহার সদাচার-সম্পন্ন আচার্য্য গুরু, যাঁহাকে চারিবেদ, বেদাঙ্গ, ও দর্শনাদি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ঈদৃক্ ত্রিবিধ-

পুণ্য-সম্পন্ন মহানুভব মহাত্মারা যাহা যাহা বলেন, তাহা অতি সত্য। তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। ধর্ম্মরতা প্রশংসনীয়া সুশিক্ষিতা মাতা শৈশবে যাঁহার ধর্ম্ম-জীবন সংগঠনে অতিশয় যত্নবতী ছিলেন, যাঁহার সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক পিতা যাঁহার চরিত্র-নির্ম্মাণে এবং লৌকিক-নীতিশিক্ষাদানে সুনিপুণ ছিলেন, এবং যাঁহার ব্রহ্মতত্ত্বোপ-দেষ্টা আচার্য্য গুরু ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষকাল বহু সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই অতি প্রশংসনীয় মহাত্মা। ঈদৃশ মহাত্মার কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের কতিপয় মন্ত্রে পুত্রকন্যাকে শৈশবে শিক্ষা প্রদান করা বিষয়ে মাতারই সর্ব্বপ্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব-প্রথমে মাতার কথা, তার পর ক্রমে পিতা ও আচার্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের এই ব্রাহ্মণে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কয়েকজন আচার্য্য মহাত্মা মহারাজ জনককে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যবান্ এই তিনটি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্যার্থীকে শৈশবে যে, মাতৃমান্ হইতে হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। “ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা প্রশংসনীয়া মাতা যাঁহার আছে,” এইরূপ প্রশস্ত অর্থে মাতৃশব্দের উত্তর “মতুপ্” প্রত্যয়যোগে

মাতৃমান্ এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রশস্তা অর্থাৎ শিক্ষা-দানে সমর্থা, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মনীতি-পরায়ণা মাতার নিকটে শৈশবে শিক্ষা না করিলে শিক্ষার মূলভিত্তি সুগঠিত হয় না। শৈশবে মাতার নিকটে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে শিক্ষালাভ করিবার যেমন সুবিধা হয়, তদ্রূপ পিতা বা গুরু মহাশয়ের নিকটে শিক্ষালাভের সুবিধা হয় না। কিন্তু সেই মাতা যদি স্বয়ং সুশিক্ষিতা না হয়েন, তাহা হইলে তিনি পুত্রকন্যাদিগকে আর কি সুশিক্ষা দিবেন? বৈদিকযুগে পুত্রকন্যাদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্যই মাতা সুশিক্ষিতা হইতেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আত্মতত্ত্ব-চর্চ্চার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন সুরীতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈদিকযুগের পর, পৌরাণিক যুগেও পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মাতাকে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে হইত। তাহার দৃষ্টান্ত মদালসা।

মদালসা।

গন্ধর্ব্ব-রাজবংশে মদালসা-নাম্নী এক রাজকন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় রূপবতী, গুণবতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু। ঋতধ্বজ-নামক এক মহাবল-প্রতাপশালী রাজার সহিত

মদালসার বিবাহ হইয়াছিল। রাজা ঋতধ্বজ এই রূপবতী, গুণবতী ও সুশিক্ষিতা রমণীকে লাভ করিয়া আপনাকে মহাসৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। কালক্রমে মদালসার গর্ভে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক নামে চারিটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শৈশবে মাতার নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। মাতা অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে প্রথমপাঠ্য কতিপয় পুস্তক অধ্যয়ন করাইয়া পরে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আত্মতত্ত্ব-শাস্ত্র শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রান্ত, রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "মাতঃ, কয়েকটি বালক আমার সহিত খেলিতে খেলিতে আমাকে প্রহার করিয়াছে এবং কটুবাক্য বলিয়াছে। অতএব আপনি বাবাকে বলিয়া শীঘ্র ইহার প্রতিকার করুন। আমি রাজপুত্র। অতএব সামান্য বালকদিগের এইরূপ দুর্ব্যবহার আমার পক্ষে অসহ্য।" মদালসা জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঈদৃশ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন :—

"হে বৎস, তুমি বৃথা ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিও না। কারণ, তোমার আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা আনন্দ ও জ্ঞান-স্বরূপ। যিনি সদা আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার

নিরানন্দ হওয়া উচিত নয় এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়াও উচিত নয়। আনন্দই তোমার আত্মার স্বভাব। স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুই পৃথক্‌ভাবে থাকে না। অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা। উষ্ণতাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি কুত্রাপি স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না। আনন্দস্বরূপ আত্মার নিরানন্দ হওয়া উচিত নয়। আত্মার নির্ম্মল প্রকাশ, যখন অবিদ্যা বা মায়া বা অজ্ঞান বা ভ্রান্তিরূপ আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন মানুষ নিজেকে নিরানন্দ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ নিরানন্দ হওয়া মানুষের পক্ষে উচিত নয়। কারণ, মানুষের আত্মা সদা আনন্দস্বরূপ। যেমন মেঘরূপ আবরণে আচ্ছন্ন হইলে এত বড় প্রকাশশীল ব্যাপী সূর্য্যদেব অপ্রকাশশীল হইয়া পড়েন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ প্রকাশশীল, চেতন, সর্ব্বব্যাপী, আনন্দস্বরূপ আত্মাও, অজ্ঞান বা মায়ারূপ আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, অপ্রকাশশীল জড়স্বরূপ ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্নস্বরূপ এবং নিরানন্দস্বরূপ হইয়া পড়েন বলিয়া মানুষ মনে করে। বস্তুতঃ আত্মা নিরানন্দস্বরূপ নহেন। তিনি নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ। অজ্ঞানরূপ আবরণ অপগত হইলে, আত্মা স্ব-স্বরূপে যতক্ষণ অবস্থিত না হয়েন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ, অজ্ঞান বশতঃ আত্মাতে নামের ও রূপের কল্পনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ নিরাকার আত্মার নামও নাই, রূপ বা আকারও নাই। তুমি মনে

করিতেছ যে, আমার বিক্রান্ত এই নাম, আমি রাজপুত্র, আমার এই উপাধি, আমি গৌর এবং স্থূল, কিন্তু এই সমস্তই মনঃকল্পিত মাত্র। তোমার আত্মা গৌরও নহেন, স্থূলও নহেন। তাঁহার নামও নাই, উপাধিও নাই। গৌরত্ব-স্থূলত্বাদি শরীরধর্ম্ম সকল তাঁহাতে কল্পিত হয় মাত্র, তাঁহাতে বস্তুতঃ উহারা নাই। ঐ সকল জড়ধর্ম্ম, তাঁহাতেই থাকে, এইরূপ জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞান।

সেই কটুভাষী বালকের আত্মাও দুষ্ট নয়, দরিদ্র নয় এবং কৃশও নয়। আত্মাতে দরিদ্রত্ব, দুষ্টত্ব ও কৃশত্ব কল্পিত মাত্র। রাজত্ব, পুত্রত্ব এবং বিক্রান্ত এই নামবত্তা কল্পিত মাত্র। অতএব রাজপুত্র বলিয়া তোমার অভিমান করা ভ্রম মাত্র। তোমার মত শিক্ষিত বালকের পক্ষে এইরূপ বৃথা অভিমান করা শোভা পায় না। তোমার দৃশ্যমান এই শরীর, পৃথিবী জল তেজ বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। তোমার আত্মা দেহস্বরূপ নয়। তোমার আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ পদার্থ। বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি বশতঃ দেহের ভিন্ন ভিন্নরূপ পরিণাম ঘটিলে আত্মার কোনরূপ পরিণাম ঘটে না। আত্মা অপরিণামী অবিনাশী। জড়দেহ, ভস্মীকৃত বা মৃত্তিকাময় হইয়া গেলেও, চেতন আত্মা ভস্মীকৃত বা মৃত্তিকাময় হইয়া যায় না। আত্মা যেমন এক, তেমন একই থাকেন। আত্মা যদি একরূপ না হয়েন, তাহা হইলে বাল্যকালে

দৃষ্ট কোন একটি পদার্থকে যৌবনকালে স্মরণ করা যাইতে পারে না। কারণ, তোমার বাল্যকালের আত্মা, যৌবনকালের শরীরের ন্যায় ভিন্নরূপ হইয়া যাওয়ায় একরূপ না হওয়ায়, একের দৃষ্ট বস্তুকে, অন্য হইয়া তিনি কিরূপে স্মরণ করিবেন ? স্মরণ করিতেই পারেন না। রামের দৃষ্ট বস্তু শ্যাম স্মরণ করিতে পারে না। যে আত্মা বাল্যকালে ঐ বস্তুটিকে দেখিয়াছিলেন, সে আত্মাটি যৌবনকালে নাই। নূতন শরীরাবয়বের ন্যায় নূতন একটি আত্মা জন্মিয়াছে। সুতরাং যে নাই, সে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে দেখিবে কিরূপে ? অথচ একই রাম বাল্যকালের দৃষ্ট বস্তুকে যৌবনকালে স্মরণ করিয়া থাকে। একই শ্যাম শৈশবে দৃষ্ট একটি বস্তুকে যৌবনে স্মরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, শরীরের অবয়বের বৃদ্ধি ও অপচয়ের ন্যায় আত্মার বৃদ্ধি বা অপচয় হয় না। আত্মা একই পদার্থ। সেইজন্যই উহার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ সম্ভবিতে পারে। নতুবা অসম্ভব হইত। হে বৎস, এক্ষণে বুঝিলে যে, আত্মা অবিকারী পদার্থ। অতএব সেই কটুভাষী দুষ্ট বালকের দুষ্টভাষণে তোমার আত্মার কোন ক্ষতিই হয় নাই এবং উহারা তোমাকে সামান্যরূপে প্রহার করিয়াছে মাত্র, ইহাতে তোমার আত্মার অণুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। এমন কি, যদি তাহারা তোমাকে অতিশয় প্রহার করিয়া তোমার শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত,

তাহা হইলেও তোমার আত্মার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইত না। কারণ, তোমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলে আত্মা ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে না। এমন কি, যুদ্ধে তোমার শরীর অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ছিন্নভিন্ন ও দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেলেও আত্মা ছিন্নভিন্ন ও দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়েন না। খাদ্যপেয় বস্তুর অভাবে শরীরের হ্রাস হইলে আত্মার হ্রাস হয় না। সুতরাং ঐ দুষ্ট বালকের আঘাতে তোমার শরীর আহত হইয়াছে মাত্র, আত্মা আহত হয় নাই বা কোনরূপ বিকৃত হয় নাই। অতএব তোমার দুঃখ প্রকাশ করা বা অভিমান করা বৃথা। আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরের তত্ত্ব শিক্ষা কর। শারীরিক ও মানসিক শোকদুঃখরাশি বিনষ্ট হইয়া যাইবে।”

মদালসার এইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রান্তের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি বালকোচিত দুঃখ এবং রাজপুত্রোচিত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বাল্যকালেই বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অগ্রজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দনও, বাল্যকালেই বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা ঋতধ্বজ, পত্নী মদালসার শিক্ষাদানগুণে তিন পুত্রই সন্ন্যাসী হইল, ইহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার তিনটি পুত্রই সন্ন্যাসী হইল, অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই রাজ্য কে রক্ষা করিবে? রাজার অভাবে রাজ্য

অরাজক ও বিদ্রোহপূর্ণ হইয়া পড়িলে প্রজাবর্গের কষ্ট কে নিবারণ করিবে ? রাজ্যমধ্যে কে শান্তি স্থাপিত করিবে ? এক্ষণে উপায় কি ? এক্ষণে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র অলর্কই একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। অলর্ককে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই রাজ্যের ভাবী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা ঋতধ্বজ পত্নীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং করুণ-স্বরে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে প্রিয়তমে মদালসে, তোমার শিক্ষাদানপ্রভাবে তিন পুত্রেরই সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। এক্ষণে চতুর্থ পুত্র অলর্কেরও যদি ঐরূপ দশা ঘটে, তাহা হইলে আমার অবসানে কে রাজ্য পালন করিবে ? রাজার অভাবে রাজ্য বিদ্রোহপূর্ণ হইয়া রসাতলে যাইবে। প্রজাগণের ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। প্রজাদিগের ভয়ঙ্কর কষ্ট উপস্থিত হইবে। অতএব তুমি, চতুর্থ পুত্রটিকে আর ঐরূপ শিক্ষা দিও না। তাহাকে আর সন্ন্যাসী করিও না। আমি বৃদ্ধাবস্থায় তাহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্তমনে কেবল পরমেশ্বরের আরাধনায় রত থাকিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে তুমি ব্যাঘাত উৎপাদন করিও না। আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া অতি উত্তম কার্য্য। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অলর্ককে রাজনীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিও। তাহা হইলেই এই পুত্রটি

রাজগুণে বিভূষিত হইয়া প্রজাপালনরূপ রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।” মদালসা রাজার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই করিব। যাহাতে আর আপনাকে পরে আক্ষেপ করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগিনী হইলাম জানিবেন। আপনার আজ্ঞানুসারে আমি অলর্ককে রাজনীতি শিক্ষাই দিব, কিন্তু পারমার্থিক শিক্ষাপ্রদান একেবারে বাদ দিব না। পারমার্থিকতত্ত্ব শিক্ষা দিলে পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিবে। পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপরে রাজনীতিশিক্ষা বা রাজনীতিচর্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, উক্ত শিক্ষার পরিণাম শোচনীয় হয় না। পরমেশ্বরই সর্ব্বকার্য্যেই মনুষ্যের একমাত্র আশ্রয়। তিনিই একমাত্র শান্তিদাতা। যদি কোন জননী, পুত্রের হিতকামনা করেন, তাহা হইলে তিনি যেন সর্ব্বাগ্রে পুত্রকে পরমেশ্বরে ভক্তি-মান হইতে শিক্ষা দেন এবং পরমেশ্বরের মহিমা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি জন্মিলে রাজা প্রজারঞ্জনে সমর্থ হয়েন। মহারাজ, আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি অদ্য হইতে অলর্ককে রাজনীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিব।” অনন্তর, অলর্ক যৌবন-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মদালসা তাঁহাকে নিম্নলিখিত রাজ-নীতি উপদেশ সকল প্রদান করিয়াছিলেন :—

“হে বৎস অলর্ক, তুমি ঈদৃক্ উত্তমরূপে রাজ্যশাসন

করিবে, যাহাতে রাজ্যের কোন ব্যক্তিই তোমার নিন্দা না করে এবং তোমার বিপক্ষ না হয়। সুবিবেচনা এবং সুপরামর্শ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিলে রাজা সর্ব্বজনপ্রিয় হয়েন। প্রজার মনে কষ্ট দেওয়াই রাজার পাপ। যিনি প্রজার চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। তুমি রাজা হইয়া কখনও প্রজাস্বত্ব লোপ করিও না। যে রাজ্যে প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিন্দা করে, তাহাকে পাপরাজ্য কহে।

প্রজা, রাজা বা রাজপুরুষ কর্তৃক ক্রমাগত উৎপীড়িত হইলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহী হওয়া প্রজার পক্ষে মহাপাপ। কারণ, মনু বলিয়াছেন, 'রাজা নররূপিণী মাননীয়া মহতী দেবতা।' ঈশ্বরের নিন্দা করিলে যেমন মহাপাপ হয়, তদ্রূপ রাজার নিন্দা করিলেও মহাপাপ হয়। রাজা বালক হইলেও, এবং যে কোন জাতীয় ও যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, তিনি প্রজাসাধারণের মান্য। প্রজা যাহাতে নিন্দা করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা রাজার একান্ত কর্তব্য। প্রজার ধর্ম্মে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং প্রজাগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে রাজার আনুকূল্য করা উচিত। তোমার প্রজাগণ তোমার নিকটে কোন প্রকার অভাবের বা কষ্টের অভিযোগ আনয়ন করিবার পূর্ব্বেই ঐ অভাব ও কষ্টের যথাশক্তি প্রতিকার করিও। প্রজার

সুখস্বচ্ছন্দতাই রাজ্যের সুদৃঢ় মূলভিত্তি। ইহারই উপরে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রজার হিতচিন্তায় সদা রত থাকিও। তাহা হইলেই প্রজাগণ তোমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট থাকিবে। পরস্ত্রী-চিন্তাকে কদাপি মনের মধ্যে স্থান দিও না। মিত্র ও সভাসদগণের চটুবাক্যে কদাপি বিমোহিত হইও না। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয় এই ছয়টি বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া যখন যেখানে যেরূপ বিধেয়, তখন সেখানে সেইরূপ কার্য্য করিবে। প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন হইও। প্রভুশক্তি অব্যাহত থাকিলে রাজপুরুষদিগের দোষে রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় না, রাজ্যে শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না, এবং রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছা-চারিতা লোপ পায়। রাজার মন্ত্রিগণ সুদক্ষ হইলে রাজা তাঁহাদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য নিশ্চিন্তমনে বিদেশভ্রমণ ও মৃগয়ায় গমন করিতে পারেন, বা পররাজ্য আক্রমণে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। রাজার উৎসাহশক্তি অব্যাহত থাকিলে রাজ্যে নানা হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও যুদ্ধে বিজয়লাভাদি সুসিদ্ধ হয়।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারিটি সেনাঙ্গকে সদা পরিপুষ্ট করিয়া রাখিও। যখন কোন দেশ জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিবে, তখন মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ ও আটবিক এই ষট্‌-প্রকার বল সংগ্রহ

করিও। বংশপরম্পরায় রাজসেবায় নিযুক্ত রাজার চিরভক্ত সৈন্যের নাম মৌলবল। রাজার বৃত্তিভোগী সৈন্যের নাম ভৃত্যবল। যুদ্ধকালে গ্রাম হইতে সমাহৃত নির্দ্দিষ্টকাল যাবৎ রাজার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত স্থায়ী শিল্পিপ্রায় সৈন্যের নাম শ্রেণীবল। যুদ্ধকালে রাজার সাহায্যার্থ সমাগত মিত্র-রাজ-সৈন্যের নাম সুহৃদ্বল। উৎকোচ ও ভেদনীতি প্রভৃতি উপায় দ্বারা শত্রুপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনীত সৈন্যের নাম দ্বিষদ্বল। গিরি-কান্তার-বন-সঙ্কটাদি-স্থান-পরিজ্ঞানে কুশল, সর্ব্বত্র গমনাগমনক্ষম, অরণ্যচর সৈন্যের নাম আটবিকবল। ভৃত্যদিগকে স্নেহাস্পদ বন্ধুগণের ন্যায় আদর করিও। মিত্রদিগকে আত্মীয়-বান্ধবগণের ন্যায় সমাদর করিও। মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থিত রাজকীয় কর্ম্মচারিবর্গের উপরে রাজকার্য্যভার সমর্পণ করিয়া কখনও নিশ্চিন্তমনে ভোগবিলাসে রত হইও না। গোপনে সর্ব্বদা তাহাদের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিও। নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা-বর্দ্ধনের জন্য প্রজার রুধিরসম অর্থ শোষণ করিও না। শরণাগত ব্যক্তিকে যে কোন প্রকারে রক্ষা করিও। মহানিষ্টকারী দুর্ম্মতি শত্রুগণকে সমূলে উন্মীলিত করিবার জন্য ভেদ, দণ্ড, সাম ও দান এই চারি প্রকার উপায়ের মধ্যে যে কোন একটিদ্বারা কিম্বা সমগ্র চারিটি উপায়দ্বারা স্বীয়কার্য্য সাধন

করিবে। কিন্তু সহসা যুদ্ধ বাধাইও না, যাঁহার যেরূপ মানমর্য্যাদা, তাঁহাকে সেইরূপ মানমর্য্যাদা দিও। মানী-ব্যক্তির মানহানি বা মর্য্যাদাভঙ্গ করিও না। ভঙ্গ করিলে কালে মহাবিপন্ন হইবে। গুণীর গুণের সমাদর করিও। মধ্যে মধ্যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করিয়া বেদবিৎ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা করিও এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দক্ষিণাদানে তৃপ্ত করিও। কারণ, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া নিশ্চিন্তমনে বৈদিকশাস্ত্র-চর্চ্চায় এবং বৈদিক-ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলে বৈদিকধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। উহা লুপ্ত হইবে না। দ্যূতক্রীড়া, পানদোষ, দিবানিদ্রা, ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তির জন্য অত্যধিক ভোগাসক্তি, পরনিন্দা, কুসংসর্গ ও ব্যভিচার প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিও। লোভ ও মোহকে বিশেষরূপে ত্যাগ করিও। রাজ্যবিষয়ক অতি গুপ্ত মন্ত্রণা যেন ষট্‌কর্ণে প্রবেশ না করে। অর্থাৎ তুমি ও তোমার প্রধান মন্ত্রী এই দুইজনের চারি কর্ণেই মাত্র যেন উহা প্রবিষ্ট হইয়া স্থির থাকে। অতি বিশ্বস্ত প্রধান গুপ্তচরদ্বারা নিজের প্রজাবর্গের ও পররাজ্যের অবস্থা অবগত হইবে। কোন মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রী বা সৈন্যাধ্যক্ষ বা কতিপয় প্রজা, তোমার বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র বা মহাপরাধজনক কোন দূষণীয় কার্য্য করিলে তুমি উহা সবিশেষ অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবে।

প্রজারা যদি তোমার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা কখনই রাজদ্রোহী বা বিদ্রোহী হইবে না, ইহা নিশ্চয়ই জানিও। তাহারা যাহাতে সদা অনুরক্ত থাকে, তদ্বিষয়ে সদা সবিশেষ মনোযোগী হইও। সামন্ত-রাজ ও মিত্ররাজগণের স্বত্ব ও সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাঁহা-দিগের রাজধানীতে রাজনীতিসুপণ্ডিত নিজের একটি মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়া রাখিও। যাহাদিগকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করা উচিত নয় বলিয়া মনে করিবে, তাহারা যেন তোমার এই আন্তরিক অবিশ্বাসের কোন প্রকার বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া কোনরূপে তোমার এই অবিশ্বাস-ভাব বুঝিতে না পারে। মিষ্টভাষী হইও। কোকিলের মধুর বাণী অনুকরণ করিও। মধুকরের নিকট হইতে পরিশ্রম পূর্ব্বক সারবস্তু-সংগ্রহকার্য্য শিক্ষা করিও। মৃগের নিকট হইতে সাবধানতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা শিক্ষা করিও। কাকের নিকট হইতে গুপ্তমন্ত্রণারক্ষা শিক্ষা করিও। পিপীলিকার নিকট হইতে সঞ্চয়কার্য্য শিক্ষা করিও। সূর্য্যদেব, বর্ষাকালে শতগুণ বারিধারা-বর্ষণের জন্যই যেমন গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণী, নদী ও সমুদ্র হইতে জলশোষণ করেন, তদ্রূপ তুমিও শতগুণ উপকার-বর্ষণের জন্যই প্রজাগণের নিকট হইতে কর-শুল্ক প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিও। কোন ব্যক্তি প্রিয়ই

হউক বা অপ্রিয়ই হউক, সে শাস্ত্রমতে দণ্ডনায় হইলেই তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিও। পবন যেমন অদৃশ্যভাবে সর্ব্বত্র গমন করে, তদ্রূপ, তুমিও, ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া অপরিজ্ঞাতরূপে প্রজাগণের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিও। শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করিও না। রাজা ক্লেশ-সহনশক্তি অবলম্বন না করিলে যুদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না। যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন না করিলে বীরপদবাচ্য হইতে পারে না। রাজার বীরপদবাচ্য হওয়া উচিত। বাল্যকাল হইতে রাজা যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করিয়া সুনিপুণ যোদ্ধা হইলে সৈন্যাধ্যক্ষের দোষে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে না। হে বৎস, তুমি যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে চেষ্টা করিও। যুদ্ধে সুনিপুণ হইও। প্রজা-প্রতিপালনে প্রজার অভাব পূরণ ও প্রজাসুখসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত ক্লেশসহন করাই রাজার ধর্ম্ম। রাজা যদি এই ধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া কেবল শরীর-শোভা এবং বসন-ভূষণের উজ্জ্বলতা দেখাইবার জন্যই সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন, তাহা হইলে তাদৃশ রাজা কখনই প্রজারঞ্জক বা প্রজাপ্রিয় হইতে পারেন না। তাঁহার রাজ্যে রুদ্রদণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হইলেও পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত হয় না। রুদ্রদণ্ডের ভয়ে তৎকালে প্রজাগণের মধ্যে কোন কোন লোকের

বাহিরে বিদ্রোহভাব প্রকাশিত না হইলেও অন্তরে বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইয়া বহুকাল অবস্থিতি করে। সুবিধা পাইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন সেই দাবানলতুল্য বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে রাজাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য বলিতেছি, হে বৎস, তুমি সার্থক রাজপদবাচ্য হইও।

"প্রজার চিত্তরঞ্জক"ই 'রাজা' এই পদের প্রকৃত অর্থ; সুতরাং প্রজার চিত্তরঞ্জক হইয়াই তুমি তোমার "রাজা" এই উপাধিটিকে সার্থক করিও। যখন দেখিবে যে, যুদ্ধ না করিলে আর কোন উপায়ই নাই, তখনই যুদ্ধ করিবে। নতুবা সর্ব্বদা যুদ্ধের পক্ষপাতী হইও না, কারণ, যুদ্ধে প্রভূত ব্যয় হয় এবং বহু নরশোণিত ক্ষয় হয়। যুদ্ধে প্রভূত ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য করা এবং পৃথিবীতে নররক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করা কোন প্রকারেই উচিত নয়।" শান্তিপক্ষপাতিনী মদালসা, ইত্যাদিরূপে কনিষ্ঠপুত্র অলর্ককে প্রতিদিন নানাবিধ রাজনীতি উপদেশপ্রদান ও নানা বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া কয়েক বর্ষের মধ্যে তাঁহাকে রাজা হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি করিয়া দিলেন। তখন রাজা ঋতধ্বজ বুঝিলেন যে, তাঁহার পত্নী মদালসা কেবলমাত্র মুক্তিশাস্ত্রেই সুপণ্ডিতা নহেন, কিন্তু তিনি রাজনীতিশাস্ত্রেও অসাধারণ বিদুষী। তাঁহারই শিক্ষাপ্রদানের গুণে কনিষ্ঠ পুত্র

অলর্ক রাজপদে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে রাজা ঋতধ্বজ অলর্ককে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার উপযুক্ত স্থির করিয়া শুভদিনে ও শুভক্ষণে তাঁহাকে যথাবিধি সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি কোলাহল-পূর্ণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধবয়সে একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য রাজ্ঞী মদালসার সহিত শান্তিপূর্ণ তপোবনে বাস করিতে উদ্যোগী হইলেন। মদালসা তপোবনে গমন করিবার পূর্ব্বে অলর্ককে একটি প্রশস্ত অঙ্গুরীয়ক দান করিয়া বলিলেন, "বৎস, যখন তোমার ক্লেশ অসহ্য হইয়া উঠিবে, যখন তুমি শত্রু কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ঘোর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং যখন কোন কারণবশতঃ তোমার ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইবে, তখন এই প্রশস্ত অঙ্গুরীয়কে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিবে।" কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে এই কথা বলিয়া শান্তিপক্ষপাতিনী মহাপণ্ডিতা মদালসা রাজা ঋতধ্বজের সহিত তপোবনে গমন করিলেন। তার পর রাজা অলর্ক, মাতৃদত্ত রাজনীতি-উপদেশ অনুসারে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রজাগণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সচ্চরিত্রের ও রাজ্যশাসন-শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। সকলেই তাঁহার রাজ্যকে রামরাজ্য বলিয়া

কীর্ত্তন করিতে লাগিল। দুঃখ কাহাকে বলে, এ রাজ্যের প্রজারা তাহা জানিত না। রাজা অলর্কের এইরূপ প্রশংসাবাদে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহু বৈরাগ্য-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য তাঁহার পরম শত্রু বারাণসী-রাজের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। বারাণসী-রাজ, রাজনীতি-নিয়মানুসারে রাজা অলর্কের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, রাজকুমার সুবাহু আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি এক্ষণে রাজ্যাভিলাষী। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্র অনুসারে তিনিই রাজ্যের অধিকারী। অতএব আপনি তাঁহার হস্তে আপনার রাজ্য-ভার সমর্পণ করিবেন। নতুবা আপনার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণা করিবেন। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিব। রাজা অলর্ক, দূতমুখে বারাণসীরাজের কথা শুনিয়া দূতকে বলিলেন,—'আমার পিতা ও মাতা আমাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব আমি কেবলমাত্র বারাণসীরাজের কথায় ভীত হইয়া আমার জ্যেষ্ঠের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিব না। তিনি যেমন যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, আমিও তদ্রূপ বলিতেছি যে, আমিও বিনা যুদ্ধে আমার রাজ্য কাহাকেও প্রদান করিব না। আমি নিজ দূত পাঠাইয়া এ কথা

বারাণসীরাজকে জানাইতে অপমান বোধ করি। অতএব আমি তাঁহারই দূত দ্বারা তাঁহাকে এই কথা জানাইলাম।' বারাণসীরাজের দূত এই কথা শুনিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল এবং যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজা অলর্কের কথা বারাণসীরাজকে জানাইল। বারাণসী-রাজ সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বারাণসীরাজের অধিক-সংখ্যক ভীষণ সৈন্য ও যুদ্ধোপ-করণ থাকায় রাজা অলর্ক সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। এই বিপদের সময় তাঁহার মাতৃদত্ত সেই অঙ্গুরীয়কের কথা মনে পড়িল। তিনি সেই অঙ্গুরীয়কে লিখিত এই কথাগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"মূঢ় সংসারাসক্ত মনুষ্যগণের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধুসঙ্গ করাই বিধেয়। সাংসারিক কামনা দূর করাই শ্রেয়ঃ। মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়াই উচিত। মুক্তিই বিষাদ-রোগের একমাত্র মহৌষধ।" রাজা অলর্ক, মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়কে লিখিত এই কথাগুলি পাঠ করিয়া রাজ্যচ্যুতি-জনিত শোক সম্বরণ করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহুর ন্যায় বকধার্ম্মিক ছিলেন না। সুবাহুর বৈরাগ্য জলবুদ্বুদের তুল্য ক্ষণিক হইয়াছিল। তাঁহার যদি

দৃঢ়-বৈরাগ্যই জন্মিত, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতার নিকট হইতে মাতৃপিতৃদত্ত রাজ্য অবৈধ উপায়ে কাড়িয়া লইতেন না এবং পুনরায় অনিত্য সাংসারিক সুখভোগের নিমিত্ত লালায়িত হইতেন না। প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে জ্ঞানী-ব্যক্তি পুনরায় ভোগবিলাসপঙ্কে মগ্ন হইতে ইচ্ছা করেন না। জ্ঞান না জন্মিলে বৈরাগ্য জন্মে না। অলর্ক বিপদে পড়িয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং সেই কারণে তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর দুঃখ-শোকপূর্ণ অনিত্য রাজ্যসম্পদের প্রতি তাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। বিপদে পড়িয়া কষ্টভোগ করিলে যেরূপ শিক্ষালাভ করা যায়, দেখিয়া শুনিয়া বা পড়িয়া ঠিক সেরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারা যায় না। মাতার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া সুবাহুর ক্ষণিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং প্রকৃত স্থায়ী বৈরাগ্যও উৎপন্ন হয় নাই। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান ও প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে তিনি প্রথমে উপেক্ষিত রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি-লালসায় বারাণসীরাজের দ্বারে শরণাপন্ন হইতেন না। অলর্কের অঙ্গুরীয়কে যাহা লিখিত ছিল, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, রাজ্য আজ আছে কাল নাই, কাল থাকে তো পরশ্ব থাকে না। ঈদৃশ অস্থায়ী রাজ্যের ভোগ-প্রত্যাশায় মত্ত হওয়া জ্ঞানী ও বীতরাগ ব্যক্তির পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।

সুলভা।

একদা মহারাজ জনকের রাজসভায় সুলভানাম্নী এক ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" সুলভা বলিলেন,—"আমি এক রাজকন্যা। একটি উচ্চ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম সুলভা। আমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-সমাপ্তির পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং অন্যান্য নানাসদ্‌গুণে বিভূষিত পাত্র পাওয়া গেল না বলিয়া আমি বিবাহ করি নাই। আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভের জন্য একাকিনী মুনিধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি।" এই চিরব্রহ্মচারিণী সুলভা, তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। মহারাজ জনক স্বয়ং একজন জীবন্মুক্ত মহা-পুরুষ ছিলেন। মহামুনি ব্যাসের পুত্র আজন্ম তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা শুকদেব পর্য্যন্ত জনকের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজসভা সর্ব্বদা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহামনাঃ আর্য্য-মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত থাকিত। সেখানে সাধারণ পল্লবগ্রাহী "ভবঘুরে" লোক পাণ্ডিত্য দেখাইতে সাহসী হইত না। কোন শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য না থাকিলে সে সভায়

কেহ প্রবেশাধিকার পাইত না। ঈদৃশী সভায় ঈদৃশ জ্ঞানী মহারাজের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে স্পষ্ট কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আলাপ করা একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নয়।

সুলভা, মহারাজ জনককেও মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ধন্য ধন্য আমাদের সেই সুশিক্ষার আকর সুসভ্য প্রাচীন ভারতবর্ষ! যে ভারতবর্ষের একটি মহিলা তাদৃশী সভায় ঈদৃশ জীবন্মুক্ত মহাত্মা মহারাজ জনককেও জ্ঞান-গরিমা প্রদর্শন করিয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন, ঈদৃশ উন্নত ভারত অধুনা গতসর্ব্বস্ব ও মৃতপ্রায় হইলেও ধন্য ও প্রশংসার্হ। তৎকালে স্ত্রীলোক, উপযুক্ত পাত্র না পাইলে বিবাহই করিত না। কিন্তু আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরে বিলীন হওয়াই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিত। যে কোন প্রকার একটা পতির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাত্রিদিন কলহে শরীর ক্ষয় করিত না এবং নিজের মনের অশান্তি নিজে বর্দ্ধিত করিত না, দশগণ্ডা সন্তান প্রসব করিয়া ভূভার বর্দ্ধন করিত না, দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বিব্রত হইত না, কন্যার বিবাহের ব্যয়-ভাবনায় অস্থির হইত না এবং কন্যার শ্বশুরালয়ের গঞ্জনার কথা শুনিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিত না। পৌরাণিক যুগের পর বৌদ্ধ-যুগেও,

নরনারীগণ, এই সকল সাংসারিক ক্লেশ বুঝিতে পারিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম-প্রতিপালনে অনাস্থা প্রদর্শন করিত এবং দলে দলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিত। বৌদ্ধ-যুগে সন্ন্যাসীর সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ঐ বর্দ্ধিত সংখ্যা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক একটি আশ্রমে বা বিদ্যালয়ে বহু সহস্র স্ত্রীলোক বাস করিত। এত অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোকের বাসের জন্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। কাশীর সারনাথের একটি মহিলা-বিদ্যালয়ে দশ সহস্র বৌদ্ধ-মহিলা বাস করিত। ইহাদের অশন, বসন ও পুস্তক সকল তাৎকালিক বৌদ্ধ রাজার এবং কুবের তুল্য বণিক্‌গণই প্রদান করিতেন। সন্ন্যাসীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে সন্ন্যাসি-সমাজে নানাবিধ দোষ প্রবেশ করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ-বাক্যের ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ বুঝিয়া এই ধর্ম্মের নানাবিধ শাখার সৃষ্টি করিতে লাগিল। বৌদ্ধ-সমাজে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ভারতের অন্যান্য ধর্ম্ম-সমাজের প্রভূত অনিষ্টসাধন করিতে লাগিল। বৌদ্ধযুগের শেষভাগে এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবে যখন ভারতবর্ষ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তখন পরমেশ্বরের সদিচ্ছায় শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত সনাতন সত্য আর্য্য-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের ও ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু বা যতির

চারিটি আশ্রমের পুনর্ব্বিভাগের নিমিত্ত শিবাবতার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মবিপ্লবযুগে চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের মহা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়া ঈশ্বরের সদিচ্ছারূপ 'স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন-যুগ আবার আরব্ধ হইল। সামাজিক প্রথা-প্রচলন এই নিয়মেই এইরূপেই আরব্ধ হয়। নতুবা এইরূপ বুঝা ঠিক নয় যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ একদিন হঠাৎ একটি সভা করিয়া কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই প্রচার করিয়া দিলেন যে, কল্য হইতে আমাদের ব্যবস্থা অনুসারে দেশের লোক জাতিভেদ ও আশ্রমভেদ যেন অবশ্য অবশ্য মানে। আর তার ঠিক পরদিন হইতেই অমনি জাতিভেদ ও আশ্রমভেদ-প্রথা প্রচলিত হইতে লাগিল। এইরূপে বর্ণাশ্রম-বিভাগের প্রথা কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অবস্থানুসারেই ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে এবং হইয়া থাকে। স্মৃতিযুগ বা সংহিতা-যুগও এইরূপেই আরব্ধ হইয়াছিল। বৈদিক-যুগের শেষভাগে যজ্ঞের ব্যপদেশে (অছিলায়) উদর-পূরণার্থ অসংখ্য গোহত্যা করা হইত। দেশে কুষ্ঠ-ব্যাধির মাত্রা ও দুগ্ধাভাবের ভীষণ চিন্তা বাড়িতে লাগিল। দেশে গোহত্যাপ্রথা রহিত করিবার মহা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতে লাগিল। তখন ঋষিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্র

প্রণীত হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত সামাজিক নিয়মানুসারে বৈদিক-যুগের গোহত্যা-প্রথা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছিল।

শবরী।

ভট্টি-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে লিখিত আছে যে, একদা দশরথ-পুত্র রামচন্দ্র যখন সীতাবিরহে অধীর হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ চির-ব্রহ্মচারিণী মহাপণ্ডিতা যোগিনীশ্রেষ্ঠা *শ্রমণা-নাম্নী সিদ্ধ শবরীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইল। তাঁহাদের এইরূপ বোধ হইল, যেন তাঁহারা দুই ভ্রাতা দিব্য "জুড়ীগাড়ীতে" আরোহণ করিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। পদব্রজে অরণ্য-ভ্রমণের মহাক্লেশ মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। শবরী সুবিখ্যাতা পবিত্রা পুষ্যা তারার ন্যায় পবিত্র-চরিত্রা ও মঙ্গলময়ী ছিলেন। তিনি বল্কল পরিধান করিতেন। পুরুষ-সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার কটিদেশ মুঞ্জনির্ম্মিত কটিবন্ধে আবদ্ধ ছিল। কঠোর যোগাভ্যাসে তাঁহার দেহ ক্ষীণ

হইয়া গিয়াছিল। তিনি পুরুষ-ব্রহ্মচারীর ন্যায় পলাশ-দণ্ড ধারণ করিতেন। মৃগচর্ম্মোপরি উপবেশন করিতেন। খলতা-কুটিলতাদি দোষে তাঁহার চিত্ত কখনও বিকৃত হয় নাই। তাঁহার চিত্ত ও চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তিনি সাধ্বী ও সরলা ছিলেন। তিনি দেব-পক্ষপাতিনী, আনন্দিতা ও সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে রতা ছিলেন। যে সকল ফল ও মূল ভক্ষণ করিলে ইন্দ্রিয়ের বা চিত্তের বিকার জন্মে, তাদৃশ ফলমূল তিনি কখনও ভক্ষণ করিতেন না। তিনি দুগ্ধ ও সাত্ত্বিক ফলমূলমাত্র আহার করিতেন। তিনি অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শিনী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঈদৃশী যোগিনী পণ্ডিতা শবরীকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন :—

"আপনি অমাবস্যা তিথিতে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য উত্তমোত্তম সুস্বাদু ফলাদি দ্রব্য দ্বারা পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন কি? আপনি কি ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন? আপনি কি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া সোমলতাকে নমস্কার করেন? প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনের সময় আপনি কি যথাবিধি আচমন করেন? অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত আপনি কি আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-কথার আলাপ

করেন? তপস্যাচরণে কোন ক্লেশ বোধ করেন কি? যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন কি?”

শবরী এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিলেন, “হে ভগবন্, তপস্যানুষ্ঠান-বিষয়ে আপনি কৃপাপূর্ব্বক যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সকল যথাশক্তি নির্ব্বাহ করিতেছি। ঐ সকল বিষয়ে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। সকলই কুশল জানিবেন। তপোনুষ্ঠানে ক্লেশ বোধ করি না। যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছি।” ভট্টি-কাব্যের শবরীর বর্ণনা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকও পলাশ-দণ্ড ধারণ করিত, মুঞ্জনির্ম্মিত কটিবন্ধ ধারণ করিতে পারিত, অমাবস্যাদি পুণ্য-তিথিতে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে পারিত, মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিতে পারিত, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিতে পারিত, জ্ঞানী সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা বা আলাপ করিতে পারিত, যোগাভ্যাস করিতে পারিত, যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপথে যাইবার অধিকারিণী হইতে পারিত এবং নিজ তপঃপ্রভাবে বা নিজের গুণে পরমেশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্রেরও অন্বেষণীয়া, মান্যা ও আদরণীয়া হইতে পারিত। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক নিজেই হোম করিত, পূজা করিত ও তর্পণাদি ক্রিয়া করিত। পুরোহিত মহাশয়ের আগমন-প্রতীক্ষায় থাকিয়া অকালে অপ্রশস্ত ক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উহা পণ্ড করিত না।

কোন কোন পুরোহিত মহাশয় আড়াই দণ্ডমাত্র স্থায়িনী কোন একটি শুভ তিথিতে ছাপ্পান্ন জন যজমানের বাটীতে লক্ষ্মীপূজা সারিয়া থাকেন বলিয়া, পাছে ঐরূপ একজন পুরোহিত ঐরূপে অসময়ে অবিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম পণ্ড করেন, এই ভয়ে পূর্ব্বকালের শিক্ষিতা ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা যথাসময়ে পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট শুভ-ক্ষণে নিজেরাই ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা এই শাস্ত্রবাক্য মানিতেন যে, "অকালে লক্ষ-কোটি হোম করা অপেক্ষা প্রকৃত কালে শুভমুহূর্ত্তে একটিমাত্র আহুতি প্রদান করাও ভাল। পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হইবে, এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা পুরোহিতকে ডাকিতেন না, নিজেরাই হোম-পূজাদি ক্রিয়া করিতেন, এইরূপ বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারণ, দরিদ্র বা মধ্যমবিত্ত লোক সকল পুরোহিতকে না ডাকিলে এইরূপ বিবেচনা অনেকে করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু সম্রাটের প্রাসাদে সম্রাজ্ঞীর দক্ষিণা দিবার ভয় হইবে কেন? তাঁহার কি অর্থের অভাব ছিল? না, বদান্যতার অভাব ছিল? তিনি নিজেই পূজা-হোমাদি করিতেন। সর্ব্বদা পুরোহিতকে ডাকা হইত না। বিবাহ-উপনয়নাদি প্রধান প্রধান ক্রিয়ার সময় পুরোহিতকে ডাকা হইত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের বিংশতিতম অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাট্ দশরথের পত্নী সম্রাজ্ঞী কৌশল্যা পট্টবস্ত্র পরিধান

করিয়া হৃষ্টচিত্তে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিয়াছিলেন।

আত্রেয়ী।

যে সামবেদের সুমধুর গানে আকৃষ্ট হইয়া ঋষিগণের তপোবনে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি ভীষণ জীব, হরিণ-শশকাদি শান্তস্বভাব জন্তুর প্রতি স্বাভাবিক আজন্ম শত্রুভাব ত্যাগ করিত এবং এক তপোবনে স্বজাতির ন্যায় পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া একত্র বাস করিত, সেই সামবেদের চিরশান্তিকর সুমধুর গান, পূর্ব্বকালের ভারত-মহিলাগণও মহাযত্ন ও পরিশ্রমের সহিত শিক্ষা করিতেন এবং উহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন। সামবেদ অধ্যয়নের জন্য তাঁহাদের ছাত্রী-জীবনের কঠোর সহিষ্ণুতা, কঠিন প্রতিজ্ঞা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের উচ্চশিক্ষার শতাংশের এক অংশও আধুনিক নরনারীগণ অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই। অধুনা স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যেমন কোন স্থলে পাঠের অসুবিধা হইলে "ট্রান্সফর্ সার্টিফিকেট" লইয়া অন্যত্র পড়িতে যায়, তদ্রূপ পূর্ব্বকালেও কোন ঋষির আশ্রমে পাঠের বিঘ্ন বা অসুবিধা উপস্থিত হইলে ঋষির অনুমতি

লইয়া ছাত্রীরা অন্যত্র পড়িতে যাইতেন। মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত উত্তরচরিতনামক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি বাল্মীকির ছাত্রী আত্রেয়ীকে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আর্য্যে আত্রেয়ি, কি জন্য আপনি এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিয়াছেন? এত পরিশ্রম করিয়া, এতদূর পর্য্যটন করিয়া আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?" আত্রেয়ী বলিলেন, "শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্য-প্রমুখ মহর্ষিগণ বাস করেন। তাঁহারা সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে গীয়মান সামবেদের পারদর্শী আচার্য্য। তাঁহাদের নিকটে সাম ও অন্যান্য বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদি শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিবার জন্য মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম হইতে পর্য্যটন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? যখন অন্যান্য মহামতি মুনিগণ সেই প্রাচীন বেদাচার্য্য মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে স্বচ্ছন্দে ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাসন্তোষলাভ করিতেছেন এবং তাঁহার সেবায় আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তখন আপনি তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যপ্রদেশে আসিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যয়নার্থ প্রয়াসিনী হইয়াছ কেন?"

আত্রেয়ী বলিলেন, "তথায় অধ্যয়নের মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।" বাসন্তী

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকার বিঘ্ন?" আত্রেয়ী বলিলেন—"কোন এক ব্যক্তি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে দুইটি শিশুকে কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা দুইটি অতি অল্পবয়স্ক শিশু। তাহারা সবেমাত্র মাতার স্তনদুগ্ধ-পানের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ শিশু দুইটিকে দেখিলেই কেবলমাত্র ঋষিদের কেন, জগতের সমস্ত প্রাণীরই হৃদয়ে স্নেহ-তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। সকলেই তাহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।" বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের নাম দুইটি আপনার মনে আছে কি?" আত্রেয়ী বলিলেন, "যে ব্যক্তি উহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি উহাদের কুশ ও লব এই দুইটি নাম ও উহাদের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।" বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ প্রভাব?" আত্রেয়ী বলিলেন—"উহারা দুই ভাই জন্মকাল হইতেই জৃম্ভকনামক অস্ত্রবিদ্যায় আশ্চর্য্যরূপে অভ্যস্ত। এই জৃম্ভকনামক অস্ত্রটিও একটি অদ্ভুত অস্ত্র। একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে উহা বিপক্ষীয় সৈন্যগণের উপরে পতিত হইয়া উহাদিগকে অচেতন ও নিস্পন্দ করিয়া ফেলে। তখন অতি সহজেই তাহাদিগকে নিহত করিয়া যুদ্ধে অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারা যায় এবং অন্য একটি মন্ত্র পাঠ করিলেই ঐ অস্ত্রটি প্রয়োগ-কারীর নিকটে আবার ফিরিয়া আইসে।" বাসন্তী

বলিলেন—"ইহা তো, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহা মহা-আশ্চর্য্যজনক সংবাদ! আত্রেয়ী বলিলেন,—"মহর্ষি বাল্মীকি এই শিশু দুইটির জন্মকালে নিজেই উহাদের ধাত্রীর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন এবং তৎকাল হইতে উহাদিগকে মহাযত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি উহাদের চূড়াকর্ম্ম-সংস্কার সম্পাদন করিয়া তিনটি বেদ ব্যতিরেকে নানাবিদ্যা শিখাইয়াছেন। তৎপরে একাদশ বর্ষ বয়সে উহাদের ক্ষত্রিয়োচিত বিধি অনুসারে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিয়া উহাদিগকে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছেন। এই শিশু দুইটির বুদ্ধি ও মেধা এতই প্রখর যে, তাহাদের সহিত একসঙ্গে অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য আমি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এই দূরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে অধ্যয়নার্থ আসিতে বাধ্য হইয়াছি।" আত্রেয়ীর অধ্যয়নেচ্ছা এতই প্রবল যে, বাল্মীকির আশ্রমে সেই ছাত্র দুইটির সঙ্গে একত্র অধ্যয়ন করা অসম্ভব হওয়াতে তিনি, ভীষণ বন্যজন্তুসমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যানী, গিরিপথ, দুষ্পার নদনদী এবং নানাদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের নিকটে বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য একাকিনী আগমন করিয়াছিলেন।

তৎকালে দণ্ডকারণ্যে নিগমান্তবিদ্যাপারদর্শী অগস্ত্য-

প্রমুখ বহুসংখ্যক মহর্ষি বাস করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্যের অনেক শিষ্য ছিল। তিনি তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া নিজ গৃহে অধ্যয়ন করাইতেন। এখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তু সকল এবং মৃগ-শশকাদি শান্তস্বভাব পশুগণ মহর্ষির ও তাঁহার শিষ্যবর্গের সুমধুর সাম-গান-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পড়িত এবং তাঁহাদের শমদমাদি ভাব অনুকরণ করিয়া পরস্পর বৈরিভাব পরিত্যাগ করিত। এখানে নগরের কোলাহল এবং হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিতেই পারিত না। দণ্ডকারণ্য এই সকল অপবিত্র ভাব তাড়াইবার দণ্ডস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিত এবং সর্ব্বদা ঋষিগণের হৃদয়ে শান্তিরস বর্ষণ করিত। এখানে ঋষিগণ সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিয়া সর্ব্ব-মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। এখানে ব্রহ্মতত্ত্বশিক্ষারূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতম শিক্ষা প্রদত্ত হইত। পরমাত্মতত্ত্বশিক্ষা হইতে উচ্চশিক্ষা এ জগতে আর কি হইতে পারে? কোন শিক্ষাই হইতে পারে না। আত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য-মহিলারা আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জড়তত্ত্ব-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য যত্নবতী হইতেন না। যে বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাদৃশ বিজ্ঞান-শিক্ষার্থ গুরুতর ক্লেশ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একস্থানে অধ্যয়নের অসুবিধা হইলে স্থানান্তরে গিয়াও অধ্যয়ন করিতেন। পথক্লেশকে

তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা যে বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণান্তেও তাহা ত্যাগ করিতেন না। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত মহাকবি ভবভূতি তৎকালের ছাত্রী-জীবনের এই চিত্রটি নিজের উত্তর-চরিতনাটকে অঙ্কিত করিয়াছেন। অগস্ত্য ও তাঁহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া পবিত্রচরিত্রা আদর্শ-পতিব্রতা বিদুষী লোপামুদ্রা, ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে এই পরমাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন।

কামন্দকী।

মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধবনামক নাটকে কামন্দকীর কথা পড়িয়া এই বোধ হয় যে, বৌদ্ধযুগের ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ-প্রণীত মূল স্মৃতিশাস্ত্র সকল যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্মৃতির ঐ সকল প্রাচীন মূল-গ্রন্থে তাঁহারা মহাবিদুষী ছিলেন। তাঁহারা আধুনিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের ন্যায় রঘুনন্দন-প্রভৃতির সংকলিত-স্মৃতিগ্রন্থমাত্র অধ্যয়ন করিয়া স্মার্ত্ত বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহারা আধুনিক স্মার্ত্তদিগের ন্যায় স্মৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র পাঠ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র-পাঠ শেষ করিতেন না, কিন্তু

মহর্ষিগণ-প্রণীত স্মৃতির প্রাচীন মূলগ্রন্থ সকল যথাবিধি পাঠ করিতেন, অভ্যাস করিয়া স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন এবং প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ মহর্ষি-বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহাদের ঈদৃশ পাণ্ডিত্য দেখিয়া ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য ও অলঙ্কার-প্রভৃতি শাস্ত্রও অবশ্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিতেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্বপ্রথম কেহ কোন দেশে স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করে না এবং করা উচিতও নয়। বিবাহকালে "শুভদৃষ্টির" সময় বর ও বধূর কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কামন্দকী যাহা উপদেশ করিয়াছেন, সেই উপদেশ-বাক্য তাঁহার নিজের মনঃকল্পিত নয়, কিন্তু তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার বাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াই ঐ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বকালের বিদ্বান্ ও বিদুষীরা উপদেশ দিবার সময় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের কিম্বা প্রাচীন প্রামাণিক শিষ্ট গ্রন্থকারের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, কিন্তু আধুনিক পল্লবগ্রাহী গ্রন্থকারের ন্যায় কেবল স্বীয় মন্তব্যে গ্রন্থকলেবর পূর্ণ করিতেন না। কামন্দকী বলিয়াছেন, বিবাহকালে "শুভদৃষ্টির" সময় বর ও বধূ যদি পরস্পরের প্রতি বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা প্রগাঢ়

অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ মহাসৌভাগ্য সূচিত হইয়া থাকে। মহর্ষি অঙ্গিরাঃ বলিয়াছেন যে, বধূ বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা বরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনিই ভবিষ্যতে অতিশয় সৌভাগ্যবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হয়েন।

বৌদ্ধযুগে নরনারীর একত্র অধ্যয়ন।

বৌদ্ধযুগে নরনারীগণ এক বিদ্যালয়ে বাস করিয়া একত্রে বসিয়া এক গুরুর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মালতীমাধবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কামন্দকী লবঙ্গিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"অয়ি প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমি কি জান না ? তোমার কি মনে পড়িতেছে না যে, পাঠাবস্থায় আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, একত্র বসিয়া যখন এক গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিতাম, সেই সময়ে নানাদিক্-দেশ হইতে আগত ছাত্রগণের সহিত আমাদের সাহচর্য্য হইত। তাহারা আমাদের সহপাঠী হইত। সেই সময়ে আমাদের সহপাঠি-ছাত্রগণের মধ্যে ভূরিবসু ও দেবরাতনামক দুইটি ছাত্র আমাদের প্রিয়সখী সৌদামিনীর সমক্ষে পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে তাহারা দুই জন একের পুত্রের সহিত

অপরের কন্যার বিবাহ দিবে? তোমার কি ইহা মনে পড়িতেছে না?" কামন্দকীর এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্ধযুগে ছাত্র ও ছাত্রীগণ এক আশ্রমে বাস করিয়া একত্র বসিয়া এক গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিত। পূর্ব্বকালে ভারতের লোকের যেরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, প্রকৃত ভ্রাতৃভাব, সত্যবাদিতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, অধুনা কালধর্ম্ম-প্রভাবে লোকের ঐ সকল গুণ ক্রমশঃ না থাকায় ঐরূপ অধ্যয়নরীতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধযুগে নারীগণ যে কেবলমাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া ছাত্রীজীবনের কার্য্য শেষ করিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মহিলাগণের ন্যায় মুক্তিতত্ত্ব-শাস্ত্রও যথাবিধি অধ্যয়ন করিতেন। মালতীমাধবে দেখিতে পাওয়া যায়, মালতী বলিতেছেন যে, আমি সম্প্রতি কি উপায়ে মরণ ও নির্ব্বাণমোক্ষের পার্থক্য অবগত হইব? মালতীর এই উক্তি হইতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্য অবগতির নিমিত্ত উৎ-কণ্ঠিতা হইয়াছিলেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মরণ ও নির্ব্বাণমুক্তি এক পদার্থ নয়। মরণ ও নির্ব্বাণ-মুক্তি এক পদার্থ হইলে তাহাদের পার্থক্য অবগতির জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যগ্র হইত না এবং উহাদের পার্থক্য-জ্ঞানের জন্য ইচ্ছাও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত না। মরণ ও

নির্ব্বাণমুক্তি এক পদার্থ নয় বলিয়াই মালতী স্বতন্ত্ররূপে এই দুই বস্তুকে জানিবার জন্য আগ্রহবতী হইয়াছিলেন।

সৌদামিনী।

কামন্দকীর একটি ছাত্রী ছিল, তাহার নাম সৌদামিনী। সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। তার পর কামন্দকীর অধ্যাপনা-প্রভাবে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং নানাবিধ তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি মন্ত্র, জপ, পূজা ও হোমাদি করিতেন এবং কামন্দকী ও অন্যান্য গুরুর নিকটে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইদানীং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যেমন বিবাদ-বিসংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে সেরূপ বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিত না। বৌদ্ধ-মহিলারাও হিন্দুদিগের প্রাচীন মুল স্মৃতি-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগের ঐ সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ বাক্যের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেন।

শুক্লা।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় বৌদ্ধ-মহিলাগণ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া নারী-জীবনের চরম উৎকর্ষসাধন করিতেন। কপিলবাস্তু নগরে কোন একটি কোটিপতি ধনবান্ বৌদ্ধ বৈশ্যের শুক্লানাম্নী একটি রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। শুক্লা যখন বিবাহযোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার রূপের ও গুণের কথা শুনিয়া নানাদিগ্‌দেশীয় নরপতিগণ তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ অধীর হইয়া পড়িলেন। কারণ, একে শুক্লার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য এবং নানাসদ্‌গুণ ছিল, তাহাতে আবার তিনি বিপুলঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিলে কেবলমাত্র যে অনুপমা সুন্দরীর দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যের উপভোগ হইবে, তাহা নহে, কিন্তু পরে প্রভূত সম্পত্তিও লব্ধ হইবে, এই আশায় অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে শুক্লার কর্ণে বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণতত্ত্বের কথা প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি অতুলসুখসম্ভোগ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চ্চায় এবং নির্ব্বাণমুক্তিসাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কোন মতেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং

কঠোর যোগাভ্যাস করিয়া তিনি প্রভূত জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও মহামতি জ্ঞানি-পুরুষদিগের অর্হৎনামক উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল রাজকুমার তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শুক্লার গভীরগবেষণাপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া তাঁহাদের মোহনিদ্রাভঙ্গ হইল। নির্ব্বাণমুক্তি-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণও চকিত হইয়া যাইতেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সৎ-কার্য্যে দান ও যোগসাধনাদিকার্য্যে সদা রত থাকিয়া শুক্লা নির্ব্বাণমুক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহার্থী রাজকুমারগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া আজীবন কুমারীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন বলিয়া নানাবিধ সৎ-কার্য্যে প্রচুর ব্যয় করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক ছাত্রীর বাসোপযোগী একাধিক সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। ঐ সকল ছাত্রীর খাদ্যবস্ত্র-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য এবং অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

সোমা।

শ্রাবস্তী নগরীতে একটি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সোমানাম্নী একটি কন্যা ছিল। তৎকালের প্রথানুসারে ঐ ব্রাহ্মণ সোমাকে পঞ্চমবর্ষ বয়সে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সোমা লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিল। সোমার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখরা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে মহাবিস্মিত হইতেন। সোমা একবার যাঁহা শুনিতেন, তাহা আর কখনই ভুলিতেন না। তিনি যেরূপ পাঠ বুঝিতেন, পল্লীর কোন্ বালিকাই তদ্রূপ বুঝিতে পারিত না। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়সের মধ্যে সহস্র সহস্র-সংখ্যক বৌদ্ধ-গাথা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মেধাবিনী বালিকা সমগ্র বৌদ্ধসমাজে তৎকালে দৃষ্ট হইত না। সোমার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে অনেক ব্রাহ্মণনরনারীও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। সোমার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে কশ্যপের আজ্ঞায় ও উপদেশে সাংসারিক অনিত্য সুখভোগ-স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজীবন বৌদ্ধধর্ম্ম-চর্চ্চায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মের এই সংস্কার বশতঃ এই জন্মে ঈদৃক্ অল্পবয়সে এতাদৃশ অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার ব্যতিরেকে ঈদৃশ অল্পবয়সে এতাদৃশ শক্তি কোন-

মতেই লাভ করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বজন্ম না মানিয়া কেবল যদি এই কথা বলা যায় যে, ঈশ্বর কৃপা করিয়া ঐ বালিকাকে ঈদৃশ অল্পবয়সেই এতাদৃশ জ্ঞান দিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ বালিকা তাদৃশী জ্ঞানবতী হইতে পারিয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিতা-দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ, ঈশ্বর একজনকে যদি জ্ঞান দেন ও অন্য-জনকে যদি জ্ঞান না দেন, তাহা হইলে "তাঁহার সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বজীবের প্রতি সমতাভাব" ইত্যাদি সমস্ত আস্তিক-শাস্ত্রের কথায় দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং নির্দ্দোষ তর্কের দায়ে পড়িয়া ইহা অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর যাহার যেমন কর্ম্ম ও মতি দেখেন, তাহার তদ্রূপ জন্ম, তদ্রূপ শরীর, তদ্রূপ বুদ্ধি ও তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যাদি-বিধান করিয়া প্রকৃত মহাবিচারকের কার্য্য সম্পাদন করেন। যদি বলা যায় যে, "ঈশ্বর বা পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার মানিবার প্রয়োজন নাই। এত অল্প-বয়সে অত অধিক জ্ঞান, এই একমাত্র জন্মেই আপনা আপনি হঠাৎ স্বাভাবিকরূপে কোন কোন বালিকার হৃদয়-মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঐ সকল বালিকা এত অল্পবয়সেই জ্ঞানবতী হইয়া থাকে।" এইরূপ কথাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে একটি বালিকা অত অল্পবয়সে কেন ঈদৃশী জ্ঞানবতী হয়? আর অন্য বালিকা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও তাদৃশী জ্ঞান-

বতী হয় না কেন? সুশীলার যেমন হৃদয় আছে, শরীর আছে, অধ্যয়নবিধি আছে এবং সেও যেমন পরিশ্রম করে, সরলারও তাহা তাহা আছে এবং সেও তদ্রূপ পরিশ্রম করে।

সুশীলা যেমন একটি শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় ভদ্রলোকের কন্যা, সরলাও তদ্রূপ। সুতরাং সুশীলার হৃদয়ে যেমন স্বাভাবিকরূপে আপনা আপনি জ্ঞান জন্মে, সরলার হৃদয়ে তদ্রূপ জ্ঞান জন্মে না কেন? সে যেরূপ ফল পায়, সরলা তদ্রূপ পায় না কেন? "স্বভাবতঃ আপনা আপনি হইয়া থাকে," এইরূপ বলিলে একজনের বেলা একরূপ স্বভাব, অন্য জনের বেলা অন্যরূপ স্বভাব হইতে পারে না। কারণ, আম্র, জম্বু প্রভৃতি ফল উৎপাদন করা গ্রীষ্মকালের স্বভাব এবং কপি, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি উৎপাদন করা শীতকালের স্বভাব। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর এই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব। এক্ষণে যদি এইরূপ বলা হয় যে, "যে কোন জিনিস আপনা আপনি যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া পড়ে," তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে কাশীতে যখন "ল্যাংড়া" আম্র উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে কাশীতে কপি-কড়াইশুঁটি উৎপন্ন হয় না কেন? অতএব মানিতে হইবে যে, কোন বস্তুই যেখানে সেখানে হঠাৎ আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন কারণ বশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমেশ্বরই মানুষের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত

সংস্কার এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতিরূপ কারণ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে বিদ্বান্ করেন, কোন ব্যক্তিকে মূর্খ করেন, কোন লোককে ধনী করেন, কোন লোককে দরিদ্র করেন। যাহার প্রতি যেমন সুবিচার করা উচিত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে তাহার প্রতি সেইরূপ সুবিচার করেন। যাহাকে যাহা দেওয়া উচিত, তাহাকে তাহা দেন। কার্য্য-কারণ-ভাব ব্যতিরেকে কোন বস্তুই কুত্রাপি আপনা আপনি হইতে পারে না। পরমেশ্বর কখনই পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তিনি রামের প্রতি সদয় এবং শ্যামের প্রতি নির্দ্দয়, এইরূপ মনে করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া হয়। তাঁহাকে দোষ দেওয়া মহাপাপ। তিনি মহাবিচারকের মহাবিচারক।

কুবলয়া।

ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধদেব সদয় হইয়া মহিলাদিগকেও নির্ব্বাণমুক্তি-শাস্ত্রে পারদর্শিনী করিয়া দিতেন। একদা "গিরিবল্গুসঙ্গম"নামক মেলায় মহাভোজ উপলক্ষে নানা-দিগ্‌দেশ হইতে বৌদ্ধ-নরনারীগণ নদীস্রোতের ন্যায় দলে দলে শ্রাবস্তী নগরীতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে কুবলয়া-নাম্নী একটি রূপবতী ও যুবতী নারীও দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি উক্ত নগরীতে আসিয়া কয়েকটি

লোককে আলাপক্রমে মহাদর্পের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ নগরীতে আমার রূপের ও সুগঠিত মোহিনী মূর্ত্তির আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে, এমন পুরুষ কে আছে?" একজন উত্তর দিল, "গৌতম-বুদ্ধদেব-নামক এক মহাপুরুষ আছেন। তিনি এক্ষণে জেতবন-নামক আশ্রমে বাস করিতেছেন।" কুবলয়া এই কথা শুনিয়া মহাভোজে যোগদান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই অদ্ভুত পুরুষকে দেখিবার জন্য জেতবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে জেতবনস্থ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ হাবভাব প্রদর্শন করিয়া মোহিনী ও আকর্ষণী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধদেব কুবলয়ার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার রূপলাবণ্য ও যৌবনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। ভগবানের সেই দৃষ্টিপাতের অলৌকিক ও অদ্ভুত প্রভাবে কুবলয়ার অনুপম রূপ, যৌবন ও লাবণ্য সহসা বিনষ্ট হইয়া গেল। যুবতী সুন্দরী কুবলয়া সহসা অশীতিবর্ষীয়া কঙ্কালসারা বিকটরূপা বৃদ্ধার আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি মহাভীত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ বুদ্ধদেবের চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বীয় মহাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার হৃদয় ভীষণ অনুতাপে জর্জ্জরিত হইল, তখন তাঁহার মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল। অতিশয় অনুতাপে যখন তাঁহার পাপ ক্ষালিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার চিত্ত শান্তিপথের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল, তখন বুদ্ধদেব তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন এবং তাঁহার অপরাধের জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তাঁহার কৃপায় কুবলয়ার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব উদিত হইল। কুবলয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব সদয় হইয়া স্বয়ং তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবানের ঈদৃশী দয়া দেখিয়া তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ কুবলয়ার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। কারণ, সাধারণ শিষ্যবর্গের শিক্ষাদানাদি কার্য্যভার আনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিত। বুদ্ধদেব কেবল প্রধান প্রধান শিষ্যদিগকেই শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কুবলয়ার পূর্ব্বজন্মের এতই পুণ্যবল ছিল যে, সে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধের নিকটে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিবার মহাসৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ একদা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভগবন্, কুবলয়ার পূর্ব্বজন্মে এমন কি সুকৃতি ছিল যে, সে তৎপ্রভাবে

আপনার পাদপদ্মের নিকটে শিক্ষা পাইতে পারে?' ভগবান্ বলিলেন, 'একদা বারাণসী-রাজের পুত্র কাশীসুন্দর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী মহিলা তথায় দৈবাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, একটি রাজশ্রীসম্পন্ন যুবা পুরুষ যোগাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ সুন্দরী যুবতী তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, ঐ শ্রীমান্ যুবা যোগী তাহার অবলম্বিত উপায়ে বিচলিত হইল না, তখন সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথে তাহার মনে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার স্বীয় রূপ-যৌবনে অতিশয় ধিক্কার জন্মিল। যখন তাহার মনে ধিক্কার জন্মিল, তখন তাহার মনে বৈরাগ্যভাব উদিত হইল। অবশেষে সে কশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোচনায় রত হইল। যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন পূর্ণ-সাধনার অভাবে সে নির্ব্বাণমুক্তি পাইল না; সুতরাং তাহাকে পুনরায় জন্মিতে হইল। পূর্ব্ব-জন্মের সেই নারীই এই জন্মের কুবলয়া। পূর্ব্বজন্মের

বৈরাগ্যভাব ও বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনারূপ সুকৃতির প্রভাবে এ জন্মে বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় এবং বৈরাগ্যে তাহার মতি হইয়াছে এবং আমার নিকটে শিক্ষা পাইবার অধিকারিণী হইয়াছে। 'এ জন্মেও যদি ইহার যোগসাধনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে ইহাকে পুনরায় জন্মিতে হইবে। জ্ঞান-সাধনা পূর্ণ হইলে নিজেই নিজের নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবে।'

কাশীসুন্দরী।

বৌদ্ধযুগে ব্রহ্মদত্ত-নামক বারাণসী-রাজের কাশী-সুন্দরী-নাম্নী একটি ধর্ম্মশীলা কন্যা ছিলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি মহারাজনন্দিনী কাশীসুন্দরীকে বাল্যকালে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কুমারী কাশীসুন্দরী বাল্যপাঠ্য পুস্তক-সকল সমাপ্ত করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে উক্ত ধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যখন বিবাহযোগ্য বয়ঃ-প্রাপ্তা হইলেন, তখন নানাদিগ্‌দেশের রাজকুমারগণ তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ অধীর হইয়া পড়েন। কারণ, কাশী-সুন্দরী অপূর্ব্ব সুন্দরী ও ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে মহাশিক্ষিতা ছিলেন। ঈদৃশী রূপ-গুণবতী রাজকুমারীকে বিবাহ

করিবার জন্য কোন্ রাজকুমার না ইচ্ছুক হয়েন? তাঁহারা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া চির-কুমারীব্রত ধারণপূর্ব্বক যোগ-সাধনা ও শাস্ত্রালোচনায় জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজকুমারগণ প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প তাঁহারা ত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য অনুকূল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা ভগবান্ কশ্যপ যখন ঋষিপত্তননামক স্থানে কিছু দিন বাস করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজনন্দিনী কাশীসুন্দরী তাঁহার নিকটে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা-লাভের জন্য অতিশয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কশ্যপ সদয় হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া কশ্যপের আশ্রমে আগমন করিলেন এবং রাজকুমারীকে বলপূর্ব্বক তথা হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। ভগবান্ কশ্যপ রাজ-কুমারগণের এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া কাশীসুন্দরীকে বলিলেন, "তুমি কি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক? যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাকে তোমার অভিলাষ জানাও।" কাশীসুন্দরী বলিলেন, "আমি কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহি না, আমি বিবাহই করিতে চাহি না। আমি কুমারী-

ব্রত অবলম্বন করিয়া আপনার নিকটে আজীবন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, এইরূপ ইচ্ছুক হইয়াছি।" ভগবান্ কশ্যপ বলিলেন, "তাহা হইলে কিন্তু উহারা তোমাকে বলপূর্ব্বক এ স্থান হইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং যদি তুমি না যাও, তাহা হইলে উহারা আমার আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিবে।" কাশীসুন্দরী বলিলেন, 'ভগবন্, আপনি নিশ্চিন্ত হউন্। আপনার এই শান্তিপূর্ণ আশ্রমের অণুমাত্র শান্তিভঙ্গ হইবে না। আপনার আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে উহারা আমাকে স্পর্শই করিতে পারিবে না। এই দেখুন, আপনার কৃপায় আমি আকাশমার্গে উত্থিত হইলাম।" এই বলিয়া মহারাজ-কুমারী কাশীসুন্দরী যোগসাধন-প্রভাবে আকাশে উঠিতে লাগিলেন; অনেক উচ্চে উঠিয়া নিজের অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

রাজকুমারগণ এইরূপ অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত মহাবিস্ময়-জনক ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে মহাযোগিনী ও অদ্ভুত-শক্তিশালিনী সিদ্ধা মহিলা মনে করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য পুনঃপুনঃ করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে অত্যুচ্চ আকাশমার্গে যোগাসনে উপবিষ্টা ও ধ্যাননিমগ্না দেখিয়া অভিশাপভয়ে আর তাঁহাকে উদ্বেজিত না করিয়া সকলে হতাশ-হৃদয়ে ও বিস্ময়-

বিস্ফারিতনেত্রে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে ভগবান্ কাশ্যপ কাশীসুন্দরীকে আহ্বান করিবামাত্র তিনি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ভগবানের চরণারবিন্দে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ কাশ্যপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার নিকটে যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া আকাশে উঠিবার শক্তি লাভ করিয়াছ? আমি ত তোমাকে এরূপ শিক্ষা দান করি নাই। তুমি অল্পদিনমাত্র আমার নিকটে ধর্ম্ম-শিক্ষা করিতেছ।" কাশীসুন্দরী বলিলেন, "আমি আপনার নিকটে শিক্ষার্থে আসিবার পূর্ব্বে মহাত্মা কণকের নিকটে যোগসাধনা শিক্ষা করিয়াছিলাম। সেই শিক্ষার প্রভাবে আকাশে উঠিতে শিখিয়াছিলাম। কিন্তু হে ভগবন্, আপনার নিকট যে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, উহা উক্ত যোগসাধনা-শিক্ষা অপেক্ষা অনেক উচ্চশিক্ষা। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়গণ কোন সুন্দরী পাত্রীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। কোন স্বয়ংবর-সভায় বা কোন স্থানে কোন ক্ষত্রিয়-রাজকন্যা কোন ক্ষত্রিয়-রাজকুমারের গলে যখন বিবাহমাল্য অর্পণ করিতেন এবং যথাবিধি বিবাহের পরে যখন শ্বশুরালয়ে যাইতেন, সেই সময়ে পথে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবার জন্য রাজকুমারগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। যাঁহার সৈন্যবল বেশী থাকিত, তিনিই বিবাহিতা নারীকে ধরিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যাইতেন। কেহ

বা তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করিতেন, কেহ বা অপ্রধানা মহিষী করিতেন। কোন কোন এইরূপ বিবাহিতা নারী শ্বশুরালয়ে আসিবার সময়ে পথে এইরূপ বিপদে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়া নিজের সতীত্ব বজায় রাখিতেন। দিল্লীর সর্ব্বশেষ হিন্দু সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের সময় পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-দিগের এতরূপ বীভৎসকাণ্ড মধ্যে মধ্যে দেশের শান্তি-ভঙ্গ করিত। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ইহা দেশ হইতে উঠিয়া যায়।”

ক্ষেমা।

একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে প্রসেনজিৎ ও ব্রহ্মদত্ত-নামক দুইটি প্রতাপশালী রাজার মধ্যে একটি বিবাদ ঘটিয়াছিল। এই বিবাদউপলক্ষে যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন রাজা প্রসেনজিতের একটি কন্যা ও রাজা ব্রহ্মদত্তের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখন রাজা প্রসেনজিৎ রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি ভবিষ্যতে নিজের এই পুত্রের সহিত তাঁহার এই কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি এই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন করিতে পারেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এই প্রস্তাব

অনুসারে যুদ্ধ থামিল। এই সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে মিত্রতা-চিহ্নস্বরূপ পরস্পর উপঢৌকন আদান-প্রদানাদি কার্য্য চলিতে লাগিল। রাজা প্রসেনজিৎ নিজের কন্যার নাম রাখিলেন, ক্ষেমা। এই কন্যা বিপৎকালে জন্মিয়া ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিয়াছিল বলিয়া তিনি কন্যাকে ক্ষেমা এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষেমা শৈশবকাল হইতেই অতিশয় সুশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন এবং লিখনপঠনে অত্যন্ত আসক্তা ছিলেন। তাঁহার মৃদু-স্বভাব, সুবুদ্ধি ও সুমেধা দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাল্যকালে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কতিপয় বৎসর পরে ক্ষেমা যখন বিবাহযোগ্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন, তখন তিনি স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন যে, তিনি জীবনে কখনও বিবাহ করিবেন না। আজীবন কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের চরণপঙ্কজে মনঃ সন্নিবেশিত করিবেন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র-চর্চ্চায় কলাতিপাত করিবেন। রাজা প্রসেনজিৎ কন্যার ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বড়ই ভীত হইলেন। কারণ, তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্রের সহিত ক্ষেমার বিবাহ দিবেন বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।* এক্ষণে তিনি যদি ক্ষেমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজা ব্রহ্মদত্তের কোপে পড়িতে হইবে। আবার যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধ বাধিলেই মহান্ অর্থব্যয়, মনের অশান্তি, প্রজার অমঙ্গল ও কষ্ট।

সুতরাং রাজা প্রসেনজিৎ এই সকল ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে লিখিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পুত্রের বিবাহের জন্য অতি শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন করেন।

বরপক্ষ অতিশীঘ্র আয়োজন করিলেই যেন কেন প্রকারেণ, অন্ততঃ বলপূর্ব্বক ক্ষেমার বিবাহটা সম্পন্ন হইতে পারে, এই আশায় রাজা প্রসেনজিৎ ক্ষেমার শীঘ্র বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্ষেমা, পিতার এই অভিপ্রায় গোপনে অবগত হইয়া জেতবনে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকটে পলায়ন করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব ক্ষেমাকে উপদেশ-দানের যোগ্যপাত্রী বিবেচনা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবানের অনির্ব্বচনীয় পরম সুন্দর উপদেশ-রীতির প্রভাবে ক্ষেমা অতি অল্পদিনের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চশ্রেণীস্থ বিজ্ঞ ছাত্রীগণের মধ্যে পরিগণনীয়া হইলেন এবং যোগ-সাধনায় অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার পিতা এতদিন যাবৎ ভারতের বহুস্থানে অন্বেষণ করিয়া যখন কন্যার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন অগত্যা দুঃখিত-চিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সন্ধান পাইলেন যে, তাঁহার কন্যা ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকটে জেতবনস্থ আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতেছেন। রাজা প্রসেনজিৎ তৎক্ষণাৎ ক্ষেমাকে ঐ আশ্রম হইতে ধরিয়া আনিবার জন্য নিজের

আত্মীয়গণকে পাঠাইলেন। তাঁহারা জেতবনে উপস্থিত হইয়া ক্ষেমাকে বলপূর্ব্বক গৃহে ধরিয়া লইয়া গেলেন। তখন রাজা প্রসেনজিৎ কন্যার শীঘ্র বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে পুরোহিত মহাশয় বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষেমার পিতা ক্ষেমার হস্ত ধরিয়া যেই বরের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে "আলিপানা"-চিত্রিত মঙ্গলপীঠে উপবিষ্টা ক্ষেমা ঐ পীঠেসমেত ধীরে ধীরে আকাশমার্গে উঠিতে লাগিলেন। আকাশে উত্থিত হইয়া নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুতকাণ্ড দেখিয়া বিবাহ-সভাস্থ সকলে অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনন্তর সকলের সবিনয় প্রার্থনায় তিনি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সকলেই তাঁহাকে মহাযোগিনী সিদ্ধা মহিলা মনে করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। পুনরায় তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে কেহ সাহসী হইল না। বিবাহ স্থগিত হইল। ক্ষেমা এক্ষণে পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য উপযুক্ত সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিতেন, "ক্ষেমা যোগশিক্ষা-প্রভাবে আকাশে উত্থান-শক্তির শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিল"।

প্রভবা।

শ্রাবস্তী নগরীতে কোন এক ধনবান্ বণিকের প্রভবা-নাম্নী একটি যুবতী কন্যা ছিলেন। কন্যাটির পাণিগ্রহণার্থ নগরীর সম্ভ্রান্ত লোক সকল এবং অন্যান্য দেশের রাজকুমারগণ লালায়িত হইয়া পড়েন। কারণ, প্রভবা একে রূপবতী, গুণবতী ও যুবতী, তায় আবার বিপুলধনশালী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এইরূপ পাত্রী পাইলে অনেকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়। পাত্রগণ, প্রভবার পিতার নিকটে বিবাহ-প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রভবা, তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকটে আজীবন নির্ব্বাণ-মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পিতার অনুমতি লইয়া ভগবানের নিকটে গমন করিলেন। ভগবানের নিকটে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া প্রভবা মহাপ্রভাবা হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তিনি বৌদ্ধ-জ্ঞানীদিগের অর্হৎ-নামক উচ্চ পদবী লাভ করিলেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক জন্মেই কেহ তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই। প্রভবা এই জন্মেই যে ঈদৃশী উচ্চশিক্ষিতা হইয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বজন্মে তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যভাব প্রবল ছিল, তাই, তিনি সেই সংস্কারবলে এই জন্মে অল্পকালমধ্যে শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মে প্রভবা বন্ধুমৎ-নামক

রাজার প্রধানা মহিষী হইয়া প্রভূত শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাই, তিনি এ জন্মে নির্ব্বাণ-মুক্তিশাস্ত্রের শিক্ষয়িত্রী হইতে পারিয়াছিলেন।

সুপ্রিয়া।

বৌদ্ধ-যুগে অনাথপিণ্ডদ-নামক কোন এক ব্যক্তির সুপ্রিয়া-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। সুপ্রিয়ার বাল্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুপ্রিয়ার জন্মের সাত বৎসর পরে একদিন একটি জ্ঞানী বৌদ্ধ পরিব্রাজক অনাথপিণ্ডদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন। সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা সুপ্রিয়া ঐ সকল উপদেশ শুনিয়া সেই বয়সে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সংসারে বৈরাগ্য-ভাব উপস্থিত না হইলে কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম বা ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করে না। তাঁহার পিতা কন্যার এই অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহার এই সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন-মতেই তিনি নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা তিনি

অনুমতি-প্রদানে বাধ্য হইলেন। সুপ্রিয়া সপ্তমবর্ষ বয়সে সন্ন্যাসিনী হইলেন। গৌতমী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগসাধনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কতিপয় বর্ষ পরে তিনি অর্হৎ-নামক উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রিয়া তত্ত্বজ্ঞানবতী বলিয়া যদ্রূপ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট রুগ্ন বিপন্ন দীনগণের ক্লেশ নিবারণ করিতেন বলিয়া তিনি অতি যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। একদা দেশমধ্যে মহাদুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত নরনারীগণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অনেক লোককে অন্ন দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার তিন মাস পরে যখন ভগবান্ বুদ্ধদেব বহুশিষ্য সহ শ্রাবস্তী নগরী হইতে রাজগৃহ-নামক স্থানে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি পথে আসিতে আসিতে এক নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে আসিয়া পড়েন। তথায় কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুপ্রিয়া কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন যে, ভগবানের শিষ্যবর্গ খাদ্যাভাবে অরণ্যানীমধ্যে মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ

তথায় গমন করিলেন, তাঁহাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নগরে আসিয়া একপাত্র অন্ন ভিক্ষা করিয়া পুনরায় ঐ অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় গিয়া যোগবলে একপাত্র অন্নে বুদ্ধদেবের সহস্র সহস্র শিষ্যকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। তৎপরে তাঁহার যোগবলে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র অমৃতরসে পূর্ণ হইলে তিনি সকলকে ঐ অমৃতরস পান করাইলেন। ঐ অমৃতরস পান করিয়া সকলে কয়েকদিন পর্য্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করে নাই। অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়া যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত শক্তিলাভের জন্য এবং অতি অল্পবয়সে "ভিক্ষুণী" হইয়া জ্ঞানার্জ্জন ও পরোপকারের জন্য বৌদ্ধ-জগতে চিরস্মরণীয়া হইয়াছিলেন। একদা ভগবানের প্রধান শিষ্য আনন্দ ভগবান্ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভগবন্, সুপ্রিয়া এত অল্পবয়সে অর্হৎ-পদবী লাভ করিল কিরূপে?' ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিলেন, 'একদা ভগবান্ কাশ্যপ যখন কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই সময়ে বারাণসী-নগরীস্থ কোন এক বণিকের একটি পরিচারিকা প্রভুর জন্য উত্তম সুমিষ্ট পিষ্টক লইয়া পথে যাইতেছিল। সেই সময়ে ভগবান্ কাশ্যপ এক গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। ঐ পরিচারিকা তাঁহাকে চিনিত। সে তাঁহাকে দেখিবামাত্র হস্তস্থিত ঐ

পিষ্টক তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল। ভগবান্ কাশ্যপ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে তাঁহার নিকটে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য-বলে নির্ব্বাণ-পথের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের সেই পরিচারিকাই এই জন্মের সুপ্রিয়া। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-প্রভাবে এই জন্মে এত অল্পবয়সে সুপ্রিয়া জ্ঞানবতী ও বৈরাগ্যবতী হইয়াছে।

রুক্মাবতী।

বৌদ্ধযুগে উৎপলবতী নগরীতে রুক্মাবতী-নাম্নী একটি দয়াবতী, ধনবতী ও জ্ঞানবতী বৌদ্ধ-মহিলা বাস করিতেন। নগরীতে অন্নবস্ত্রাভাবে কেহ কষ্ট পাইলে বা রোগে, শোকে ও মহাবিপদে পড়িয়া কেহ যাতনা ভোগ করিলে তিনি সবিশেষ অনুসন্ধানে তাহা অবগত হইয়া ঐ ক্ষুধার্ত্ত, শোকার্ত্ত, রুগ্ন ও মহাবিপন্ন ব্যক্তিকে যথাশক্তি সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে কেহ বিপদে পতিত হইয়াছে কি না, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সদা গোপনে অনুসন্ধান করিতেন এবং সেই বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতেন। তাঁহার অসীম দয়ার কথা শুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে

এবং বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। একদা দেশমধ্যে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। খাদ্য-বস্তুর অভাবে নগর ও উপনগরের তরুলতা, পত্র, পুষ্প, এমন কি, তৃণ পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-পদার্থ সকল ক্ষুধার্ত্ত নরনারীগণের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীগণের শীর্ণ মৃত-দেহসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে এবং ক্রমাগত ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিগণের আর্ত্তনাদ উত্থিত হওয়ায় নগরটি বিরাট শ্মশানরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। দয়াবতী রুক্মাবতী একদিন নগরীতে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি ক্ষুধার্ত্তা কঙ্কালসারা নারী খাদ্যাভাবে অনন্যোপায় হইয়া তাহার সদ্যোজাত শিশুর সজীবদেহ ভক্ষণ করিতে উদ্যোগ করিতেছে!! রুক্মাবতী এই ভয়ানক অমানুষিক অস্বাভাবিক বীভৎসকাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া ঐ নর-পিশাচীকে বলিলেন, 'অয়ি ক্ষুধার্ত্তে নারি, ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও!' তখন সেই ক্ষুধার্ত্তা নারী বলিল, "তবে কি খাব? দেশে ক্ষেত্রের তৃণ পর্য্যন্ত পদার্থ লোকের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে। তবে এক্ষণে কি খাই?" রুক্মাবতী বলিলেন, 'ক্ষান্ত হও। তোমার এই সদ্যোজাত শিশুকে ভক্ষণ করিও না। আমি গৃহ হইতে তোমার জন্য খাদ্য-বস্তু আনিয়া শীঘ্রই তোমাকে দিব। তুমি তোমার নিজের ছেলেকে নিজে খাইও না। ক্ষান্ত হও।'

বুদ্ধিমতী রুক্মাবতী তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহাকে আপাততঃ এই অস্বাভাবিক ভীষণকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিলেন। সেও কিঞ্চিৎ খাদ্য পাইবে, এই কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণে রুক্মাবতীর এই এক ভাবনা উপস্থিত হইল যে, যদি তিনি খাদ্য আনয়নের জন্য গৃহে গমন করেন, তাহা হইলে সেই অবসরে এই ক্ষুধার্ত্তা নারী ক্ষুধাগ্নির জ্বালায় অস্থির হইয়া যদি তাহার শিশুটিকে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ শিশুর প্রাণরক্ষা করা হয় না। তাহার প্রাণরক্ষার্থ তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং যদি শিশুটির প্রাণরক্ষার্থ তিনি তাহার মাতার ক্রোড় হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া ত্বরায় গৃহে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে ঐ ক্ষুধার্ত্তা নারী খাদ্য-বিয়োজন-জনিত শোকে, তাপে ও ক্ষুধানল-জ্বালায় অস্থির হইয়া মরিয়া যাইবে। সুতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। শিশুকে রক্ষা করিতে গেলে প্রসূতির প্রাণরক্ষা করা হয় না, আর প্রসূতির প্রাণরক্ষার্থ গৃহে খাদ্য আনিতে গেলে সেই অবসরে প্রসূতি শিশুটিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় মহা-সঙ্কটেই পড়িলেন। কিন্তু এই উভয়-সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ তাঁহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্র

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া জননী নিজের সন্তানের রক্ত-মাংস দ্বারা জঠরানল নির্ব্বাপিত করিলে এ জগতে স্বাভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘনের একটা নূতন দৃষ্টান্ত-কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রুক্মাবতী স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে এক-খানি সুতীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা বস্ত্রের ভিতর হইতে বাহির করিলেন এবং তদ্দ্বারা নিজের মাংসল স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিয়া সন্তানের রক্ত-মাংসলোলুপা ঐ ক্ষুধার্ত্তা নারীকে প্রদান করিলেন। ঐ নরপিশাচীও ভৈরব-নৃত্যের সহিত হস্ত প্রসারিত করিয়া ঐ কর্ত্তিত মাংসল স্তনদ্বয় ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সুযোগে অদ্ভুত-দানশীলা রুক্মাবতী সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত রুধিরধারা উৎপলবতী নগরীর রাজমার্গ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার কীর্ত্তিগাথা সুবর্ণাক্ষরে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল। তাঁহার জয়গানে সমগ্র দেশ মুখরিত হইল। তাঁহার এই অদ্ভুত দানশক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য নগরীর নরনারীগণ দলে দলে তাঁহার বাটীতে আসিতে লাগিল। তাঁহার বাটী প্রতিদিন জনতা-পূর্ণ হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং নিজের প্রশংসা নিজে শ্রবণ করা দম্ভজনক মহাপাপ এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি এই পাপ হইতে

নিষ্কৃতি-লাভার্থ লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজন বনে বাস করিতে প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি ফল-মূলমাত্র আহার করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কতিপয় জ্ঞানপিপাসু তপস্বিনী নারী তথায় তাঁহার নিকটে বৌদ্ধ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধনকরিয়া-ছিলেন।

মালিনী।

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের উচ্চ সম্ভ্রান্ত-বংশের মহিলাগণ স্ব স্ব উচ্চ অট্টালিকায় অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহাসুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিতেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি তপস্যায় সদা রত থাকিয়া মঠে বাস করিতেন। তাঁহারা দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভে মত্ত হইবার জন্য কোন কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। তাঁহারা যশের প্রত্যাশাই করিতেন না। তাঁহারা দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা যখন কাহাকে কিছু দান করিতেন, তখন তাঁহাদের বামহস্ত উহা জানিতেই পারিত না। তাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া লোক-হিতব্রতে দীক্ষিত হইতেন। তাঁহাদের অসীম অধ্যবসায় সূচিত করিবার জন্যই যেন বোধ হয় যে, "মন্ত্রের সাধন

কিম্বা শরীর-পাতন," এই মহাবাক্যটি কবিমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। "চণ্ডী"তে চণ্ড ও মুণ্ডনামক শুম্ভাসুরের দুইটি দূতের নিকটে হিমাচলশোভিনী ভগবতী দুর্গার মুখ হইতে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার ন্যায় তাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। তাঁহারা এ জগতে যে বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইলেও, তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাদের সৎসাহসের নিকটে ভীমপরাক্রম বীরপুরুষগণকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থপ্রণেতারা কেন যে, নারী-মাত্রকে "অবলা" শব্দের পর্য্যায়ে অন্তর্গত করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারাই বুঝিতেন। কারণ, মানসবল, সাহসবল, বুদ্ধিবল, ধর্ম্মবল ও চরিত্রবলে বলীয়সী ভারতীয় আর্য্য-মহিলাদিগকে "অবলা" শব্দে অভিহিত করা কোন প্রকারেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারত-ললনা দেহবলেও যেরূপ বলীয়সী ছিলেন, তাহা রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতি ক্ষত্রিয়া বীর-রমণীর বীরত্ব শ্রবণে যথেষ্ট অবগত হওয়া যায়। অধুনা যাঁহারা কোন কোন মহিলার বক্তৃতা-শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হয়েন, তাঁহারা রাজনন্দিনী মালিনীর নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতের কুল-মহিলারা কোন এক শাস্ত্রের কেবল অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া সেই শাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিতেন না এবং "বাহবা" লইবার প্রত্যাশায় এবং

"চাঁদা" আদায়ের চেষ্টায় বক্তৃতা-জাল বিস্তার করিয়া অজ্ঞ ধনিগণকে মৎস্যের ন্যায় আকর্ষণ করিতেন না। নিজের ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতালাভ এবং নিজের অভীষ্ট-পূরণের জন্য পরের দেশে পর্য্যটন করিতেন না। তাঁহারা অগ্রে স্বদেশের লোকের পারলৌকিক মঙ্গলসাধনার্থ যত্নবতী হইতেন। তাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে অন্য দেশীয় লোকের অজ্ঞতা দর্শনে কাতরতার ভান দেখাইয়া মায়াবিনী ডাকিনীর ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন না। মায়াবিনী ডাকিনী (ডাইনী) যেমন কোন একটি শিশুর মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ঐ শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া কাতরতা দেখায় এবং তাহার প্রতি সমবেদনা প্রদর্শনের জন্য নিজেও ছলপূর্ণ ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুপাত করে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য শিক্ষিতমহিলারা তদ্রূপ করিতেন না। তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম-শাস্ত্রে বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে নেত্রস্বরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ যথাবিধি পাঠ করিতেন। তৎপরে কতিপয় সংস্কৃত সাহিত্য-গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়া অগ্রে মূল-গ্রন্থসকল যথাবিধি পাঠ করিতেন, পশ্চাৎ সংগ্রহ-গ্রন্থও আলোচনা করিতেন এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনকরিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান শুনিয়া লোকসকল অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিত, মুগ্ধ হইত ও প্রকৃত-

রূপে উপকৃত হইত। তাঁহারা যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন, সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ভাষা আয়ত্ত করিতেন। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া পশ্চাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। যে দেশীয় লোকের নিকটে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, অগ্রে তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই উচিত। আরবদেশে গিয়া আরবীয় লোকের নিকটে গ্রীক ভাষায় আরবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করা অত্যন্ত উপহাস-জনক। তাঁহারা অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত পরদেশ পর্য্যটন করিতেন না। সৎকার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নিজেরাই অর্থ দান করিতেন। সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাদের অর্থের অভাব হইত না। অন্যের নিকটে অর্থ-সাহায্যলিপ্সা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহারা এক একটি লক্ষপতি এবং কোটি-পতির কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি মাত্র মহিলার বৃত্তান্ত এস্থলে বিবৃত হইতেছে :—

সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে বারাণসী নগরীতে কৃকী-নামক এক রাজা ছিলেন। মহারাজ কৃকী সনাতন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বারাণসীর স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রজারঞ্জনমহিমায় বারাণসী-রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বারাণসী-রাজ কৃকীর মালিনীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। মহারাজ কন্যাকে তৎকালোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

তিনি সভাসদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে বৈদিক ধর্ম্মকার্য্য এবং প্রজাপালনাদি রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। রাজনন্দিনী মালিনী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পিতার কন্যা হইয়াও, গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তিনি গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ বিদুষী হইয়াছিলেন। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনার পূর্ব্বে ইহা কেহই জানিতে পারে নাই। সকলেই জানিত যে, তিনি কেবল বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রেই যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। একদিন কতিপয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে রাজপ্রাসাদে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা মধ্যাহ্নে প্রাসাদের সিংহদ্বারে সমাগত হইলে দৌবারিক তাঁহাকে তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তিনি সন্ন্যাসীদিগকে প্রাসাদ মধ্যে আনয়ন করাইয়া ও যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পুস্তক-বন্ধনের জন্য তাঁহাদিগকে নানাবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ডসকল প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা মালিনীর আদর, অভ্যর্থনা ও সৎকারে অতিশয় প্রীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে এই বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের ভোজনবার্ত্তা ক্রমে ক্রমে মহারাজ কৃকীর কর্ণগোচর হইল। মহারাজের উপদেশক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ

মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনি সনাতন-বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী। আপনার কন্যা মালিনীকে আপনি বৈদিকধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। মালিনী কিন্তু স্বধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আপনার বিনা অনুমতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাসাদমধ্যে ভোজন করাইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। যদি বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার আস্থা হইয়া থাকে কিম্বা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মঠে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই ভাল হইত। আপনার অনুমতি না লইয়া আপনার প্রাসাদ-মধ্যে বসাইয়া তাহাদিগকে ভোজন করান রাজনন্দিনীর উচিত কার্য্য হয় নাই। পিতার অনুমতি বিনা যে কন্যা স্বেচ্ছামত কোন কার্য্য করে, শাস্ত্রে তাহাকে অবাধ্যা কহে। রাজনন্দিনী যখন অবিবাহিতা, তখন তিনি পিতার অধীন। পিতার আদেশ লইয়া সকল কার্য্য করাই তাঁহার উচিত। তিনি হিন্দু রাজার কন্যা। সুতরাং বৌদ্ধদিগের সহিত তাঁহার এত বন্ধুতা করা ভাল নয়। কারণ, বৌদ্ধদিগের সাম্রাজ্যবর্দ্ধনলালসা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনার কন্যা যদি তাহাদের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে আপনার এই স্বাধীন বারাণসীরাজ্য হয়তো অচিরে বিধ্বস্ত হইতে পারে। অতএব ঈদৃশী অবাধ্যা কন্যাকে

বারাণসীরাজ্য হইতে শীঘ্র নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। নতুবা মহারাজ, ঘোর বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা।” মহারাজ কৃকী এইরূপ স্বীয় সভাসদ উপদেশক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মন্ত্রণা শুনিয়া ষড়্‌যন্ত্রচক্রে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি রাজ্যনাশভয়ে কন্যাকে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া স্থির করিলেন।

তিনি কন্যাকে চিরনির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। মালিনী চির-নির্ব্বাসনের আদেশ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না, বরং মহাহর্ষের সহিত নির্ব্বাসনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পিতাকে বলিলেন, “পিতঃ, আমি রাজকন্যা, রাজপ্রাসাদেই মহাসুখ-স্বচ্ছন্দে আজন্ম লালিত-পালিত হইয়াছি। সুতরাং নির্ব্বাসনে প্রস্তুত হইবার জন্য সাত দিন সময় প্রার্থনা করিতেছি।” মহারাজ কৃকীও উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, এই সাত দিনের মধ্যে এই কন্যার দ্বারা আমার বারাণসীরাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পাছে কোন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সহিত মালিনীর পত্রের আদান-প্রদান চলে, এই আশঙ্কায় প্রাসাদস্থ ভৃত্যবর্গ ও দৌবারিকগণের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন এবং মালিনীর নির্ব্বাসনের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার-সংগ্রহের জন্য মালিনীর অভিলাষ জানিতে চাহিলেন। মালিনী বলিলেন,

"আমি নির্ব্বাসনের উপযোগী কোন বস্তুই চাহি না। আমি এই সাতদিন বক্তৃতা করিতে চাহি। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সাতদিন আমার বক্তৃতা শুনিয়া যদি আমাকে নির্ব্বাসিত করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বাসিত হইব। নির্ব্বাসিত হইবার সময় সঙ্গে একটি কপর্দ্দকও লইব না।" মহারাজ বলিলেন, 'বক্তৃতা শুনিতে কোন আপত্তি নাই।' তিনি এই মনে করিলেন যে, সাত-দিন পরে কন্যা যখন নির্ব্বাসিতই হইবে, তখন যত ইচ্ছা তত বক্তৃতা করুক না কেন? বক্তৃতা শুনিতে আপত্তি কি? এই মনে করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতে আদেশ দিলেন। এই ষোড়বর্ষবয়স্কা রাজকুমারী এক সপ্তাহ কালের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে রাজা, রাজ্ঞী, ভ্রাতা, ভগিনী, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী, ভট্টসেনানামক রাজসৈন্য, এবং বারাণসী নগরীর প্রায় দশসহস্র অধিবাসীকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, বিচারশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও বুঝাইবার শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার এই লুক্কায়িত শক্তিরূপ অগ্নি এই ঘটনারূপ পবন-হিল্লোলে সন্দীপিত হইয়া দেশব্যাপিনী উজ্জ্বলশিখা বিস্তার পূর্ব্বক পৌরজান-

পদবর্গের অজ্ঞানতিমিররাশি অপসারিত করিয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা তাঁহার "অহিংসা পরমধর্ম্ম," এই বৌদ্ধশাস্ত্রীয় উপদেশের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রবণে যজ্ঞে পশুহিংসার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া গো-মেধাদিযজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সপ্তাহকালমধ্যে নিজের বক্তৃতাশক্তিপ্রভাবে এত-গুলি লোককে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, একসপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে। এইবার আমাকে নির্ব্বাসিত করুন। কারণ, আপনি মনে করিয়া-ছিলেন যে, আমি আপনার প্রাসাদের কণ্টক বা আবর্জনা-স্বরূপ। আপনার বারাণসীরাজ্যের শান্তিভঙ্গকারিণী এবং স্বাধীনতানাশিনী। কিন্তু পিতঃ, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি কোন দোষই করি নাই। সংসার-ত্যাগী নির্ব্বাণপথের পথিক জ্ঞানী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগকে প্রাসাদমধ্যে ভোজন করাইলে কোন মহাপাপ হয় না। পিতৃ-আজ্ঞা সদা পালনীয়। আপনি আমাকে এক সপ্তাহ পরে নির্ব্বাসিত করিবেন বলিয়াছিলেন। এক সপ্তাহ অদ্য অতীত হইল। আমি আপনার আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত। আমাকে নির্ব্বাসিত করুন, আমিও, আর, এই কোলাহল-পূর্ণ দুঃখশোকময় অনিত্য সুখের আবরণে আচ্ছাদিত

নগরীতে বাস করিতে চাহি না। নাগরিক জীবন ও নাগরিক হৃদয়, ছল, কপটতা এবং দ্বৈধভাবে সদাই কলুষিত। এতাদৃশ স্থানে আমি জীবন-যাপন করিতে চাহি না। এখানে ভিতরে এক ভাব, বাহিরে অন্য ভাব। এখানে ধর্ম্মালোচনা একটা মহাবিড়ম্বনা মাত্র। এখানে ইহা একটা লৌকিক আচার মাত্র। নগরীর কোলাহল হইতে দূরে অপসৃত হইয়া শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন বনে তপস্যা করিব। এইবার আমাকে নির্ব্বাসিত করুন। আমি আপনার বারাণসীরাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিব না। আপনি সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করুন। বৌদ্ধ-সম্রাটের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া আপনার স্বাধীন রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে কখনই উদিত হয় নাই এবং কস্মিন্‌-কালেও উদিত হইবে না। আমি জ্ঞানী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম মাত্র। জ্ঞানী ত্যাগী সন্ন্যাসীরা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন না এবং ইহাতে তাঁহাদের যোগদান করা উচিতও নয়। কারণ, ইহা গৃহীর কর্ম্ম। ইহা ত্যাগী সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নয় ও ধর্ম্ম নয়। যে সন্ন্যাসী রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেয়, রাজনীতি-চর্চ্চায় মহা আমোদ অনুভব করে এবং রাজবিদ্রোহের পক্ষপাতী হয়, সে মহাপাপী, ভণ্ড বা কপট সন্ন্যাসী। তাদৃশ সন্ন্যাসীকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। না করিলে

রাজাকে বিপন্ন হইতে হয়। এই জন্য যুদ্ধের সময় সন্ন্যাসিবেশী লোকের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইহা প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের কথা। আমি সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইয়াছি বলিয়া আপনার রাজ-সভাস্থ পণ্ডিতগণ ও আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া-ছিলেন এবং আমার নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছিলেন। অতএব আপনাকে প্রণাম করিলাম ও পিতৃবাক্য-পালনার্থ রাজবাটী হইতে বনে বাস করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া রাজনন্দিনী মালিনী গমনোদ্যতা হইলে মহারাজ কৃকী অশ্রুপূর্ণনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, তুমি যাইও না। তুমি আমাদের গুরুস্বরূপা। তুমি এই এক সপ্তাহকাল আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আমাদের হৃদয়ে যে উজ্জ্বলতম জ্ঞানালোক প্রজ্বালিত করিয়াছ, তাহার প্রভায় আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হইয়াছে। আমি, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতৃভগিনীগণ, রাজবাটীর অন্যান্য সমস্ত লোক, রাজসৈন্য, দশসহস্র নগরবাসী, এমন কি, চতুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গপারদর্শী সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত তোমার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই তোমার নিকটে ঋণী হইয়াছেন। তুমি কাশী হইতে অন্যত্র কোথায় যদি যাও, তাহা হইলে তাঁহারা কাহার নিকটে সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন? তুমি তাঁহাদের নেত্রী, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-

পথ দেখাইয়া দিয়াছ। তুমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে তাঁহারা স্রোতস্বতী নদীতে কর্ণধার-বিহীন নৌকারোহিগণের ন্যায় বিষম সঙ্কটে পড়িবেন। আমি তোমার পিতা। পিতৃবাক্য-পালন করাই ধার্ম্মিক কন্যার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি তোমাকে বনে যাইতে নিষেধ করিতেছি। তুমি যাইও না। আমার কথার সম্মান রাখিও। তুমি যদি কোলাহলপূর্ণ রাজবাটীতে কিম্বা নগরীর মধ্যে কোথায়ও থাকিতে না চাও, তাহা হইলে কাশীর রাজধানী-প্রান্তে উপনগরে সারনাথনামক বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া বৌদ্ধ নরনারীগণের কল্যাণ সাধন কর। তুমি নিবিড়বনে বাস করিলে নরনারীর কি উপকার হইবে? নরনারীগণের উপকারার্থ ভগবান বুদ্ধদেব নগর হইতে নগরান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অক্লান্তভাবে অনবরত উপদেশ দিতে দিতে বিচরণ করিতেন। তিনি যদি সমস্ত জীবন কেবল নিবিড় অরণ্যমধ্যে অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে এত নরনারী পরিত্রাণ পাইত না। ভারতের এত উপকার হইত না। এতদিনে ভারত শ্মশান কিম্বা দস্যুভূমিতে পরিণত হইত। চিতাগ্নি-তপ্ত শশ্মানে শৃগাল কুক্কুরসকল যেমন মৃতদেহ-মাংস ভক্ষণ করিয়া বীভৎসকাণ্ড অভিনয় করে, তদ্রূপ পশুমাংসলোলুপ যাজ্ঞিকগণ হোমাগ্নি-তপ্ত যজ্ঞক্ষেত্রে পশুকুলের ধ্বংস করিয়া পশুর রক্তনদীর স্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিত।

ভারতে পশুকুলের মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। সারনাথ-তীর্থ বা মৃগদাব কাশীর নগরী হইতে দূরবর্ত্তী নহে। নিকটেই অবস্থিত। সংসারাসক্ত মূঢ় নরনারীগণের কোলাহলে উহা মুখরিত নয়। ঐ স্থান সদাই শান্তিপূর্ণ। তথায় ত্যাগী বৌদ্ধ যোগীরা তপস্যা করেন। তথায় বৌদ্ধ নারীকুলের কল্যাণ-সাধনার্থ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তুমি বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষাদান কর। ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং তাহার স্থায়িত্ব-সম্পাদনে যত ব্যয় হইবে, আমি সেই ব্যয়ভার বহন করিব। তুমি নারীরূপে যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন নারীকুলের হিতসাধনার্থ জীবন সমর্পণকরাই তোমার এক্ষণে একমাত্র কার্য্য। অতএব তোমার জীবনের অনেক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় বনে গিয়া বাস করিলে জগতের কোন উপকার হইবে না। তুমি গোপনে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়া যে, এত শক্তি এত বিদ্যা ও এত বৈরাগ্যভাব অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সেইজন্য আমি তোমাকে রাজসভার পণ্ডিত-গণের উপদেশবশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়া-ছিলাম। তজ্জন্য মা, তুমি দুঃখিত হইও না। পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তোমাকে বেশী বলাই বাহুল্যমাত্র। তুমি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত কর। নগরীর

নিকটেই শান্তিপূর্ণ স্থানে সারনাথে বাস কর। অন্যত্র কুত্রাপি যাইও না। মহারাজ কৃকীর এই আদেশ শুনিয়া সুশীলা পিতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী মালিনী "তথাস্তু" বলিয়া পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। সারনাথে দশ সহস্র বৌদ্ধ-মহিলার বাসোপযোগী এক বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। মহারাজ কৃকী দশ সহস্র বৌদ্ধ-মহিলার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিলেন। মালিনী পিতৃ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই মঠে ছাত্রীদিগের অভিভাবিকা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন ধর্ম্মপ্রচার ও দানাদি সৎকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া নারীসমাজের অসীম কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃকীও কন্যার সৎকার্য্যে আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। জগতে নারী-জীবনের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। কাশীর উপনগরস্থ সারনাথনামক স্থানে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাদিগ্দেশ হইতে সুশিক্ষা-প্রার্থিনী বৌদ্ধ-মহিলারা উক্ত মঠে সমাগত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। কাশীর সারনাথ বা মৃগদাব, বৌদ্ধ-মহিলাবিদ্যালয়ের কেন্দ্র স্থানে পরিণত হইল। সারনাথের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কালের করাল কুক্ষিতে উহা বিলীন হইয়া গেলেও, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দর্পণতুল্য সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ডরূপ অংশগুলি

অদ্যাপি নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং প্রাচীন সুসভ্য ভারতের স্থপতি-বিদ্যার অমূল্য উজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। "যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হয়েন না" সেই বৃটিশসিংহ ভারত-সম্রাটের ভূতপূর্ব্ব মহাপ্রতাপ প্রতিনিধি বিদ্বান লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের কৃপায় সারনাথের ঐ প্রাচীন অবশিষ্ট গৌরব এক্ষণে দর্শকের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের আদেশে বহু অর্থ-ব্যয়ে ভূগর্ভে প্রোথিত ঐ সকল অট্টালিকার অংশগুলি উত্তোলিত হইতেছে, নূতন রাজকীয় বৃহৎ অট্টালিকায় সুরক্ষিত হইতেছে, এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় সুসভ্যতা ও ভারতীয় স্থাপত্য-কৌশল "বিঘোষিত হইতেছে।

সংঘমিত্রা।

ভারত-সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যলাভের পূর্ব্বে পিতার আদেশে উজ্জয়িনী নগরীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভালবাসিতেন না বলিয়া তদানীন্তন ভারত-রাজধানী পাটনা "মহানগরী হইতে বহুদূরে অবস্থিত উজ্জয়িনী নগরীর শাসন ভার প্রদান করিয়া তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। অশোক উজ্জয়িনীর রাজ-

কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি শ্রেষ্ঠী-উপাধি-ধারী এক গুজরাটী বণিকের দেবীনাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী পরমা সুন্দরী সুশীলা গুণবতী মহিলা ছিলেন। দেবী রাজবংশসম্ভূতা না হইলেও তাঁহার রূপে গুণে ও শীলতায় আকৃষ্ট হইয়া রাজপুত্র ও ভাবী সম্রাট অশোক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিবাহ-বার্ত্তা তিনি মগধস্থ ভারত-রাজধানী পাটলীপুত্রে পিতাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন না। দেবীর সহিত সুখে কালযাপন করিয়া উজ্জয়িনী-রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার মহেন্দ্রনামক এক পুত্র ও সংঘমিত্রানাম্নী এক কন্যা জন্মিল। ইহার কিছুদিন পরে যখন তিনি সম্রাট হইয়া রাজধানী পাটনায় আগমন করেন, সেই সময়ে প্রথমতঃ পুত্র ও কন্যাকে উজ্জয়িনীতেই রাখিয়া আসিয়া-ছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে পাটনায় আনয়ন করিয়াছিলেন।

রাজধানীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা-প্রভাবে তাঁহারা পরমধার্ম্মিক ও সুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। সম্রাট অশোক সংঘমিত্রাকে সমস্ত বৌদ্ধগাথা অভ্যাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব এতই বিনয়নম্র ছিল ও তাঁহার ব্যবহার এতই সরল ছিল যে, তিনি সম্রাট-কন্যা হইলেও, মঠের ভিক্ষুণী-উপাধিধারিণী সামান্য বৌদ্ধ

সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রতীয়মান হইতেন। ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই সমভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই লিখনপঠনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ চুরাশি-হাজার বিহার বা অতি প্রশস্ত প্রাঙ্গনসমন্বিত উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন।' এক একটি বিহারে বহুসহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহাদের অন্নবস্ত্র-ব্যয়ও সম্রাট স্বয়ংই নির্ব্বাহ করিতেন। রোমরাজ্যে যেমন ধর্ম্মগুরু পোপের প্রাধান্য শ্রুত হইয়া থাকে, সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতে প্রধানতম বৌদ্ধ ভিক্ষুর তদ্রূপ প্রাধান্য ছিল। সম্রাট স্বয়ং তাঁহার চরণে প্রণত হইতেন এবং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। অন্যান্য ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-দিগকেও তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের পুষ্টিসাধনে দশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া-ছিলেন। তিনি চুরাশি হাজার বৌদ্ধবিহার-নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থব্যয় হইয়াছিল। যে দিন তিনি শুনিলেন যে, চুরাশি হাজার বিহারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে সেই দিন তিনি আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সর্ব্বত্র এই ঘোষণাবাণী প্রচার

করিতে আদেশ দিলেন যে, "অদ্য হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্রসাম্রাজ্যমধ্যে প্রতি যোজন অন্তর স্থানে "মহাদানমহোৎসব" হইবে। এই "মহাদান-মহোৎসব" উপলক্ষে তাঁহার প্রজাবর্গকে রাজ্যের সকল স্থান পুষ্প মাল্য ও পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত ও সুসজ্জিত করিতে হইবে এবং যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহাকে তদনুসারে চুরাশি হাজার বিহারের ভিক্ষুসমূহকে ভিক্ষা দিতে হইবে। রজনীতে দীপাবলী দ্বারা রাজ্যের সমগ্র স্থান আলোকিত করিতে হইবে। সুমধুর গীত বাদ্য দ্বারা সকলের হৃদয়ে অসীম আনন্দ উৎপাদন করিতে হইবে। এই এক সপ্তাহ সকলকেই সংযত ও অবহিত চিত্তে ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময় অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে।

সপ্তম দিবসে সম্রাট স্বয়ং পাত্র, মিত্র, মন্ত্রিগণ ও রাজোচিত শোভাযাত্রা সহ রাজধানীর প্রধান রাজমার্গে বহির্গত হইবেন। ঐ দিবস সমস্ত বিহারের ভিক্ষুসমূহকে বিশেষরূপে ভিক্ষাদানে সম্মানিত করিতে হইবে। এই-রূপে সপ্তম দিবসের কার্য্য শেষ হইলে "মহাদানমহোৎ-সবের" অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবে।" সম্রাটের এই আদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই যথাশক্তি স্ব স্ব গৃহ সুসজ্জিত ও সুশোভিত করিতে লাগিল। সম্রাটের প্রাসাদ, রাজপথ ও রাজকার্য্যালয়সকল মহামূল্য দ্রব্যসমূহে সুসজ্জিত হইয়া ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীকেও হীনপ্রভা করিয়া

ফেলিল। প্রধান প্রধান বিহারের প্রধান প্রধান জ্ঞানি-ভিক্ষুগণ পাটনা রাজধানীতে মহাসম্মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। সপ্তম দিবসে সম্রাট অনির্ব্বচনীয় মহাশোভাযাত্রা সহ রাজধানীর প্রধান রাজপথে বহির্গত হইলেন। প্রজাবর্গ মহাহর্ষের সহিত সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে মহাউৎফুল্ল হইল। যেখানে মহাদানমহোৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত মহামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সম্রাটের শোভাযাত্রা সেই দিকে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সম্রাট মহামণ্ডপমধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্ত ও মাননীয় প্রজাবর্গ তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাচীন সুসভ্য ভারতীয় রীতি অনুসারে সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। সভা এক অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় শোভা ধারণ করিল। এমন সময়ে মহামনীষী মৌদ্গলীর পুত্র তিষ্য-নামক প্রধানতম সর্ব্বমান্য মহাবিদ্বান মহাস্থবির ভিক্ষু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সম্রাট সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। রাজ-সভাস্থ সকলেই উত্থিত হইল। সম্রাট, তিষ্যের চরণ-যুগলোপরি রাজমুকুটশোভিত মস্তক অর্পণ করিলেন। তিষ্যের পদধূলি লইয়া তিষ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে তিষ্যকে বসাইলেন এবং সিংহাসনের নিম্নে তিষ্যের

নিকটস্থ একটি সাধারণ আসনে স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। সেই দিন সহস্র সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সেই রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যোপার্জ্জন অনুসারে যাহার যেমন পদ, তিনি তদনুসারে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসকল সম্রাটের প্রতি মহাপ্রসন্ন হইয়া সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সম্রাট সেই দিন অলৌকিক দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিব্যশক্তির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন স্থানস্থিত সুসজ্জিত চুরাশি হাজার ধর্ম্মভবন মুহূর্ত্তমধ্যে দেখিতে পাইলেন। তখন সম্রাট, সংঘ অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুণীসম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসেবীদিগের মধ্যে কাহার দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?" সংঘ উত্তর দিলেন, "হে সম্রাট, ভগবান বুদ্ধদেবের লীলাকালেও আপনার মত দানশীল কেহই ছিলেন না।" সম্রাট সমবেত ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের এই প্রশংসাবাণী শুনিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রকার দান করিয়া কোন ব্যক্তি কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত বন্ধু হইতে পারে?" সংঘের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিষ্য বলিলেন, "যিনি পুত্র বা কন্যাকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন তিনিই ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের প্রধান ও প্রকৃত পরিপোষক।" হে সম্রাট, আপনার মত পরমদাতা এই ধর্ম্মের যে পরমহিতৈষী, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

তৎকালে সেই মহামণ্ডপমধ্যে সম্রাটের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রা উপস্থিত ছিলেন। বিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবক মহেন্দ্রের উত্তমস্বভাব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধর্ম্মে নিষ্ঠা এবং নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া সদা আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য মহাস্থবির তিষ্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবীসম্রাট পুত্রের মায়া ত্যাগ করিলেন। অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা যুবতী সংঘমিত্রাও সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। সম্রাট, মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তোমাদের ইচ্ছা আছে কি?

আদর্শবৌদ্ধ মহাস্থবিরগণ ভিক্ষুধর্ম্মকে অতিশয় পবিত্র ব্রত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহাব্রত গ্রহণ করিতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে কি? পিতার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "পিতৃদেব, আপনার অনুমতি হইলে আমরা দুইজন এই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন সার্থক করিতে প্রস্তুত আছি।" সম্রাট অশোক এই কথা শুনিয়া মহাস্থবির তিষ্যও উপস্থিত সংঘকে মহাহর্ষের সহিত সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি ভগবান বুদ্ধদেবের পুণ্যতম ধর্ম্ম-প্রচারার্থ আমার পরমস্নেহাস্পদ পুত্র ও কন্যাকে উৎসর্গ করিলাম। সভাস্থ সমস্ত লোক সসাগরা পৃথিবীর সম্রাটের

এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহাবিস্ময়জনক ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া "সম্রাটের জয় হউক, সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন," এই কথায় মহাহর্ষকোলাহলে দিগন্ত পূরিত করিল। সম্রাটের উপর সুগন্ধপুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলেই সম্রাটকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল। সম্রাট, কৃতাঞ্জলিপুটে মহাস্থবির তিষ্যকে মহেন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিষ্য মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন এবং মহেন্দ্রকে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য স্থবির মহাদেবকে আদেশ করিলেন। সম্রাট-কুমারী সংঘমিত্রাকে শিক্ষা দিবার জন্য ভিক্ষুণী ধর্ম্মপালী আদিষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য ভিক্ষুণী আয়ুঃপালী উপদিষ্ট হইলেন। ইহার পর ইতিহাসবিখ্যাত "মহাদান"-কার্য্য আরব্ধ হইল। সম্রাট অশোক, পৌরাণিক দাতা-কর্ণের ন্যায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী স্থবির, মহাস্থবির, অর্হৎ প্রভৃতি ধর্ম্মোপাধিধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগকে প্রভূত প্রণামী দক্ষিণা দিতে লাগিলেন। সভাস্থ গৃহস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহার যেমন শক্তি, তিনি তদনুসারে দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে "মহাদানমহোৎসব" বিধি সম্পন্ন হইল, ইহার পর সভাভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন হইতে সংঘমিত্রা, ভিক্ষুণী ধর্ম্মপালীর নিকটে উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন

করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, তিনি ইতঃপূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণপাঠ্য অন্যান্য বহুগ্রন্থই শিক্ষকের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সমস্ত পুস্তকের পুনঃপঠনের আর প্রয়োজন হইল না। ভিক্ষুণী আয়ুঃপালী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সাধনাপদ্ধতিসকল শিখাইতে লাগিলেন।

ভিক্ষুসংঘে (দলে) প্রবেশের নাম "উপসম্পদা"। মহেন্দ্র প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাস্থবির তিষ্যের উপসম্পদা-মন্দিরে দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তথায় তিন বৎসর কাল তিষ্যের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া "অর্হৎ"-উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাআশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংঘমিত্রা ইহা অপেক্ষা অতি অল্পকালের মধ্যে শাস্ত্রশিক্ষা ও সাধনায় উন্নতি লাভ করিয়া অর্হৎ-উপাধি পাইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোক ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মসাধনায় উত্তমরূপে শিক্ষা পাইলে পুরুষ অপেক্ষা অনেক উন্নত হইতে পারে। ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের বিশ্বাস ও ভক্তি যত দৃঢ় হয়, পুরুষের তদ্রূপ হয় না। ব্রত-উপবাসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের যতদূর আগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, পুরুষের তদ্রূপ আগ্রহ দেখা যায় না। স্ত্রীলোক ধার্ম্মিকের জাতি। এ হেন স্ত্রীজাতি যদি ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন হয় তাহা হইলে দেশে রাজ্যভ্রংস সৎসমাজধ্বংস প্রকৃতপুরুষনির্ব্বংশ অনিবার্য্য

হইয়া উঠে। সংঘমিত্রা অর্হৎ-উপাধি লাভ করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছিলেন। তিনি যে মঠে বাস করিতেন, তথায় অনেক ভিক্ষুণী বাস করিতেন। সকলেই অধ্যয়ন ও ধর্ম্মসাধনায় রত থাকিতেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ছাত্র বা ছাত্রীগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যেখানে রাত্রিদিন অধ্যয়ন করেন এবং বাস করেন, তাহাকেই মঠ কহে। প্রত্যেক বৌদ্ধ-মঠের ব্যয় সম্রাট্ নির্ব্বাহ করিতেন। সংঘমিত্রা যেখানে থাকিতেন, তথায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এবং তাঁহার নিকটে ধর্ম্মোপদেশ লইবার জন্য ধার্ম্মিক গৃহস্থ নরনারীগণ দলে দলে আগমন করিতেন। সংঘমিত্রার যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি সম্রাটের কন্যা হইয়া ভিক্ষুণী-ধর্ম্ম অবলম্বন করায় অনেক ধনিকুলের ললনাগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শোক-দুঃখ-পরিপূর্ণ নানাচিন্তাগ্রস্ত গৃহস্থজীবন যাপন করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ত্যাগধর্ম্ম-পালনকে মহাশ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং তদনুসারে দলে দলে ভিক্ষুণী-আশ্রমে আসিয়া ভিক্ষুণীধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্ম্ম-প্রচারাদি দ্বারা নিজের নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। শিক্ষিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা নারীর দ্বারাই নারীকুলের কল্যাণ সাধিত হওয়াই উচিত। নারীর শিক্ষাদীক্ষাকার্য্যে নারীরই প্রাধান্য থাকাই উচিত। বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে

তাহাই ছিল। অধুনা কালধৰ্ম্ম অনুসারে উহা লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে অশোকের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সেই সময়ে মহাস্থবির তিষ্যের আদেশক্রমে সিংহলদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র সম্রাট্‌কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইলেন। সিংহলে যাইবার সময় মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা তাঁহাদের মাতৃদেবী দেবীর চরণ-দর্শনার্থ উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বিদিশাগিরি বা চৈত্যগিরিনামক স্থানে গমন করিলেন। ঐ স্থান বর্ত্তমান "ভিল্‌সার" নিকটবর্ত্তী। তথায় গমন করিয়া তাঁহারা মাতার চরণকমলে প্রণাম করিলেন। দেবী, পুত্র ও কন্যার বৌদ্ধপরিব্রাজকের হরিদ্রাবর্ণরঞ্জিত বেশ ও কমনীয় সৌম্য তেজোময় আকৃতি অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সম্রাট্‌ কি তোমা-দিগকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন ?' তাঁহারা বলিলেন, 'না, মা, আমাদের এই ভিক্ষুধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে পিতা আমাদের অভিলাষ জানিতে চাহিয়াছিলেন। পরে আমরা তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ নিজ ইচ্ছায় এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব মা, তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন, এইরূপ মনে করিবেন না।' মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার সঙ্গে অনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌম্য আকৃতি ও সন্ন্যাসিবেশ দেখিয়া দেবীর মনে বড়ই আনন্দ

হইয়াছিল। অনেক দিনের পর দেবী, পুত্র ও কন্যার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি পুত্র, কন্যা ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের প্রতি মহাসমাদর ও মহাযত্ন প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 'তোমরা ভিক্ষু-সম্প্রদায়স্থ। গৃহস্থ লোকালয়ে থাকিতে তোমাদের অসুবিধা, সংকোচ ও কষ্ট বোধহইবে। অতএব নগরের প্রান্তভাগস্থিত চৈত্যবিহারনামক প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠই তোমাদের থাকিবার উপযুক্ত স্থান। তথায় বাস করিলে তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমাদের জন্য তথায় খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেছি। তোমরা তথায় চল।' এই কথা বলিয়া দেবী তাঁহাদিগকে স্বয়ং তথায় রাখিয়া আসিলেন। তাঁহাদের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেন। পুত্র ও কন্যা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইয়া বহু-দিবস পর্য্যন্ত রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে পায় নাই, এই ভাবিয়া তাঁহাদের জন্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের জন্য তিনি নানাবিধ পবিত্র সুখাদ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া উক্ত বিহারে প্রেরণ করিলেন।

নানাবিধ বহুমূল্য সুখাদ্য দ্রব্য-ভক্ষণেও, পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসীদিগের অত্যন্ত সংযম ছিল বলিয়া তাঁহারা প্রথমতঃ ঐ সকল উত্তমোত্তম দেবভোগ্য রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্য দর্শন করিয়া ঐরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে কাহারও আপত্তি আছে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মাতা ত্রিভুবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়া, পিতৃ অপেক্ষাও মাননীয়া। অতএব তিনি যখন এই সকল খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন উহা অবশ্য গ্রাহ্য ও অবশ্য খাদ্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ঐ সকল বস্তু ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উজ্জয়িনীতে কয়েক দিন মাত্র থাকিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমৃতময় উপদেশগুলি প্রচার করিয়াছিলেন। দেবী স্বয়ং পুত্রের মুখ হইতে ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উজ্জয়িনীতে এক মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বাস করিয়া সিংহলদ্বীপে গমন করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহারা সিংহলদ্বীপের মিশ্র-নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন সিংহলদ্বীপের রাজা দেবপ্রিয়তিষ্য চারি হাজার অনুচরের সহিত মৃগয়া করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজার অনুচরগণ একটু দূরে আসিতেছিল। এই সুযোগে মহেন্দ্র রাজাকে একাকী পাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, 'ওহে তিষ্য, কোথায় যাইতেছ?' এইরূপে রাজার নাম ধরিয়া ডাকাতে রাজা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং মহেন্দ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়া মহাঔৎসুক্যের সহিত মহেন্দ্রের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কারণ, তিনি সিংহলের সম্রাট্। তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে, এমন লোক তাঁহার পিতা মাতা ছাড়া সিংহলে আর কেহই ছিল না। হরিদ্রাবর্ণবেশধারী অপরিচিত একটি সামান্য লোক এই নির্জ্জন অরণ্যে তাঁহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিল, নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, অথচ তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। এ লোকটা কে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাকে এইরূপ বিতর্কান্বিত দেখিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 'আপনার বিস্ময়ের বা ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমি, আমার ভগিনী ও কতিপয় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সহ সিংহলে আসিয়াছি।' মহেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া রাজার বিস্ময় ও ঔৎসুক্য আপাততঃ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল। সেই সময়ে রাজার ও মহেন্দ্রের সঙ্গিগণসকল তথায় আসিয়া পড়িল। রাজা ও তাঁহার লোকসকল মহেন্দ্রের, সংঘমিত্রার ও অন্যান্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের সৌম্য অথচ তেজঃপুঞ্জময় আকৃতি ও হরিদ্রাবর্ণ বেশ অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইঁহারা কে?' মহেন্দ্র বলিলেন, 'ইঁহারাও আপনার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমার সহিত এখানে আসিয়াছেন।' রাজার ঔৎসুক্য ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

তিনি পুনরায় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাদের ভারতে এই প্রকার বেশধারী লোক কতগুলি আছেন ?' মহেন্দ্র বলিলেন, "এই প্রকার বেশধারী লোকে ভারত সমাচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বল। পৃথিবীতে বৌদ্ধের সংখ্যার সীমা নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে বৌদ্ধের সংখ্যা অনেক বেশী। গৃহস্থাশ্রমীর সংখ্যার দিন দিন হ্রাস হইতেছে। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদির আধি-ব্যাধি ও মৃত্যুর ভাবনায় আর লোক জর্জ্জরিত হইতে চাহিতেছে না। সকলেই ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক ভিক্ষুধর্ম্ম বা সাংসারিক বাসনার ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। ইচ্ছা করিয়া নিজের চরণে নিজে কুঠারাঘাত করিতে ভারতীয় লোক সকল আর বড় ইচ্ছুক হইতেছে না।

ভারতের বহুসংখ্যক লোক দুঃখকে সাদরে গৃহে আহ্বান করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং উৎপীড়িত হইতে চাহিতেছে না। তাহারা দুশ্ছেদ্য বন্ধনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইবার জন্য দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমী হইতে ইচ্ছুক হইতেছে না। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশ সকল আলোচনা করিয়া ও তদনুযায়ি-কার্য্য করিয়া সর্ব্ব-দুঃখবিনাশক নির্ব্বাণ-মুক্তিপথ অবলম্বন করিতেছে।" মহেন্দ্রের এইরূপ কথাগুলির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিভাব উদিত হইল। তিনি মহেন্দ্রকে দৈবপ্রেরিত

মহাপুরুষ ও সিংহলের মহোপকারক বিবেচনা করিয়া হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মহেন্দ্রের চরণকমলে প্রণাম করিলেন। তখন মহেন্দ্র বলিলেন, 'আমরা মহাস্থবির তিষ্য ও ভারতের সম্রাট্ অশোকের আদেশ অনুসারে এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি। আজ এদেশে উপনীত হইবামাত্র দৈবক্রমে বিনা আয়াসে আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। ইহা একটা মহাসুলক্ষণ। ইহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতে কার্য্যসিদ্ধি সূচিত হইতেছে।' মহেন্দ্র, সংঘমিত্রা ও তাঁহাদের সঙ্গিসঙ্গিনীগণ ভারত-সম্রাট্ অশোকের আদেশে সিংহলে আসিয়াছেন শুনিয়া সিংহলরাজ দেবপ্রিয়তিষ্য অতিশয় সমাদর, সম্মান ও অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় নানাপ্রকার লোকের জনতা ও কোলাহলে তাঁহাদের শান্তিভঙ্গ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা প্রথমতঃ একটি শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন সুন্দর উদ্যানে তাঁহাদিগকে অবস্থিত করাইলেন। তাঁহারা তথায় আপাততঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। সিংহলের নরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ও তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ শুনিবার জন্য তথায় দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। সংঘমিত্রার সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া নারীগণের চিত্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে লাগিল।

সংঘমিত্রা একে রূপবতী রাজকন্যা, তাহে আবার তিনি সুশীলা সরলহৃদয়া। ইন্দ্রিয়সংযমপ্রভৃতি ধর্ম্ম অবলম্বনে তাঁহার স্বাস্থ্য উত্তমরূপে সংরক্ষিত হওয়ায় তাঁহার আকৃতির উজ্জ্বলতা, কমনীয়তা, স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ও সংঘমিত্রার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ দলে দলে উক্ত উদ্যানে আসিতে লাগিল। তাহাদের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সিংহলেশ্বর ঐ উদ্যানটিকে অপর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়া সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ মহামেঘনামক বৃহত্তর উদ্যান তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গিসঙ্গিনীগণ সহ উক্ত সুপ্রশস্ত উদ্যানে বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচারকরিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার-প্রভাবে সিংহলের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধবিহারসকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সিংহলের নরনারীগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল বিহারে বাস করিতে লাগিলেন। সিংহলরাজনন্দিনী অনুলা ও তাঁহার পাঁচশত সখী সংঘমিত্রার নিকটে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুণীব্রত ধারণ করিলেন এবং রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহামেঘনামক উদ্যানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার সখীগণ ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন

করায় রাজ্যের উচ্চসম্ভ্রান্তবংশীয় নারীগণ নশ্বর পার্থিব সুখের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সংঘমিত্রা সিংহলে এই ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তাহার পুষ্টিসাধনার্থ রাত্রি-দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিছু-দিনের মধ্যেই তাঁহার পরিশ্রম সফল হইল।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল ও উহা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ক্ষণিকপার্থিবসুখ-লালসায় মত্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইতে লাগিল। রাজ্যে ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রসারিত হইতে লাগিল। মানব-জীবনের সফলতা ও উৎকৃষ্টতা সাধিত হইতে লাগিল। সিংহলাধিপতি ধর্ম্ম ও নীতির প্রসারার্থ আন্তরিক চেষ্টা ও আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। একদা রাজা ও তাঁহার কন্যা অনুলা, সংঘমিত্রার নিকটে ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "অয়ি পূজ্যতমে ধর্ম্মনেত্রি, যে পবিত্রতম ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের স্নিগ্ধ ঘন পল্লবের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব কোটি কোটি সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষা উজ্জ্বলতম দিব্যজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রভাবে নির্ব্বাণমুক্তি পাইয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের ভারতের গয়াধামের সেই পবিত্রতম মঙ্গলময় মহাপূজ্য বোধিবৃক্ষের একটি মাত্র শাখা ভারত হইতে সিংহলে আনাইলে

সিংহলের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। সিংহল ধন্য, পবিত্র ও সার্থক হয়। ঐ শাখা সিংহলে আসিলে উহা বিধিপূর্ব্বক মহাসমারোহের সহিত সিংহলের এক পবিত্র স্থানে রোপিত হইবে। আপনার কৃপা হইলেই এই সৎকার্য্যটি অনায়াসে সুসাধিত হইতে পারে।" সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের একটি শাখা ভারত হইতে সিংহলে আনয়ন করিলে উহা মহাসমারোহের সহিত যথাবিধি রোপিত হইয়াছিল। সংঘমিত্রার অসীম অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও মহতী চেষ্টায় সিংহলের মহিলাকুলের ধর্ম্মনীতিশিক্ষা ও দীক্ষা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি সম্রাট্‌নন্দিনী হইয়া, সামান্য ভিক্ষুণীবেশ ধারণ করিয়া, ভীষণ সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া, বিদেশে গিয়া, বিদেশীয় রাজার রাজ্যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। স্ত্রীজাতির মধ্যে ঈদৃশী অদ্ভুতশক্তিশালিনী মহিলা ভারতবর্ষ ছাড়া কুত্রাপি উৎপন্ন হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেও সংঘমিত্রার ন্যায় কোন একটি মহিলার নাম দৃষ্ট হইবে না ও শ্রুত হইবে না।

উভয়ভারতী।

পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ কাপালিক দিগম্বরপ্রভৃতি বেদবিরোধী ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অস্বীকারক নাস্তিকসম্প্রদায়ের মত খণ্ডনকরিয়া "এক নিত্য ব্রহ্মই সত্য এবং এই বিনশ্বর জগৎ মিথ্যা মায়াময়," এই "অদ্বৈতবাদ" ভারতের সর্ব্বত্র সংস্থাপন করিবার জন্য যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ভট্টপাদাচার্য্য-নামক এক মহাপণ্ডিত প্রয়াগে অতিশয় প্রতিষ্ঠাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার জন্য মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সময়ে প্রয়াগে গিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগধামে আসিয়া ঐ পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভট্টপাদাচার্য্য ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, 'প্রভো, অদ্য আপনার শ্রীচরণ-পদ্ম দর্শনে আমার জীবন সফল ও ধন্য হইল। যে স্থানে আপনার শ্রীচরণধূলি পড়ে, সে স্থান মহাতীর্থরূপে পরিণত হয়। অদ্য এখানে আপনার আগমনে প্রয়াগধামের তীর্থনামও সার্থক হইল।' ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই পণ্ডিতটিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া ও তাঁহাকে উপদেশদানে কৃতার্থ করিয়া শ্রীআচার্য্যপূজ্যপাদ মণ্ডন-

মিশ্রনামক এক মহাপণ্ডিতকে পরাজয় করিবার জন্য প্রয়াগ হইতে মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন।

মাহিষ্মতী তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। সুদৃশ্যা সুশোভিতা গগনস্পর্শিনী অট্টালিকারাজি, সুপ্রশস্ত পরিষ্কৃত রাজপথসকল, মনোহারিণী বিপণিশ্রেণী, সুপরিচ্ছদশোভিত নাগরিক নরনারীগণ এবং সুরম্য উদ্যান সমূহ, মাহিষ্মতী নগরীর অনুপম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। আচার্য্যপূজ্যপাদ ঈদৃশী নগরী দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় নিকটস্থ একটি সুরম্য উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য ঐ উদ্যানস্থ সুস্নিগ্ধ, সুশীতল ও ঘনচ্ছায়াযুক্ত একটি বৃক্ষবেদিকায় উপবেশন করিলেন। ঐ উদ্যানের নিম্নদেশে রেবানদী-প্রবাহ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। রেবানদীতে প্রস্ফুটিত সুরভি পদ্মসকল ভাসিতেছিল। বায়ু, রেবার তরঙ্গসংস্পর্শে সুশীতল হইয়া এবং ঐ পদ্মরাজির দিব্য সুগন্ধ বহন করিয়া আচার্য্য পূজ্যপাদের সেবা করিতে লাগিল। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি রেবানদীর তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রাতঃস্নান ও ব্রহ্মোপাসনাদি কৃত্য সমাপ্ত করিয়া মধ্যাহ্ন-কালে মণ্ডনমিশ্রের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে কয়েকটি সুসজ্জিতা দাসীকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা মণ্ডনমিশ্রের দাসী। তাহারা নদীতীর হইতে

জল আনয়নের জন্য সুবর্ণ কলস লইয়া নদীতীরে যাইতে-ছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মণ্ডন-মিশ্রের বাড়ী কোথায়? তাহারা বলিল, "বেদ নিত্য স্বতঃ প্রমাণ শাস্ত্র? না; অন্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল শাস্ত্র?" এই কথা যে গৃহের দ্বারদেশে সুবর্ণ পিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ উচ্চারণ করিতেছে, উহাই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবেন। এই কথা বলিয়া দাসীগণ পুনরায় বলিতে লাগিল," "কর্ম্মই সুখদুঃখরূপ ফল দান করে? না, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সুবিচারক পরমেশ্বরই সুখদুঃখরূপ ফল দান করেন?" এই কথা যে গৃহের দ্বারদেশে স্বর্ণপিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ উচ্চারণ করিতেছে, উহাই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবেন।

দাসীগণ আবার বলিতে লাগিল, "এই বিশ্বসংসার নিত্য কি অনিত্য? এই কথা যে গৃহের দ্বারদেশে স্বর্ণ-পিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ উচ্চারণ করিতেছে, উহাই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবেন।" আচার্য্য পূজ্যপাদ দাসীগণের এই প্রকার বচনসকল শুনিয়া ক্রমে মণ্ডনমিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং গৃহটি দেখিয়া বুঝিলেন যে, মণ্ডন একজন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন। তাঁহার উচ্চ অট্টালিকার ছাদের উপরে বৃহৎ পতাকা পবনহিল্লোলে পৎপৎ শব্দে কম্পিত হইতেছে। বহির্দ্বারে ভীমকায় সুসজ্জিত দৌবারিকগণ বসিয়া আছে। প্রহরবাদ্য-ধ্বনির জন্য বৃহৎ ঘড়ী ঝুলিতেছে। প্রহরাবসান-জ্ঞাপক তাৎকালিক

ঘটীযন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। উজ্জ্বলবেশভূষাধারী রাজা মহারাজ ও ধনী নাগরিকগণ মণ্ডনের সহিত সাক্ষাৎলাভার্থ ও ব্যবস্থা-গ্রহণার্থ আগমন করিয়া নিরূপিত স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি যান-বাহন সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে একদিকে অবস্থিত রহিয়াছে। গৃহ-সংলগ্ন বিদ্যামন্দিরে বহুসংখ্যক নানাদেশীয় ছাত্র নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। প্রায় প্রতিদিনই যজ্ঞানুষ্ঠান বশতঃ মণ্ডনের ভবনটি সর্ব্বদা উৎসবে পূর্ণ থাকিত। আচার্য্য পূজ্যপাদ এইরূপ ভবনের তোরণে উপস্থিত হইয়া একটি দৌবারিককে বলিলেন, "মণ্ডন পণ্ডিত কোথায়? তিনি যেখানে আছেন, তথায় আমাকে লইয়া চল।" দৌবারিক তাঁহার অপূর্ব্ব মুখমণ্ডলজ্যোতিঃ, সৌম্যমূর্ত্তি এবং গৈরিক বসন অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, ইনি এক মহাত্মা সন্ন্যাসী। দৌবারিক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মণ্ডনমিশ্রের নিকটে লইয়া গেল। তিনি মণ্ডনমিশ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত গুরু ও পুরোহিতের চরণ প্রক্ষালন করিতেছেন। তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনের পর মণ্ডন, শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া আচার্য্য পূজ্যপাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শিখা-যজ্ঞোপবীতশূন্য মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসন-পরিধায়ী ব্যক্তিকে দেখিয়া তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইলেন এবং

বলিলেন, "শ্রাদ্ধকালে শিখা-সূত্রহীন মুণ্ডিত-মস্তক গৈরিক-বসন-পরিধায়ী লোককে দর্শন করিতে নাই।" মণ্ডন কুপিত হইয়া এইরূপ রূঢ়বাক্য বলিলেও আচার্য্য পূজ্যপাদের ক্রোধোদয় হইল না। তিনি মণ্ডনের ক্রোধ-বর্দ্ধনের ইচ্ছায় কৌতুক ও বচন-চাতুর্য্যের সহিত উত্তর দিতে লাগিলেন। পরে বিবেচনা করিলেন যে, এই প্রকারে মণ্ডনের কুসংস্কার অপসৃত হইবে না। অনিত্য-ফলপ্রদ সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মণ্ডনের হৃদয়ে এইরূপ আলাপে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইবে না। সুতরাং তাদৃশী আলাপরীতি পরিত্যাগ করিয়া অনিত্যফলপ্রদ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রতি-পাদনের জন্য নিম্নলিখিত বৈদিক প্রমাণগুলি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন :—

তিনি বলিলেন, "বেদের মতে 'যে দিবসেই সংসারে বৈরাগ্য উদিত হইবে, সেই দিবসেই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।' বেদ আরও বলেন যে, 'ব্রহ্মচর্য্য-অবস্থা কিম্বা গৃহস্থাবস্থা কিম্বা বানপ্রস্থ অবস্থা হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তত্ত্ব শ্রবণ করিবে।' বেদ আরও বলেন যে, 'হোম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও জড়বস্তু পূজা-রূপ কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। পুত্র পিণ্ড দান করিলেও পিতার মুক্তিলাভ হয় না, প্রেতাত্মার তৃপ্তিলাভ হয় মাত্র। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা, গৃহ, ভূমি ও জলাশয়

প্রভৃতি দান করিলেও মুক্তিলাভ হয় না। মরণান্তে পুনর্ব্বার দুঃখময় শরীর ধারণ করিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত দানাদি সৎকার্য্যের ফলভোগ হয় মাত্র, মুক্তিলাভ হয় না। পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে শারীরিক ও মানসিক দুঃখসকল অবশ্যম্ভাবী। হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, পুত্রোৎপাদন ও ধনদানাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু অজ্ঞান-অন্ধকার-রাশি অপসারিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোক লাভ করিলে মুক্তিলাভ হয়। উপনিষদ্-বেদান্ত-বাক্য-শ্রবণে এবং সেই সকল শ্রুত বাক্যের পুনঃপুনঃ আলোচনা ও বিচার করিলে মনের সন্দেহ সকল দূরীভূত হয়। সন্দেহ দূরীভূত হইলেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তের একগ্রতা জন্মিলেই ধ্যান, ধারণা ও সমাধি নিষ্পন্ন হয়। নির্ব্বিঘ্নভাবে সমাধি-অবস্থা স্থিতিশীল হইলেই পরমেশ্বরে বিলীন হইতে পারা যায়। পরমেশ্বরে একেবারে বিলীন হইতে পারিলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ও পুনরায় আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য আনন্দের সমুদ্রস্বরূপ পরমেশ্বরে একবার বিলীন হইতে পারিলেই মানুষ তদ্রূপ হইয়া যায়। মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হয় না। অজ্ঞানের নাশ না হইলে মুক্তিলাভ হইতেই পারে না। জ্ঞানালোক উদিত হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। জ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা ও বিচার ব্যতিরেকে অজ্ঞানের

নাশ হইতে পারে না। ভ্রান্তি, সন্দেহ ও কুসংস্কারাদি-রূপ অজ্ঞান বিনষ্ট না হইলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। উপনিষদ্-বেদান্ত-বাক্যের শ্রবণ, মনন ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি করিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। নতুবা সহস্র সহস্র মণ ঘৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে এবং পশুহত্যা করিয়া পশুর রক্ত ও চর্ব্বি দ্বারা যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিলে এবং পশুমাংসে উদর পূরণ করিলে কস্মিন্‌কালেও মুক্তিলাভ হইবে না।' বেদ আরও বলিতেছেন যে, 'যে সকল ঋষি ধন ও পুত্রাদি-কামনায় যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় মৃত্যুমুখেই পতিত হইয়াছেন, মৃত্যু-যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় জন্মিয়াছেন, পুনরায় মরিয়াছেন, মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই'।

হে মণ্ডন পণ্ডিত, আমি মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করায় আপনি যে আমার প্রতি বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিলেন, ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আপনি কর্ম্মকাণ্ড-শাস্ত্রই পড়িয়াছেন এবং কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই মত্ত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কোন সংবাদ রাখেন না। আমি নিজের ইচ্ছায় বা নিজের শাস্ত্র অনুসারে এইরূপ বেশ ধারণ করি নাই। বেদের বচন অনুসারে এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। বেদ কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন। 'পরিব্রাজক সন্ন্যাসী গৈরিক বসন পরিধান করিবে ও মস্তক মুণ্ডন করিবে। দারপরিগ্রহ করিবে না'।

হে মণ্ডন পণ্ডিত, আমি শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া আপনি রুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বেদ বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী হইলে শিখা ও যজ্ঞোপবীতের ভার বহন করিবে না। অতএব শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে কেবল আমারই যে ভার বোধ হইবে, তাহা নহে, কিন্তু বেদকেও ভারগ্রস্ত করা হইবে। সেই জন্যই আমি শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করি না। আমি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মোক্ষ-প্রতিপাদক অমূল্য উপদেশগুলি শিরোধার্য্য করিয়া থাকি। হে মণ্ডন পণ্ডিত, আমি আপনার মত কষ্টদায়ক কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি না। আপনার ন্যায় হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বে সমাধি লইতে পরাঙ্মুখ হই না। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্বে সমাধিলাভে অনিচ্ছুক হয় এবং অবহেলা করে, তাহাদের জন্ম-মরণ-প্রবাহ কখনই নিরুদ্ধ হইবে না। তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, 'যাহারা হোমাদি-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পণ্ডিতগণের হোমাদি কর্ম্মের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাদের বিষয়লিপ্ত বুদ্ধি ব্রহ্মসমাধির উপযুক্ত নহে। তাহারা সুদৃশ্য লোহিত 'মাকাল' ফলের ন্যায় বা সুন্দর পুষ্প-গুচ্ছে সুশোভিত বিষ-লতার ন্যায় উক্ত পণ্ডিতগণের আপাততঃ শ্রুতি-মধুর প্রলোভন-বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া

মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং পরে ক্রমাগত জন্ম-মরণ-চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। তাহারা কামাত্মা। অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়-কামনায় তাহাদের চিত্ত সদাই কলুষিত। তাহারা স্বর্গপর। অর্থাৎ তাহারা এই কামনা করে যে, আমরা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে যাইব, স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের অমরাবতী-পুরীস্থিত বৈজয়ন্ত-নামক প্রাসাদে ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরার মনোহর নৃত্য দেখিয়া সুখী হইব, স্বর্গের নন্দন-কাননের পাঁচটি কল্পবৃক্ষের দিব্য সুমিষ্ট ফল খাইয়া সুখী হইব, অমৃতহ্রদের অমৃত পান করিয়া সুখী হইব, ইত্যাদি ইত্যাদিরূপ স্বর্গ-সুখ কামনায় অন্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না যে, বেদের মতে পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গলোক হইতে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইতে হইবে। পুরাণের মতেও তারকাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণ তপস্যা-প্রভাবে স্বর্গের অধিপতি হইলে স্বর্গের দেবগণকে তাড়াইয়া দেয়। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া মহাক্লেশ ভোগ করেন। একবার ব্রহ্মার নিকটে, একবার বিষ্ণুর নিকটে, একবার শিবের নিকটে গিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করেন। আবার রাবণের মত ব্যক্তির 'পাল্লায়' পড়িয়া যম এবং ইন্দ্রকেও অতি নীচ শ্রেণীর দাসত্ব করিতে হইয়াছে। এই ত স্বর্গের সুখ। স্বর্গবাসী ব্যক্তিরা বলে, স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন প্রাপ্তব্য

সুখ-লোকই নাই। কিন্তু তাহারা জানে না যে, স্বর্গের উপরে মহর্লোক, তাহার উপরে জনলোক, তাহার উপরে তপোলোক, তাহার উপরে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বা অমৃতলোকরূপ সর্ব্বোচ্চ একটি লোক আছে। সেই লোকে রাবণাদি নীচ পামর দৈত্যের উপদ্রব নাই। সে লোকে একবার যাইতে পারিলে আর পতনের ভয় থাকে না। সে লোক প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরায় কেহ ফিরিয়া আসে না।

যাহারা স্বর্গ-পরায়ণ, তাহাদিগকে স্বর্গে যাইবার জন্য যজ্ঞার্থ বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়, অগ্নি স্থাপন করিতে হয়, ঘৃত, চরু ও পিষ্টকাদি দ্রব্য নিবেদন করিতে হয় এবং মহাযজ্ঞের অনেক অঙ্গ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সমস্ত ব্যাপার করিয়া স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যভোগের জন্য যাহারা লালায়িত হয়, ঐরূপ ভোগেচ্ছা যাহাদের চিত্ত অপহরণ করে, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি ব্রহ্মসমাধির উপযুক্ত নহে। তাহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মসমাধির পথে পৌঁছিতেই পারে না। তাহাদের সে পথে যাইবার অধিকারই নাই।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এইরূপ শাস্ত্র-প্রমাণযুক্ত কথাগুলি শুনিয়া মণ্ডনমিশ্র মনে করিলেন, এ ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিবার জন্য গৈরিক বসন ও মস্তকমুণ্ডনরূপ বেশ ধারণ করেন নাই। ইনি একজন মহাবিদ্বান্ ও প্রকৃত যতি, এইরূপ বোধ হইতেছে।

অদ্য ইনি যখন আমার বাটীতে অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তখন ইঁহার প্রতি আতিথ্য-প্রদর্শন করাই উচিত। ইঁহার প্রতি ঐরূপে অবজ্ঞা-ভাব প্রকাশ করা আমার মত লোকের পক্ষে অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। উত্তম জাতির গৃহে নীচজাতীয় কোন ব্যক্তিও অতিথি হইলে তাহার প্রতি যথোচিত আতিথ্য-প্রদর্শন করিতে হয়। আর ইনি যখন একজন আমাদের ধর্ম্মের মতে ভিক্ষু-নামক চতুর্থ আশ্রমী, তখন অদ্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ-দিবসে ইঁহাকে ভিক্ষা দান করিলে, ইঁহার প্রতি উত্তমরূপে আতিথ্য প্রদর্শন করিলে আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করা হইবে এবং পুণ্যও হইবে। আজ আমার মহাসৌভাগ্য যে, এইরূপ একজন বিদ্বান্ সন্ন্যাসী বিনা নিমন্ত্রণে আমার বাটীতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমার যথেষ্ট ত্রুটি হইয়াছে। আর সে বিষয়ের জন্য এক্ষণে চিন্তা করিয়া কি হইবে? 'গতস্য শোচনা নাস্তি' যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এক্ষণে অনুশোচনা করিয়া কি হইবে? তাহার প্রতীকারের চেষ্টাই করা উচিত। এইরূপ মনে করিয়া মণ্ডনমিশ্র তাঁহার অপরাধের জন্য ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ-দিবসে তাঁহার বাটীতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য ভগবান্‌কে মহাসমাদর ও শ্রদ্ধার সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন।

কিন্তু ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "আমি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভিক্ষার জন্য আপনার বাটীতে আসি নাই। আমি তর্ক-ভিক্ষার জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমি ভারতের সর্ব্বত্র অদ্বৈতবাদ-সংস্থাপনার্থ পর্য্যটন করিতেছি। মাহিষ্মতী নগরীতে অদ্বৈতবাদ-সংস্থাপনার্থ আগমন করিয়াছি। এখানে আসিয়া শুনিলাম, আপনি এক-জন হোমাদি-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পণ্ডিত। হোমাদি-কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করাইয়া আপনাকে সন্ন্যাসী করিব এবং পরে আপনার দ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রচার করাইব। জগতের লোক যাহাতে মুক্তির পথে আসিতে পারে, আপনার দ্বারা তাহার উপায় করাইব। শুনিয়াছি, আপনি অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী নহেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রচারক সন্ন্যাসীদিগকে আপনি অবজ্ঞা করেন। সেই জন্য আপনার মত লোককে অদ্বৈতবাদ মানাইতে পারিলে জগতের একটা ভাল কার্য্য করা হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনার বাটীতে আসিয়াছি। আপনি তর্ক ব্যতিরেকে সহজে অদ্বৈতবাদ মানিবেন না, হোমাদি-কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তির পথে আসিবেন না, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেই জন্যই বলিতেছি যে, আমি অন্নব্যঞ্জন ভিক্ষার জন্য আপনার বাটীতে আসি নাই; কিন্তু আমি তর্ক-ভিক্ষার জন্য আপনার বাটীতে আসিয়াছি। অতএব আমাদের দুই জনের মধ্যে যিনি যাঁহার নিকটে তর্কে পরাস্ত

হইবেন, তিনি তাঁহার শিষ্য হইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে তর্ক-ভিক্ষা দান করুন। আমি দেখিতেছি যে, আপনি কামনাযুক্ত-যজ্ঞকর্ম্মে সদাই ব্রতী। উপনিষৎ ও বেদান্ত-প্রতিপাদিত নিষ্কামধর্ম্মে আপনার তত আস্থা নাই। সেই জন্য আপনার ন্যায় কামনা-কলুষিত বেদান্ত-বিরোধী অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিবার জন্য এবং বেদান্ত ও উপনিষদের পথকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব আপনি কাম্য-কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া বেদান্ত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন কিম্বা বিচার করুন, কিম্বা 'পরাজিত হইলাম' এই কথা বলুন। বিচারে আমি যদি পরাজিত হই, তাহা হইলে আমি আপনার ন্যায় গৃহী হইয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিব এবং আপনি যদি পরাস্ত হয়েন, তাহা হইলে আপনাকে আমার মত সন্ন্যাসী হইতে হইবে ও গৈরিক বসন পরিধান করিতে হইবে, বিচারের পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হউক। আর বিচার যদি না করেন তাহা হইলে বলুন যে, 'আমি পরাজিত হইলাম'।"

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এইরূপ কথা শুনিয়া মণ্ডন-মিশ্র বলিলেন যে, "বিচার ব্যতিরেকে 'আমি পরাজিত হইলাম' এ কথা আমার মুখ হইতে কখনই নির্গত হইবে না। আমিও বহুদিন হইতেই এই ইচ্ছা করিতে-ছিলাম যে, যদি কোন বেদান্তী আমার ভবনে কখন

উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত যেন আমার উত্তমরূপে একটি শাস্ত্রীয় বিচার হয়। আমার মনে অনেক সময় এইরূপ একটা কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। অদ্য ভাগ্যবশতঃ আপনি আমার বাটীতে আসায় সেই কৌতূহলটি চরিতার্থ হইবে, এইরূপ মনে হইতেছে।"

এই বলিয়া মণ্ডনমিশ্র তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মণ্ডনের পুরোহিত ও গুরু বলিলেন, "মণ্ডন, ইনি একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী নহেন। ইনি বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যকার। ইনি শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য। ইনি সাধারণ লোক নহেন।"

মণ্ডন, আচার্য্য পূজ্যপাদের এইরূপ পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "জগদ্বিখ্যাত যতিরাজ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্য আমার পর্ণকুটীরে উপস্থিত! আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার মহাসৌভাগ্যের দিন। আজ সুপ্রভাত। ঈদৃশ মহামান্য অতিথির সমাগম হওয়া পূর্ব্বজন্মের মহাসুকৃতির ফল। কিন্তু আমি সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে, আমি অদ্য এইক্ষণে পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছি। অদ্য আমি বড়ই ব্যস্ত। শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। শ্রাদ্ধান্তে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। আজ আর মোটেই সময় পাইব না। কল্য আমাদের বিচার হইবে। তবে একটা বিষয় এইক্ষণেই স্থির হইয়া যাউক্। আমাদের এ বিচারে মধ্যস্থ হইবে কে?"

মণ্ডন স্বীয় গুরু ও পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনারাই এই বিচারে মধ্যস্থ হউন।" তাঁহারা বলিলেন, "মণ্ডন, আমাদিগের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, ইহা সত্য ; কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে, তোমার ধর্ম্মপত্নী ধরাতলে মানবীরূপে অবতীর্ণা শ্রীসরস্বতী দেবতা শ্রীমতী উভয়ভারতী দেবী এই বিচারে মধ্যস্থা হউন।" তাঁহারা এইরূপ অনুমতি করাতে তাহাই ধার্য্য হইল। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মণ্ডনকে বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে বিচারার্থ আপনার বাটীতে আসিব"। এই কথা বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলে মণ্ডন তাঁহাকে বলিলেন, "হে যতিরাজ, অদ্য শ্রাদ্ধবাসরে আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমার অকল্যাণ হইবে। আমি অতিশয় দুঃখিত হইব"। ভগবান বলিলেন, "আপনি শ্রাদ্ধ করুন। এ সময়ে মুণ্ডিতমস্তক শিখাসূত্রহীন গৈরিক-বসনপরিধায়ীর সহিত বেশীক্ষণ কথা কহিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করা আপনার মত লোকের উচিত নয়। শ্রাদ্ধ করুন। শ্রাদ্ধকাল যেন অতীত না হয়। আমি অন্নব্যঞ্জনের ভিক্ষুক নহি। আমি জ্ঞানভিক্ষু এবং আপনার সহিত বিচারের ভিক্ষুক। আমি কল্য প্রাতঃকালে আপনার বাটীতে বিচারভিক্ষা করিতে আসিব"। এই কথা বলিয়া তিনি রেবানদীতীরস্থিত সেই কাননের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় আসিয়া তিনি পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি

প্রধান প্রধান শিষ্যদিগকে সেই দিনের প্রাতঃকালের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া মাধ্যাহ্নিক স্নান ব্রহ্মোপাসনা ও ভোজন সমাপ্ত করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানাদি-কৃত্য সমাপ্ত করিয়া ও পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচারার্থ মণ্ডনমিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মণ্ডনমিশ্রের অতি প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গনে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। মাহিষ্মতী নগরীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিসকল বিচার-শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মহাবিখ্যাত নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মাত্র দেখিবার জন্য দূরস্থ নগর ও গ্রামের লোকসকল নদীস্রোতের ন্যায় মণ্ডনের গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল। মহাপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভিতরে বাহিরে যে যেখানে পারিল সে সেখানে অতিকষ্টে দাঁড়াইল।

মণ্ডনের ভবনে এত বড় জনতা হইলেও উহার কোলাহলে সভার শান্তিভঙ্গ হয় নাই। কারণ, তথায় ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত মহাত্মার পদধূলি পড়ায় সকলে ধীর স্থির ও ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়াছিল। মূর্খ নীচ ইতর লোক কৌতুক দেখিবার জন্য তথায় জনতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, মণ্ডনমিশ্র খুব বড়লোক ছিলেন। তাঁহার গৃহে শান্তিরক্ষার্থ বহু সুসজ্জিত

ভীমকায় মহাবল রক্ষিবর্গ নিযুক্ত ছিল। সুতরাং তাদৃশ জনতায় সভায় শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য সভায় উপস্থিত হইবা মাত্র সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। পতিভক্তিপরায়ণা মূর্ত্তিমতী বিদ্যা শ্রীমতী উভয়ভারতী দেবী বিচারে মধ্যস্থতা-গ্রহণার্থ সভামধ্যে বিরাজমানা ছিলেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত আকর্ণ নয়ন-যুগল হইতে যেন বিদ্যাজ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছিল। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই এই মনে হইতেছিল যে, ভগবতী শ্রীসরস্বতী দেবতা যেন মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সরস্বতী মনে করিয়া ভক্তি করিত। এই জন্য তাঁহার "সরস্বতী" বলিয়া অপর একটি নাম আছে। সকলেরই সহিত তিনি সুমিষ্টভাষিণী ছিলেন বলিয়া তাঁহার "সরস-বাণী" বলিয়া আরও একটি নাম আছে। এই নামেই তিনি বিহারপ্রদেশে অধিক বিখ্যাতা ছিলেন। তিনি বিহারের বিখ্যাত শোণনদের তীরসমীপে একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বিষ্ণুমিত্র। শৈশবে তাঁহার বুদ্ধিপ্রাখর্য্য ও প্রতিভা অবলোকনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুনিলে মহাবিস্ময় জন্মে, তিনি ষোড়শবর্ষ-বয়ঃক্রমের মধ্যে

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গ, ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও ইতিহাসাদি নানাশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে এই সামান্য বয়সে এইরূপ অদ্ভুত বিদ্যাবত্ত-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সরস্বতীর অবতার মনে করিত এবং তাঁহাকে পূজা করিত। অভিমান অহঙ্কার দর্প এই শব্দগুলির সহিত তিনি শাস্ত্র পড়িবার সময়ে পরিচিত হইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু কখনও তাহাদিগকে নিজের মনের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য আশ্রয় দান করেন নাই। তিনি সকলের সহিত অতি উত্তম সুমধুর ব্যবহার করিতেন বলিয়া সরসবাণী এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরস সুমধুর বাণী শ্রবণ করিয়া পাষাণবৎ কঠোরচিত্ত দ্রব হইয়া যাইত। তিনি কোন কারণ বশতঃ কখন ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ় অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। বিদ্যা-শিক্ষা করিলে যে সকল সদ্‌গুণ উৎপন্ন হওয়া উচিত, সেই সকল সদ্‌গুণে তিনি ভূষিতা ছিলেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় পিতা ও মাতা স্বীয় কুমারী কন্যাকে ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে সুশিক্ষা দিয়া কন্যার উপযুক্ত বিদ্বান রূপবান গুণবান ও সম্পত্তিমান ও একটি পাত্রের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতেন। উভয়ভারতীকে যতদূর উচ্চশিক্ষা

দিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কন্যার শিক্ষাসমাপ্তির পর তাদৃশ একটি পাত্রের অনুসন্ধানার্থ বিষ্ণুমিত্র ঘটক নিযুক্ত করিলেন। ঘটক বহু অনুসন্ধানের পর একদিন একটি সুপাত্রের সম্বাদ আনয়ন করিল এবং বিষ্ণুমিত্রকে বলিল, মহাশয়, রাজগৃহ-নামক স্থানে হিমমিত্রনামক পণ্ডিতের পুত্র মণ্ডনমিশ্রনামক একটি বিদ্বান ও রূপগুণসম্পত্তিমান পাত্র আছেন। তিনি বেদাধ্যয়ন, হোম, অতিথিসেবা ও অধ্যাপনাদি সৎ-কার্য্যে সদাই ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অবতার।

তিনি বিখ্যাত রূপবান বলিয়া বিশ্বরূপ নামে পরিচিত। ঘটকের নিকটে ঈদৃশ উত্তম পাত্রের সম্বাদ পাইয়া বিষ্ণু-মিত্র স্বীয় পত্নীকে ইহা জানাইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নী এই শুভ আনন্দসম্বাদ শুনিয়া উভয়ভারতীর শুভবিবাহ স্থির করিবার জন্য রাজ-গৃহে পাত্রের পিতার নিকটে ঘটক প্রেরণ করিতে বলিলেন। উভয়ভারতী ঈদৃশ উত্তম পাত্রের সম্বাদ শুনিয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আহ্লাদ অনুভব করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা এমন কি, তাঁহার কোন প্রিয়সখীও তাঁহার এই আহ্লাদের কোন বাহ্যচিহ্ন দেখিতে না পাইয়া তাঁহার এই আন্তরিক আহ্লাদ অনুমান করিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন।

প্রগল্‌ভতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তাঁহার হৃদয়ে বিবাহেচ্ছা উদিত হইলেও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন প্রিয়সখীও তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারে নাই। তিনি এই জানিতেন যে, তাঁহার বিবাহের জন্য তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার পিতা মাতার ভাবনা অনেক বেশী। তাঁহারা যেরূপ স্থির করিবেন তাহাই হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন অধিকার থাকা উচিত নয়। তিনি এই বুঝিতেন যে, তাঁহারা যে পাত্রকে মনোনীত করিবেন সেই পাত্রের সহিতই তাঁহার বিবাহ হইবে। তাঁহার মাতা, তাঁহার পিতা বিষ্ণুমিত্রের নিকটে সর্ব্বদাই বলিতেন, "আহা বাছা আমার কেবল লেখা পড়াই শিখিয়াছে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা মোটেই শিখে নাই"। উভয় ভারতী বাল্যকালে ভারতীয় সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার সময় এইরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, "স্ত্রীলোক কৌমারে পিতার অধীন হইবে, যৌবনে পতির অধীন হইবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না।" এইরূপ উত্তম শিক্ষার প্রভাবে তিনি স্ত্রীজনোচিত লজ্জাশীলতা-গুণে ভূষিত হইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ উত্তম শিক্ষা যাহারা পায় না, তাহারাই স্বাধীনচেতাঃ প্রগল্‌ভা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া দাঁড়ায় এবং সংসারে অশান্তি উৎপাদন করে। উভয় ভারতীর পিতা,

রাজগৃহনামক স্থানে পাত্রের পিতা হিমমিত্রের নিকটে ঘটক পাঠাইলেন। হিমমিত্র ঘটকের নিকট পাত্রীর রূপ-গুণের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া এই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণুমিত্র ঘটকের নিকটে পাত্রের পিতার সম্মতি অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পরদিন ভাবী জামাতাকে "পাকাদেখার" আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হিমমিত্রের গৃহে গমন করিলেন। বিষ্ণুমিত্র ভাবী-জামাতার সুন্দর সুবুদ্ধিব্যঞ্জক মুখ, দীর্ঘ ললাট, প্রশস্ত নয়নযুগল, আজানুলম্বিত বাহু, বিপুল বক্ষঃস্থল এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি হিমমিত্রের নিকটে তাঁহার সবিশেষ কুল পরিচয় অবগত হইয়া ধান্য দূর্ব্বা ও সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া ভাবী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং হিমমিত্রও পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য শুভদিনে বিষ্ণুমিত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া পাত্রীকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিবাহের শুভদিন স্থির করিবার কথা উত্থাপিত হইল। বিষ্ণুমিত্র বলিলেন, আমার কন্যা ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী। অতএব আমার ইচ্ছা যে, উভয়ভারতী নিজেই নিজের বিবাহের শুভদিন গণনা করেন। হিমমিত্র এই প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদের সহিত ইহাতে সম্মতি দিলেন। তদনুসারে উভয়ভারতী নিজের এই শুভবিবাহের লগ্ন নিজেই

গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি উত্তমরূপে গণনা করিয়া বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করিলেন। লগ্নপত্র খানি একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর উভয় পক্ষে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে মণ্ডনমিশ্র বরোচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ করিয়া আত্মীয় ও মিত্র প্রভৃতি বরযাত্রিগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ মনোরম বাদ্য এবং বরযাত্রাশোভাবর্দ্ধক হস্তী ঘোটক ও উষ্ট্র প্রভৃতি সহ বিষ্ণুমিত্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র মহা-সমাদরপূর্ব্বক পাত্র, পাত্রের পিতা এবং বরযাত্রীদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাইলেন এবং পাত্রকে রত্নখচিত কারুকার্য্যসুশোভিত বহুমূল্য বরাসনে উপবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন, "অদ্য আমি আমার কন্যা উভয়ভারতী, এবং আমার গৃহে যাহা কিছু আছে, সেই সকল বস্তুই তোমার জানিবে। তোমার ন্যায় সৎপাত্রের আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল। অদ্য আমি সকলের নিকটে আদরণীয় হইলাম"। বিষ্ণুমিত্র ভাবীজামাতাকে তাৎকালিক রীতি অনুসারে এইরূপে অপ্যায়িত করিয়া বরযাত্রীদিগের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময়ে বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা ও উজ্জ্বল পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিতা উভয়ভারতী

অন্তপুরমধ্যে পতিপুত্রবতী পুরন্ধ্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন।

পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী পুরস্ত্রীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বৈবাহিক মাঙ্গল্যদ্রব্যসকল রচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় অন্তঃপুরে গিয়া পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ-লগ্নের বিলম্ব কত"? উভয়ভারতী তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "পূজ্যতম পুরোহিতমহাশয়, লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে"। পুরোহিত মহাশয় "তথাস্তু" বলিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন এবং শুভলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে এই কথা বিষ্ণুমিত্রকে নিবেদন করিলেন। বিষ্ণুমিত্র বিবাহসভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া পাত্রকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তথায় পূজাগৃহে মঙ্গলচিত্রসুশোভিত পীঠে বরকে বসাইলেন। কন্যাপক্ষীয় চারিটি পুরুষ উভয়ভারতীকে একটি সুচিত্রিত চতুষ্কোণযুক্ত পীঠে বসাইয়া সম্প্রদানস্থানে বহন করিয়া আনিল এবং তথায় ঐ পীঠ স্থাপন করিল। পুরোহিতমহাশয় বর ও কন্যাকে বিবাহমন্ত্র পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুমিত্র ৺শালগ্রামশিলা ও অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া মণ্ডনের হস্তে উভয়ভারতীকে সমর্পণ করিলেন। সেই সময়ে শঙ্খপ্রভৃতি মঙ্গলবাদ্যধ্বনিতে দিগন্ত পূরিত হইল।

পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী পুরস্ত্রীরা "হুলুহুলু" ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং বিবাহকালোচিত "স্ত্রীআচার"-সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেন। সেই সময় সামবেদ-গাতা ব্রাহ্মণগণ সুমধুর সামবেদগানে সকলকে মোহিত করিতে লাগিলেন। সকলেই এইরূপ বিবাহ দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তত্রত্য নরনারী-গণ বলিতে লাগিলেন, "সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না, মেঘশূন্য শরচ্চন্দ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়া যেমন অপূর্ব্ব শোভা পায় এবং ধরাতলে অবতীর্ণা গঙ্গা, সাগরের সহিত মিলিতা হইয়া যেমন সুশোভিতা হয়েন, তদ্রূপ পৃথিবীতে মানবীরূপে অবতীর্ণা সরস্বতী উভয়ভারতী মণ্ডনমিশ্রের সহিত অদ্য সঙ্গতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন"। এইরূপে মণ্ডনমিশ্রের সহিত উভয়ভারতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া হিমমিত্র স্বজনগণের সহিত স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মণ্ডন রাজগৃহস্থিত পৈত্রিকভবনে কিছুকাল বাস করিয়া পরে রেবানদীতীরস্থ মাহিষ্মতী নগরীতে এক উচ্চ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় মহা-সুখে সস্ত্রীক বাসকরিতে লাগিলেন এবং এই গৃহেই ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে একাত্মবাদ বা একেশ্বর-বাদ বা অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করাইবার জন্য বা বেদান্তমত মানাইবার নিমিত্ত বিচার করিতে আসিয়াছিলেন।

এবং এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিচারে মহাবিদুষী উভয়ভারতী মধ্যস্থা হইয়াছিলেন। এই বিখ্যাত বিচারের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বকীয় নির্দ্দোষ বেদান্তমত সংস্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে বলিলেন, "বেদ বলিতেছেন এক, অদ্বিতীয়, নিত্য চেতন, আনন্দস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, বিশ্বের স্রষ্টা পালয়িতা ও লয়ের আধার, ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই একমাত্র সত্যপদার্থ। যে এই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান বা বা জ্ঞানী। সেই ব্যক্তিই এই শোকদুঃখপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে ব্যক্তির পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে লীন হইতে বা মুক্ত হইতে পারে। যিনি মুক্তিলাভ করেন, তিনি আর এই দুঃখময় মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি আর ইহলোকে ফিরিয়া আইসেন না। তিনি অপার অবিনশ্বর আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া আনন্দসাগর-স্বরূপ হইয়া যান্। যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড হইতে ঘট, কলস, "হাঁড়ী," ও "সরা" প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নয়, উহারা মৃত্তিকাতত্ত্বকে অতিক্রম করে না, উহারা মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকায় আশ্রিত হইয়া মৃত্তিকাতেই লীন হইয়া যায় এবং মৃত্তিকায় লীন

হইয়া গেলে উহারা যেমন স্ব স্ব নামবিহীন হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের উপাদান কারণ মৃত্তিকা তখন বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, উহা তখনও সৎ বা বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র পর্ব্বত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরেই বিলীন হইয়া যায়, এবং তাঁহাতে বিলীন হইলে তাহারা স্বস্ব নাম ও আকারবিহীন হয় বা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের উপাদান ও নিমিত্তকারণস্বরূপ পরমেশ্বর বিনষ্ট হয়েন না। তিনি যেমন আছেন তেমনই সর্ব্বসময়ে সত্যরূপে বিদ্যমান থাকেন। কিম্বা যেমন সুবর্ণপিণ্ড হইতে হার বলয়াদি অলঙ্কার উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করে, পরে ঐ সমস্ত অলঙ্কার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেলে স্বস্ব নাম ও আকৃতিবিহীন হইয়া পড়ে, এবং পরে অগ্নিসংযোগে গলিত হইয়া সুবর্ণপিণ্ডেই পরিণত হয়, তখন হার বলয়াদির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও সুবর্ণপিণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু সুবর্ণপিণ্ড তখন সত্য বা সৎ-রূপে বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমেশ্বর হইতে চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র ও পর্ব্বতাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরেই আশ্রিত হয় এবং প্রলয়কালে স্বস্ব নাম ও আকৃতিবিহীন হইয়া পরমেশ্বরেই বিলীন হইয়া যায়। তাহারা পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া গেলে পরমেশ্বর সত্যরূপে

সদা বিদ্যমান থাকেন। তিনি কুত্রাপি বিলীন হয়েন না বিনষ্ট হয়েন না। তিনি একমাত্র পরম সৎপদার্থ। তাঁহা হইতে উৎপন্ন পদার্থসকল ব্যবহারিক সৎমাত্র। পারমার্থিক সৎ নহে। উঁহারা বিনশ্বর, এই এক চেতন পরমাত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ হইলে জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। ঐ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নিজেকে পৃথক মনে করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিন্নবোধ-রূপ অজ্ঞান বা ভ্রান্তি বশতঃ আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি রাম, আমি শ্যাম, আমি দেব, আমি যক্ষ, এবং আমি কিন্নর ইত্যাদি মিথ্যা মরুমরীচিকাসম সুখদুঃখাদিবোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু উপনিষৎ ও বেদান্ত বাক্য শ্রবণ ও বিচারাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়। তখন পরমাত্মা ছাড়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্বের বোধ হয় না। স্থূলত্ব কৃশত্ব গৌরত্ব কৃষ্ণত্বাদি শরীরের ধর্ম্ম। অন্ধত্ব বধিরত্বাদি, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। উঁহারা পরমাত্মার ধর্ম্ম নয়, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা পৃথক একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, পরমাত্মা চেতন ও আনন্দস্বরূপ। শোক-দুঃখাদি তাঁহার ধর্ম্ম নয়, সুতরাং কেন আমি বৃথা শোক-দুঃখের অধীন হইব। আমি যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহাতে

আশ্রিত এবং যাঁহাতে বিলীন হইব, তিনি অমৃতআনন্দ-সাগরস্বরূপ, সুতরাং ভ্রান্তিবশতঃই আমি শোকদুঃখে অধীর হইয়া পড়ি। শোকদুঃখে অধীর হওয়া আমার পক্ষে কোন প্রকারেই উচিত নয়, ইত্যাদিরূপ বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বলআলোক উদিত হইলে সেই তত্ত্বজ্ঞান-বলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান সাধিত হয়। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সুসিদ্ধ হইলে এই শোকদুঃখ-ভ্রান্তিময় সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। তখন ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মময় হইতে পারা যায়, তখন মানবের কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। তখন মানবের জন্মমরণ-চক্রের ঘূর্ণন শেষ হইয়া যায়। তখন মানব সেই ব্রহ্ম-লোক বা সত্যলোক হইতে আর ফিরিয়া আইসে না, যতকাল পর্য্যন্ত এইতত্ত্বজ্ঞান উদিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানব শান্তচিত্তে সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। "তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত"। (বেদ) সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এই জগৎ ব্রহ্মেই আশ্রিত এবং পরে ব্রহ্মেই লীন হইবে। অতএব সেই ব্রহ্মকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। তাঁহাকে এইরূপে উপাসনা করিলেই তাঁহাতে বিলীন হইতে পারা যায়। নতুবা তাঁহার সৃষ্ট সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণকে সহস্র সহস্রবার পূজা করিলে তাঁহাতে বিলীন হইয়া তন্ময় হইতে পারা যায় না। জ্ঞান

ও ভক্তি ব্যতিরেকে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। বেদ বলেন, "যাগাদিধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি তাদৃশ ধর্ম্মের ফল হইতে অন্যত্র স্থিত অর্থাৎ অতিদূরবর্ত্তী, অধর্ম্মও তাঁহাকে কোনকালেই স্পর্শই করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুণ্য অপুণ্য কৃত ও অকৃত কর্ম্মের ফল হইতে অতিদূরবর্ত্তী"। অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে কিছু-দিন স্বর্গভোগই হয় মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি কাহারও পুণ্য ও সৃষ্টি করেন না, বা পাপ ও সৃষ্টি করেন না। মানুষ নিজের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পুণ্য ও পাপ নিজেই সৃষ্টি করে এবং নিজের অজ্ঞানে আবৃত হইয়া নিজেই দুঃখ পায়। পরমেশ্বরকে কোন বিষয়ে দায়ী করা ঠিক নয়। তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাহার ফল তুমিই পাইবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পুনরায় মর্ত্তের মহাকষ্ট তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। সেইজন্য মোক্ষলাভেচ্ছু সাধুগণ, ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মময় হইতে চাহেন, কিন্তু স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা করেন না। কারণ, যে ব্যক্তি উত্তম রাজমার্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়, সে নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করে না, কিম্বা কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইবার জন্য ব্যগ্র হয় না। অতএব অনিত্য স্বর্গ-লোকের কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা উচিত।

সেই অক্ষয়লোক পাইতে হইলে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশবাক্য-অধ্যয়ন শ্রবণ বিচার ও পরে তাঁহাতে সমাধি করিতে হয়। বেদ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় আচার্য্যের নিকটে বেদান্ত ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। এই পরমাত্মা পরমেশ্বরের কোন-কালেই বিনাশ নাই”। স্বর্গে গমন করিতে হইলে যজ্ঞ করিতে হয়, যজ্ঞে পশুহত্যা করিতে হয়। পশুহত্যাজনিত সেই পাপ স্বর্গে গিয়াও, ভোগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত যখন কোন দুষ্ট দৈত্য দানব তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত শক্তি-শালী হইয়া উঠে, তখন তৎকর্ত্তৃক স্বর্গ-আক্রমণ, গলে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে দেবগণের নিষ্কাশন, স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের দারুণঅপমানসহন ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন, অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বর্গ হইতে চতুর্গুণ উচ্চে অবস্থিত সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকে দুষ্টদৈত্য-দানবের উপদ্রবের ভয় নাই। সেখানে নীচ পামর দৈত্য দানব গমন করিতে পারে না। সেখানে গমন করিতে হইলে বা তন্ময় হইতে হইলে অনিত্যফলের কামনা পরি-ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সত্যলোক অবিনাশী বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান এবং অক্ষয় রাজধানী। উহাতে বিশ্বের অবিনাশী সম্রাট পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকেন। ঐ অক্ষয় রাজধানীতে যাইতে হইলে উপনিষৎরূপ উচ্চ তোরণের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অতএব হে মণ্ডনমিশ্র

মহাশয়, অত্যুচ্চ উপনিষৎরূপ তোরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, মহার্ষিব্যাসের সূত্রগ্রথিত বেদান্তবাক্যমালার পবিত্র মধুর সৌরভ গ্রহণ করুন। যজ্ঞীয় পশুর চর্ব্বির দুর্গন্ধের মায়া পরিত্যাগ করুন। শুনিয়াছি, আপনার এই পত্নী শ্রীমতী উভয়ভারতীদেবী মহতীপণ্ডিতা। ইনি আপনার পত্নী হইলেও আপনা অপেক্ষাও মহতীপণ্ডিতা, সেইজন্যই আমি ইঁহাকে এই বিচারে মধ্যস্থা মানিয়াছি। আমি যে কথাগুলি বলিলাম; তাহা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা বা উপনিষৎ ও বেদান্তাদিপ্রমাণযুক্ত কথা, তাহা ইনি সত্যের অনুরোধে অবশ্যই বলিবেন। এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি আপনার হোমাদি ক্রিয়া-কলাপের পারমার্থিকতা সংস্থাপন করুন। মণ্ডনমিশ্র ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া হোমাদি ক্রিয়া-কলাপের পারমার্থিকতা সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। মণ্ডন বলিলেন, আপনার বেদান্তমত স্বীকার করিতে গেলে "যতদিন বাঁচিবে ততদিন হোমানুষ্ঠান করিবে," এইরূপ বেদবাক্য অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত হোমাদিকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি আপনার বেদান্তে উক্ত ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে হোমাদি কর্ম্মের শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ব্যর্থ ও অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। সেইজন্য বলিতেছি যে, যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল

পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনবার হোমকরাই উচিত। হোম করিলেই জীবের মুক্তিলাভ হইবে। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিলেন, হোম করিলেই মুক্তিলাভ হয়, একথা কোন প্রামাণিক শাস্ত্রের কথা নয়। আপনি হোমাদিকর্ম্ম-প্রতিপাদক মীমাংসাদর্শনের মতানুসারে চলেন। মীমাংসাদর্শন জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী নিত্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি এক ঈশ্বরের অস্তিত্বস্বীকার বিষয়ে ও আত্মতত্ত্ব বা মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন নাই। মীমাংসাদর্শন বলেন, মন্ত্রই দেবতাস্বরূপ। দেবতাস্বরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, পরে তাহার ফল লব্ধ হইয়া থাকে। মীমাংসাদর্শন যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচার ও সিদ্ধান্তে পূর্ণ। উহাতে আত্মতত্ত্ব বা মুক্তিতত্ত্বের সবিশেষ বিচার নাই। যে শাস্ত্র জগতের পালয়িতা সংহর্ত্তা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বেশি কিছু বলেন নাই, সে শাস্ত্রের দ্বারা ত্যাগী মুমুক্ষু ব্যক্তির কোন উপকার সাধিত হয় না। সে শাস্ত্রের মত এই যে, যজ্ঞকর, জন্মান্তরে তাহার ফল পাইবে। যাহারা জন্মান্তর কামনা করে, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে চাহে, তাহারা যে কিরূপ দুঃখভোগী কঠোরজীব, তাহাও কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হইবে? মণ্ডন বলিলেন, যজ্ঞানুষ্ঠানের পারমার্থিকতা না থাকিলে যজ্ঞানুষ্ঠানবাদী মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি জৈমিনির

মত কি তাহালে ভূল? ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিলেন মহর্ষি জৈমিনি জগতের উপকারার্থ এই শাস্ত্র রচনাকরিয়াছিলেন। লোক অজ্ঞতাবশতঃ মহর্ষির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাক্যে সন্দিহান হইয়া পড়ে। মহর্ষি জৈমিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্বশাস্ত্র রচনার জন্য ইচ্ছুক হইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে, এই নশ্বর জগতের অধিকাংশ লোকই ঐশ্বর্য্য-ভোগে আসক্তচিত্ত,। শুভ অদৃষ্টের বল না থাকিলে ইহজন্মে বা পরজন্মে মানবের ঐশ্বর্য্য সুখভোগ ঘটে না। পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত শুভাদৃষ্ট জন্মে না। সুতরাং তিনি ঐশ্বর্য্যসুখভোগেচ্ছু জনগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের মীমাংসাদর্শনে পুণ্যকর্ম্মসমূহ ও তাহার ফলগুলি নিরূপণ করিয়াছেন। এক অদ্বিতীয় নিরাকার মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উপাসনায় এবং নির্ব্বাণ-মোক্ষলাভে সাধারণের মতি গতি নাই ও অধিকারও নাই। ইহা দেখিয়া তিনি সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের শাস্ত্ররচনায় আর প্রয়াসী হইলেন না। নতুবা তিনি যে, পরমাত্মবাদে মোটেই আস্থাবান নহেন, এ কথা কোনমতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, পরমাত্মবাদে তাঁহার যদি আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই বেদবাক্যের সাহায্য অবলম্বন করিতেন না। যথা— "ব্রাহ্মণগণ, বেদবচন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন"।

এই বেদবাক্যদ্বারা ইহা উত্তম রূপে বুঝা যাইতেছে যে, আত্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের এক মাত্র উপায়। এই বেদবাক্যে যদিও যজ্ঞ ও দানের কথার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু শেষে "তপসা" এই পদটি থাকাতে পাপনাশক তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, এইরূপ অর্থই এই বেদবাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে। সেই পাপনাশক তপস্যা কি? তাহা শুনুন। নিত্য ও অনিত্য পদার্থের প্রকৃতরূপে পার্থক্যজ্ঞান, ঐহিক সুখ-ভোগে বা মৃত্যুর পর পুনরায় এই পার্থিব সুখভোগ বা স্বর্গসুখভোগে বিরাগ, অন্তরিন্দ্রিয়ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দমন, ব্রহ্মচর্য্যপালন, শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা, আচার্য্যের উপাসনা, দেহ ও চিত্তের পবিত্রতাসম্পাদন, ধৈর্য্যাবলম্বন, জন্ম মৃত্যু জরা এবং ব্যাধিতে সদা দোষদৃষ্টি, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্তি, পরমেশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি, সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান, লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় এবং সুখ্যাতি ও নিন্দায় সমভাব, নির্জন স্থানে বাস, যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তোষ, বৃথাবাক্য বা মিথ্যাবাক্য মুখহইতে নির্গত হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে মৌনাবলম্বন, সর্ব্বপ্রাণীতে দয়াও অবিদ্বেষ, সর্ব্বপ্রাণীর সহিত মিত্রতাভাব, নির্ম্মমতা নিরহঙ্কারতা, ক্ষমা, সর্ব্বদা সন্তোষ, স্থিরবুদ্ধিতা, পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ এবং তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস, ইত্যাদিরূপা পাপনাশিনী অজ্ঞাননাশিনী বা অবিদ্যানাশিনী তপস্যার অনুষ্ঠানই

মুক্তির কারণ, ইহাই এই বেদবচনের তাৎপর্য্যার্থ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের অমৃতময় উপদেশ যাহারা না পায়, তাহারা আনন্দময় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারে না। তাঁহারা সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের মহিমা না বুঝিয়া তাঁহার সৃষ্ট সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বরুণ ও বায়ু প্রভৃতি দেবতার শক্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের পূজার নিমিত্ত কেবল ঘৃতাদি দ্রব্য ক্ষয়করে মাত্র। জ্ঞান-শাস্ত্রের বা মুক্তিশাস্ত্রের কোন অনুসন্ধান রাখে না।

অজ্ঞ মনুষ্যগণ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া অল্পশক্তিবিশিষ্ট পুত্রদিগকে লইয়াই আত্মহারা হইয়া পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "আমিই এই জগতের পিতা। যে ব্যক্তি আমাকে দুর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র প্রভৃতি পত্র, পদ্ম মালতী যূথিকা সেফালী বেলা ও চামেলী প্রভৃতি উত্তম উত্তম সুগন্ধি পুষ্প, আম্র প্রভৃতি উত্তম ফল, এবং গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য নদীর নির্ম্মল জল ভক্তির সহিত আমাকে প্রদান করে, আমি ভক্তের ভক্তির উপহার সেই সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকি"। যিনি ঐ সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সেই সকল বস্তু অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎ ভোগ করাই মানুষের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। সেই জন্যই গীতায় ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "তুমি যাহা কিছু সৎকার্য্য করিতেছ, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু

অগ্নিতে অর্পণ করিয়া থাক, যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিও”। যদি যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবানের নাম-যজ্ঞ কর, সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ কর, ভগবদ্বিষয়ক পাঠ-যজ্ঞ কর, শ্রবণ-যজ্ঞ কর, মনন-যজ্ঞ কর, এবং ভগবানের উদ্দেশে জগতের হিত-যজ্ঞ কর। এই জন্যই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, “যে সকল ব্যক্তি আমাতেই চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, আমার কথা লইয়াই পরস্পর কথোপ কথন করে, অন্য লোককে আমার তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করে, আমার বিষয়ই সর্বদা আলোচনা করে, তাহাতেই মহানন্দ্ভোগ অনুভব করে, তাহাতেই রত হয়, আমাতেই সতত যুক্ত এবং আমার ধ্যানেই সর্ব্বদা নিমগ্ন হয়, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত এবং তাহাদিগকেই আমি জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রদান করি, এবং তাহারাও সেই জ্ঞান ও ভক্তিযোগবলে আমাকে প্রাপ্ত হয়”। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান ও ভক্তিযোগই তাঁহাকে পাইবার প্রকৃত উপায়। জ্ঞান ও ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে কেবল শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া যোগ করিলে কিম্বা অগ্নিতে শতসহস্র মণ ঘৃত ঢালিলে ভগবান পরমেশ্বরের চরণকমল-মধুপান কখনও ভাগ্যে ঘটিবে না। অতএব হে মণ্ডনপণ্ডিত, জ্ঞান ও ভক্তি-যোগ শিক্ষায় মন সমর্পণ কর। চিত্তশুদ্ধির কার্য্য কর,

তবে তো চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্ত অন্তরের বস্তু। বাহ্য কার্য্যদ্বারা অন্তঃপদার্থের শুদ্ধি হইবে কিরূপে? অন্তঃসাধনা ব্যতিরেকে অন্তঃপদার্থের সম্যক্ সিদ্ধি হইতে পারে না। চিত্তের কার্য্য না করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কেবল মাত্র হোম করিলে কস্মিনকালেও চিত্তশুদ্ধি হইবে না। হোমকরা যে একেবারে উচিত নয়, একথা আমি বলিতেছি না। কারণ, বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম-রক্ষার জন্য গৃহস্থাশ্রমরূপ দ্বিতীয় আশ্রমে থাকিয়া ব্রাহ্মণকে নিত্য হোম করিতে হয়। বেদপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও পূজা এই পাঁচটি ক্রিয়ার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপনিষৎ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক দর্শনাদি জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। ব্রহ্মতেজের কামনা ব্যতিরিক্ত অন্য বৈষয়িক কামনা ত্যাগ করিতে হয়। নিষ্কাম যজ্ঞ করাই উচিত। নিষ্কামযজ্ঞে মোক্ষ-লাভ হয়। নিষ্কামযজ্ঞ করিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। নতুবা গো মহিষ ও ছাগের রক্তে যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া চিত্তের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। যজ্ঞে পশুর রক্ত মাংস ও চর্ব্বির দুর্গন্ধে চিত্তশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির সাধনায় চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলেই চিত্তস্থ সন্দেহসমূহ দূরীভূত হইবে। কামনার সহিত হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই সন্দেহ-জাল

ছিন্ন ভিন্ন হইবে। পরে কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইবে। কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। তাঁহাকে কেবল মাত্র উপনিষদ্বাক্য দ্বারা জানিতে পারা যায়। বেদের প্রকৃত অর্থ যাঁহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না। জ্ঞান-শাস্ত্র চর্চ্চা না করিলে কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এইরূপে সাতদিন বিচার হইয়াছিল। সেই কঠিন দার্শনিক বিচার অনেকে বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া এবং গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে বলিয়া উহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। সাতদিন বিচারের পর মণ্ডনমিশ্র, ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত শেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া উভয়ভারতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও উভয়ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়া আপনার কিরূপ বোধ হইতেছে? আপনি মধ্যস্থ? সুতরাং ধর্ম্মতঃ বলিবেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক কি না”? উভয়ভারতী বলিলেন, “হে যতিরাজ, আপনি যে সকল শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আপনার স্বকপোলকল্পিত প্রমাণ নহে। উহা শ্রুতি ও প্রধান স্মৃতিশাস্ত্রের কথা। সত্যকথা বলিতে গেলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জ্ঞান-শাস্ত্রের চর্চ্চা ব্যতিরেকে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরে বিলীন হইতে

না পারিলে জন্মমরণচক্রে ঘূর্ণনের অকথ্য ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। বিষয়-কামনা ত্যাগ না করিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। হোম করা যে একেবারে উচিত নয়, একথা আমি বলি না এবং আপনিও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, আপনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব-মত-সংস্থাপনের জন্য দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই শেষাবস্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশের নানা প্রকার অর্থ বুঝিয়া অনেক লোক এই ধর্ম্মের নানা উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইজন্য পাপনদীর প্রবল স্রোত বহুদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈদৃশ দুর্দ্দিনে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-প্রচার এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আমার স্বামী মীমাংসাদর্শনের মতানুযায়ী। মীমাংসা-দর্শনের মতে মন্ত্রই দেবতাস্বরূপ। মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদানকরিলে স্বর্গকামী ব্যক্তি স্বর্গ পায়, পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্র পায়, ধনকামী ব্যক্তি ধন পায়। কিন্তু ধনপুত্রাদি লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর দায় হইতে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় না। এমন কি, অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গেলেও পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতে হয়।

মীমাংসাদর্শন যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচার লইয়াই ব্যস্ত। সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ এবং জগতের স্রষ্টা পালয়িতা এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সুতরাং উহা যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্র বলিয়া আস্তিকশাস্ত্র হইয়াও, কতকটা নাস্তিকশাস্ত্রের ন্যায় মত প্রতিপাদন করে। মীমাংসাদর্শন, মন বুদ্ধি চিত্ত বা শরীর হইতে আত্মা একটি পৃথক পদার্থ, এইরূপ মত স্বীকার করে বলিয়া উহা বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক্ প্রভৃতি নাস্তিক-শাস্ত্র হইতে পৃথক্ হইয়া সনাতন বৈদিকধর্ম্ম অনুযায়ি-শাস্ত্রের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

মীমাংসাদর্শন বলেন, "এই জগতের স্রষ্টা পালয়িতা ও সংহর্ত্তা পরমেশ্বরনামক স্বতন্ত্র এক অদ্বিতীয় দেবতা কেহ নাই। সমস্ত প্রাণীই নিজ নিজ শুভ অশুভ কর্ম্ম-অনুসারে শুভ অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। বেদের রচয়িতা কেহ নাই। ইহা পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয় নাই। বৈদিক শব্দ নিত্য। ইহার রচনাও নিত্য। ইহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। এই জগৎ-প্রবাহের আদি নাই অন্তও নাই। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আবার অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ প্রাণীর কর্ম্ম হইতেই পুনরায় কর্ম্ম জন্মিয়া থাকে। আবার সেই কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। মন্ত্রই দেবতা। এই দেবতারাই যজ্ঞে নিবেদিত বস্তুসকল গ্রহণকরেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে

স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও এই চরাচরস্বরূপ এই জগতে স্ব স্ব কর্ম্মফল উপভোগ করিয়া থাকেন"। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী। পঞ্চমতরঙ্গ। ২৭ পত্র।*

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষার জন্য উহা অত্যন্ত উপযোগী হইলেও উহা মুক্তিপথ-প্রদর্শন করিতে নিতরাং অক্ষম। মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। অতএব হে যতিরাজ, আপনার শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণযুক্ত এই বেদান্তমত যে, অত্যন্ত নির্দ্দোষ, তাহা বলাই বাহুল্য। মানুষের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রম রূপ দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রমে বিবাহ করিয়া বেদপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও পূজাদি এই আশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। পরে

---

* "অথ প্রভুনাদিষ্টো মীমাংসকঃ স্বমতমাহ :—
দেবোনকশ্চিদ্ভুবনস্থকর্ত্তা, ভর্ত্তা ন হর্ত্তাপি চ কশ্চিদাস্তে।
কর্ম্মানুরূপানি শুভাশুভানি, প্রাপ্নোতি সর্ব্বোপিজনঃ ফলানি॥
বেদস্যকর্ত্তা নচ কশ্চিদাস্তে নিত্যাহিশব্দারচনাস্য নিত্যা।
প্রামাণ্যমস্মিন্ স্বতএব সিদ্ধম্, অনাদিসিদ্ধেঃ পরতঃকথংতৎ॥
আদ্যন্তশূন্যেহত্র জগৎপ্রবাহে ক্রিয়াভবেৎকর্ম্মতএব সর্ব্বা।
কর্ম্মাণি পুংসাংভবতিক্রিয়াতো বীজাঙ্কুরন্যায়তয়া ন দোষঃ॥
যাগাদিকার্য্যাহুতিভাগভাজো মন্ত্রাত্মকা দেবগণানিরুক্তাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কার্য্যবশেন ভোগং, কুর্ব্বন্তি সর্ব্বেহপি চরাচরস্থ"॥
বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী। পঞ্চমতরঙ্গ। ২৭ পত্র।

বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে পুত্রের উপরে এই আশ্রমের ধর্ম্মরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্ত্রীর সহিত বনে—তপোবনে প্রস্থান করিতে হয় এবং মুনির ন্যায় তথায় বানপ্রস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। এই বানপ্রস্থ-আশ্রমই মানুষের তৃতীয় আশ্রম। তথায় সস্ত্রীক ফল মূল আহার করিয়া আরণ্যকশাস্ত্র—উপনিষৎশাস্ত্র আলোচনা করিতে হয়; তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়, আচরণ করিতে হয়। এই শাস্ত্রআলোচনা ও সেই শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-প্রতিপালনরূপ উপায় দ্বারা বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইলে ভিক্ষু বা যতির আশ্রমগ্রহণে অধিকার জন্মে। ইহা মানবের চতুর্থ আশ্রম। এই আশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকাররূপ আবরণ তিরোহিত হয়, জীব ও ব্রহ্মের ভেদবোধ তিরোহিত হইতে আরম্ভ করে। উহাদের ঐক্যজ্ঞানের উদয় হইতে আরম্ভ হয় এবং পরে ঐ জ্ঞান সাধনার বলে নিত্যমুক্তস্বরূপ পরমাত্মায় লীন হইতে পারা যায়—নিজের যথার্থস্বরূপে অবস্থিত হইতে পারা যায়। ঐরূপে অবস্থিত হইলেই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। আর সে জন্মগ্রহণ করে না, আর সে মরে না। মানুষ যদি কেবল গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নিত্য হোমই করিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে বানপ্রস্থ ও যতি-আশ্রমের ব্যবস্থা হইল কেন? ভারতবর্ষে গৃহস্থাশ্রমই যদি একমাত্র আশ্রম হইত, তাহা

হইলে শাস্ত্র বানপ্রস্থ ও যতি-আশ্রমের ব্যবস্থা করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ঋষিগণ কেবল মাত্র গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা প্রণয়নকরিলেই পারিতেন। লোকের হিতের জন্য চারি প্রকার আশ্রমের চারিপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সামান্য গৃহস্থের কথা তো দূরের কথা, স্বয়ং সম্রাট্ পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যে গৃহস্থাশ্রমের মায়া ত্যাগ করিয়া সম্রাজ্ঞীর সহিত বনে—তপোবনে মুনির ন্যায় বাসকরিতেন। সম্রাট দিলীপ নিজের পুত্র রঘুর হস্তে ভারতসাম্রাজ্যের ভার সমর্পণকরিয়া সম্রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সহিত বনে গিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনকরিয়া-ছিলেন। বানপ্রস্থধর্ম্ম পালনকরিয়া চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। পরে আশ্রমত্রয়ের কর্ম্ম ত্যাগকরিয়া শিখাযজ্ঞোপবীতাদি ত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। বেদ বলেন, "যাহার প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই বৈরাগ্য জন্মে, সে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমাদি গ্রহণ না করিয়া একে-বারে ত্যাগধর্ম্ম বা যতিধর্ম্ম অবলম্বনকরিতে পারে"। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম গ্রহণকরিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হোমই করিতে হইবে, এরূপ একটা নিয়ম থাকিলেও সকলের পক্ষে উহা চলিতে পারে না, এবং শাস্ত্রেরও ঐরূপ অভিপ্রায় নয়। কারণ, বেদ বলিয়াছেন, "যখনই যে আশ্রমে মানুষের বৈরাগ্য জন্মিবে, তখনই মানুষ ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করিবে"। হে যতিরাজ, জ্ঞানযুক্ত

ভক্তিই ঈশ্বরকে পাইবার প্রধান উপায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব আপনার কথাই সত্য। আপনার একটি কথাও অসার নহে। আপনার কথার যুক্তিমত্তা-দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আপনার সুযুক্তিপূর্ণ বিচার শুনিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ বিচারে আপনারই জয় হইয়াছে"। শ্রীমতী উভয়-ভারতীর মুখপদ্ম হইতে এই শেষ কথাটি নিঃসৃত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পাঠক ও পাঠিকাগণের পাছে ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়, এই বিবেচনায় উভয়ের কঠোর দার্শনিক বিচার এস্থলে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল না। অন্যান্য লোক-দিগের দার্শনিকবিচারসময়ে যেরূপ কোলাহল হয়, সগর্ব্ব বাক্য উচ্চারিত হয় এবং বাগাড়ম্বর ও বিশৃঙ্খলা ঘটে, এই বিচারে সেরূপ ব্যাপার হয় নাই। সাতদিবস এই বিচার হইয়াছিল। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালে বিচার আরব্ধ হইয়া মধ্যাহ্নকালে থামিত। প্রথমদিন বিচার-শেষে সভাভঙ্গ হইলে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বস্থানে সশিষ্য গমনোদ্যত হইলে মণ্ডনমিশ্র স্বগৃহে তাঁহাদিগকে ভোজনকরাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশকরিয়া-ছিলেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ তাঁহার বাটীতে ভোজনকরিতে অনিচ্ছা প্রকাশকরিয়াছিলেন। পরে, উভয়ভারতীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি ভোজন

করিতে স্বীকারকরিয়াছিলেন। তিনি ঈদৃশী বিদুষী সাধ্বী-মহিলার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানকরিতে পারেন নাই। শেষদিনের বিচারে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদবাক্যের প্রকৃতঅর্থ-ব্যাখ্যারূপ কুঠার দ্বারা মণ্ডনমিশ্রের কোমল-কমলতুল্য যুক্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। কদলীবৃক্ষ যেরূপ প্রবল বাত্যা দ্বারা আহত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মণ্ডনের হোমাদিকর্ম্মের সমর্থক অপ্রবল অসার প্রমাণগুলি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপনিষৎ ও বেদান্তের প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা ব্যাহত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মণ্ডন, বিচারে পরাজিত হইয়া পত্নী উভয়ভারতীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। উভয়-ভারতী বলিলেন, "পূজ্যতম স্বামিন্, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যই এ বিচারে জয়ী হইয়াছেন, ইহাই আমার মত"। তখন মণ্ডন বলিলেন, "আমিও ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি এবং আমি পরাজিত হইয়াছি, এ কথা আমি স্বীকার করিতেছি"। এই বলিয়া তিনি ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের চরণকমলোপরি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি এক্ষণে আপনাকে চিনিতে পারিলাম। আপনি অজ্ঞ ও বিষয়ভোগমুগ্ধ নরনারীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমা বুঝাইবার জন্যই ধরাতলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছেন। আপনি মর্ত্ত্যলোকে এ সময়ে

আবির্ভূত না হইলে ঋক্ যজুঃ ও সাম, এই তিন বেদের মস্তকস্বরূপ তিনটি বাক্য, নাস্তিক এবং বৌদ্ধদিগের প্রলাপ-বাক্যরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া এতদিনে লয় প্রাপ্ত হইত। এই তিনটি বাক্য যথা—"আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্র আসীৎ।১। ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্র আসীৎ।২। একমেবাদ্বিতীয়ম্"।৩। আপনি বেদের রক্ষকরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ না হইলে উহারা এতদিনে বেদের চরণ ভগ্ন করিয়া দিত। আমি এতদিন পর্য্যন্ত মোহ ও স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম। অদ্য জাগরিত হইলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার শ্রীচরণকমলের মধুপানে আমার আসক্তি হউক। আপনার শ্রীচরণকমলে ভক্তিই আমার কল্পবৃক্ষ। আপনার শ্রীচরণ-কমলবন্দনাই আমার নন্দনকানন। আপনার গুণ-স্তুতিই আমার মন্দাকিনী। আপনার শ্রীচরণসমীপে বাসই আমার স্বর্গবাস। অতএব আমি, স্ত্রীপুত্রাদি ও গৃহধন-রত্নাদি এবং গৃহস্থাশ্রমোচিত হোমাদিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণকমলের শরণ লইলাম। শরণাগত-ব্যক্তিকে রক্ষা করুন। আমাকে উদ্ধারকরুন। আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করুন"। মণ্ডন এইরূপ যতিধর্ম্ম-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভগবান্ শ্রীশঙ্করা-চার্য্য উভয়ভারতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উভয়-ভারতী বলিলেন, "হে যতিরাজ, আমি আপনার মনোগত

ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে আমার মনে দুঃখ হইতে পারে। কারণ, স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পতি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক হইলে স্ত্রীর অনুমতি লইতে হয়। নতুবা সস্ত্রীক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। আমার স্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি আছে কি না, তাহা অবগত হইবার জন্য আপনি আমারপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আমার স্বামী সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইনাই। কারণ, প্রথমতঃ ইনি আপনার সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায় নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে এক্ষণে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, এই জন্মে আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা আমি শৈশবে এক মহাত্মার নিকটে শুনিয়াছিলাম। একদা বাল্যকালে আমি আমাদের বাটীতে আমার জননীর নিকটে বসিয়াছিলাম। এমন সময়ে জটাশ্মশ্রুধারী, গৌরিকবসনপরিধায়ী, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, দীর্ঘললাট, বিশালনেত্র, এক ব্রহ্মচারী মহাত্মা আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার মাতা তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং তদুপরি বসিতে বলিলেন। এই মহাত্মা আসনে বসিয়া আমারপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকরিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমার মাতা ভবিষ্যতে আমার জীবনে কি

কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঘটনাই আমার জীবনে ঘটিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও অবশ্যই ঘটিবে। তিনি বলিয়াছিলেন; 'এক মহাত্মা যতিপ্রবরের সহিত আমার স্বামীর তুমুল শাস্ত্রীয় বিচার হইবে। সেই বিচারে আমার স্বামী পরাজিত হইবেন এবং সেই পরাজয়ে তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে এবং পরে তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগকরিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনকরিবেন। এবং ভক্তবৎসল সেই যতিরাজ তাঁহাকে যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন'। এই কথা বলিয়াই সেই মহাত্মা আমাদের গৃহ হইতে সহসা চলিয়াগেলেন। আমার মাতা তাঁহাকে ভোজনকরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাকরিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোন কথা না কহিয়া প্রস্থানকরিলেন। তাঁহার সেই কথানুসারে এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে, আমার স্বামী আপনার শিষ্য হইতে বাধ্য। উক্ত মহাপ্রভাব মহাত্মার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক ঠিক সমস্তই ঘটিয়াছে। এ ঘটনাটিও অবশ্যই ঘটিবে"। উভয়ভারতীর এই কথা শেষ হইলে মণ্ডনের নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুবর্ষন হইতে লাগিল। তিনি পুষ্প মাল্য ও চন্দন দ্বারা ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের চরণকমল পূজাকরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভো, আমার শরীর আমার গৃহ

এবং আমার গৃহে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আপনার শ্রীচরণে সমর্পণকরিলাম”। অনন্তর উভয়ভারতী, আচার্য্য প্রভুকে বলিতে লাগিলেন, “হে ভগবন্ যতিরাজ, আপনি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বর। পাপী তাপী ও অজ্ঞজনগণের উদ্ধারার্থ ও পরিত্রাণার্থ এইযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার স্বামী অদ্য পরিত্রাণলাভের আশা-আলোক প্রাপ্ত হইলেন এবং আমিও প্রাপ্ত হইলাম। আপনি আমার স্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। এবং আমিও এই কোলাহলপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জন শান্তিপূর্ণ তপোবনে পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছাকরিতেছি”। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিলেন, “হে দেবি, আপনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ সরস্বতী। জড়সদৃশ অজ্ঞগণের হিতার্থে এই যুগে মানবীরূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি লোকালয়ে না থাকিলে কিরূপে লোকহিতসাধন হইবে? সকলেই যদি লোকালয় ত্যাগকরিয়া নির্জ্জন তপোবনে গমন করে, তাহা হইলে অজ্ঞ পাপী তাপীদিগকে পারলৌকিকশাস্ত্র-জ্ঞান বিতরণকরিয়া কে উদ্ধার করিবে? এখনও আপনার লোকহিতসাধনরূপ কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে। এখনও উহার শেষ হয় নাই। আমি বহুস্থানে বহু মঠ নির্ম্মাণকরাইয়াছি। তন্মধ্যে চারিটি মঠই প্রধান। দক্ষিণদেশে শৃঙ্গেরীনামক স্থানে, দ্বারকায়,

পুরীধামে এবং বদরিকাশ্রমে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছি। শৃঙ্গেরী-মঠই সর্ব্বপ্রধান। আমার ইচ্ছা আপনি ঐ শৃঙ্গেরী-মঠে বেদান্ত ও উপনিষদাদি শাস্ত্রের সূক্ষ্মতাৎপর্য্যবিশিষ্ট অমূল্য উপদেশসকল মুমুক্ষু জনগণের নিকটে প্রচারকরিয়া ও তথায় সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজমানা হউন। অদ্য হইতে আপনার নামানুসারে শৃঙ্গেরীমঠ "সারদাপীঠ," এই নামে অভিহিত হউক। আপনি ভারতী, সরসবাণী, সারদা। অতএব আপনার নামানুসারেই শৃঙ্গেরীমঠকে অদ্য আমি "সারদাপীঠ," এই আখ্যা প্রদানকরিলাম"। উভয়ভারতী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে যতিরাজ, আপনার যদি এইরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তথায় যাইতে স্বীকৃতা হইলাম"। অনন্তর মণ্ডনমিশ্র, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়নামক তিনটি অগ্নি এবং সাংসারিকবাসনা বিসর্জ্জনদিলেন। আচার্য্যপূজ্যপাদ, অধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকনামক ত্রিতাপের বিনাশক "তত্ত্বমসি" এই বৈদিক মন্ত্র মণ্ডনমিশ্রের কর্ণে প্রদান করিয়া ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, অগ্নিহইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তুমি সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ।

অতএব তুমি তাঁহারই অংশ। তাঁহাহইতে অভিন্ন। তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত যুক্ত হইয়া জীবনামে অভিহিত হইয়াছ এবং নিজকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনেকর। সেই ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিজকে অজ্ঞানবশতঃ পৃথক্ বলিয়া মনে কর। ভূমা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, শূদ্র নয়, দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, স্থূল নয়, কৃশ নয়, গৌর নয় এবং কৃষ্ণ নয়। পরমাত্মা স্বচ্ছদর্পণস্বরূপ। নিত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। তখন তিনিই তুমি এবং তুমিই তিনি। তখন তাঁহাতে ও তোমাতে কোন ভেদ থাকিবে না। কণ্ঠে হার বিদ্যমান থাকিতেও যেমন কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ আমার হার কোথায় গেল? আমার হার কে চুরি করিল? আমার হার কে লইল? এই বলিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং ঐ হার না পাইয়া কষ্ট অনুভব করে, পরে কোন হিতৈষী ব্যক্তি ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তির গলেই তাহার সেই হার দেখাইয়া দিলে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তি, "আঃ আমার হার পাইলাম," এই বলিয়া সুখ অনুভব করে, তদ্রূপ জীব, বিষয়বাসনামুগ্ধ ভ্রান্ত ও আত্মহারা হইয়া নিজের পরমাত্ম-স্বরূপতা বিস্মৃত হইয়া বৃথা কষ্ট অনুভব করিলে কোন বেদান্তবিৎ আচার্য্য পরহিতৈষী মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া নিজের যথার্থরূপতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দসাগরের ও "প্রজ্ঞা-"

সাগরের সমান হইয়া যায়"। মণ্ডনমিশ্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট হইতে এই বৈদিক মহামন্ত্রের সারার্থ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে যতিরাজ, আপনার অমূল্য অমৃতময় উপদেশ-শ্রবণে আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদিত হইল ও আমার অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অপসৃত হইল। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। তপস্যা সফল হইল"। মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকরিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য এই নাম গ্রহণ করিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমের মণ্ডনমিশ্র এই নাম পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি নর্ম্মদানদীতীরে একটি শান্তিপূর্ণ আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তথায় উপনিষৎ ও বেদান্তাদিশাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী উভয়ভারতী দেবীও আচার্য্যপূজ্যপাদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুসারে বেদান্ত ও উপনিষদাদি জ্ঞানশাস্ত্রের প্রচার দ্বারা জগতের কল্যাণ-সাধনার্থ দাক্ষিণদেশে শৃঙ্গেরীমঠে গমন করিলেন। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বেদান্তমত-প্রচারার্থ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন। তিনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে অদ্বৈতমত প্রচারকরিয়া সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ে এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীশৈলনামক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

লীলাবতী।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যমহিলারা যে, কেবলমাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনকরিতেন তাহা নহে, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য কঠিন জ্যোতিষশাস্ত্রেও গ্রন্থরচনা পর্য্যন্ত মহাকঠিন ব্যাপার সম্পাদনকরিতে পারিতেন। ভারতে ইতিহাসসংরক্ষণবিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদিগের অবহেলা-বাহুল্য বশতঃ ঐ সকল বিদুষী মহিলার ইতিবৃত্ত পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। লীলাবতী সংস্কৃতপদ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র রচনাকরিয়া সভ্যজগতের শিক্ষাভিমানী পুরুষসম্প্রদায়কে বিস্ময়সাগরে নিমগ্নকরিয়া গিয়াছেন। ন্যায় সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক, এই ছয়টি দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র পরস্পরের সহিত পরস্পরের মতভেদ নিবন্ধন বিবাদ-বিসম্বাদে পরিপূর্ণ। বেদান্ত সাংখ্যেরমত খণ্ডন করে, ন্যায় বেদান্তের মত খণ্ডন করে, এইরূপে অন্যান্য সকল শাস্ত্রই পরস্পরের মত খণ্ডনকরিয়া স্ব স্ব মতের প্রাধান্য সংস্থাপনকরিয়াথাকে। "নানা মুনির নানা মত"। যাঁহার বোধশক্তি বিচারশক্তি রচনাশক্তি যত উচ্চ সীমা লাভকরিয়াছে, তিনি তাহাই ব্যক্ত করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কোন্ মতটি যে, প্রকৃত এবং নির্দ্দোষ, তাহা সিদ্ধান্তকরা স্বল্পায়ুঃ স্বল্পবুদ্ধি আধুনিক জনগণের শক্তির অতীত। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রের

মধ্যে বেদান্তমত যে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নির্দ্দোষ ও মহা-সন্তোষজনক, তাদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা ঈশ্বরনিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন উপনিষৎশাস্ত্ররূপ মহাদৃঢ় ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহারা ঈদৃশ পবিত্র বেদান্ত-মত খণ্ডনকরিতে পারে, তাহারা স্বর্গের নন্দনকাননের কল্পবৃক্ষের শাখা ছেদনকরিতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া কেবল মাত্র বৃথা বাদ প্রতিবাদ করিলে চলিবে না। কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্র বিচারকরিয়া প্রাত্যক্ষ নির্দ্দোষ ফল প্রদর্শনকরিতে হয়। যিনি গণনা করিয়া প্রত্যক্ষ নির্দ্দোষ ফল দেখাইতে পারিবেন তাঁহার কথাই সকলে মানিবে। সেই গণনা ঠিক হইল কি না, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মানুষ তাহার সাক্ষী হইতে পারে না। যিনি অতিসূক্ষ্ম কঠিন স্ফুটগণনা করিয়া চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণের ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাঁহার কথাই আপামর সাধারণ শিরোধার্য্য করিবে। সুতরাং জ্যেতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্যসংস্থাপনবিষয়ে স্বয়ং চন্দ্র ও ও সূর্য্য সাক্ষ্য প্রদানকরিয়া থাকেন। অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে বা ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বর্ত্তমান কালে গণনাকরিয়া ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে হইবে। বৃথা তর্ক বা বিবাদ করিলে চলিবে না। দ্রষ্টা বিবাদ শুনিবে না। সত্য সত্য ফল দেখিয়া লইবে। সত্য ফল দেখাইতে হইলে সূক্ষ্ম কঠিন গণনা জানা চাই। এই সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে লীলাবতীনাম্নী ভারতীয় আর্য্যমহিলা সংস্কৃত-পদ্য রচনাকরিতে পারিতেন। জ্যোতিষে পদ্যরচনা যে, কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর সমগ্র জাতিই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্ররচনাবিষয়ে অন্যদেশে যাহা অত্যন্ত অসম্ভব, ভারতে তাহা সম্ভব। ভারতে অভিধানশাস্ত্র-পর্য্যন্ত পদ্যে রচিত। ভারত-মহিলার জ্যোতিষে সংস্কৃত-পদ্যরচনা এক অদ্ভুত ব্যাপার। ১০৩৬ শকাব্দে সহ্য-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বিজ্জলবিড় নামক গ্রামে ভাস্করাচার্য্য-নামক এক ভাস্করতুল্য মহাপ্রভাব পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই শাস্ত্রে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীমতী লীলাবতী দেবী। প্রাচীনকালের এই একটি সুন্দর রীতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পতি বিদ্বান হইলেই পত্নীও বিদুষী হইতেন। লীলাবতী দেবী জ্যোতিষে অদ্ভুত পণ্ডিতা ছিলেন। ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে যখন প্রগাঢ়প্রেম-ব্যঞ্জক শব্দে সম্বোধনপূর্ব্বক জ্যোতিষ-শাস্ত্রে কোন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরিতেন, তখন লীলাবতী পদ্যে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তখন ভাস্করাচার্য্যের হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব্ব অগাধ আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। পত্নীরপ্রতি এই প্রগাঢ় প্রেমের স্মৃতিচিহ্নকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভাস্করাচার্য্য তাঁহার একটি গ্রন্থকে

পত্নীর পবিত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম লীলাবতী। মহারাষ্ট্রদেশে নাসিকের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে ভাউদাজী বৈদ্যরাজনামক একটি পণ্ডিত একটি তাম্রফলক পাইয়াছিলেন। তাহাতে কয়েকটি শ্লোক লিখিত আছে। সেই শ্লোকগুলির অর্থ এই যে, "শাণ্ডিল্যগোত্রে ত্রিবিক্রমনামক এক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানাশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া "কবি-চক্রবর্ত্তী" এই উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন। ঈঁহার পুত্রের নাম ভাস্করভট্ট। গুণগ্রাহী ভোজরাজ ভাস্কর-ভট্টের অসাধারণপণ্ডিত্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "বিদ্যাপতি" এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভাস্কর-ভট্টের পুত্রের নাম গোবিন্দপণ্ডিত। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া "সর্ব্বজ্ঞ" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসর্ব্বজ্ঞের পুত্রের নাম প্রভাকর। ইনি ও অত্যন্ত প্রভাবশালী পণ্ডিত ছিলেন। প্রভাকরপণ্ডিতের পুত্রের নাম মনোরথ পণ্ডিত। ইনি সজ্জনগণের পূর্ণমনোরথস্বরূপ ছিলেন। মনোরথ পণ্ডিতের পুত্রের নাম মহেশ্বরাচার্য্য। মহেশ্বরাচার্য্যের পুত্রের নাম ভাস্করাচার্য্য। ইঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ অদ্যাপি কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন বলিয়া "কবীশ্বর" এই উপাধি লাভ করিয়াঝিলেন। ভাস্করাচার্য্যকবীশ্বরের শিষ্যগণের

সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে এ জগতে কোন ব্যক্তি জয়ী হইতে পারে নাই। তাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী। তাঁহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর আচার্য্য। লক্ষ্মীধর আচার্য্যের পুত্র চঙ্গদেব আচার্য্য। অনেকেই অজ্ঞাতবশতঃ লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া মনে করেন। এমনকি, কেহ কেহ স্ব স্ব রচিত পুস্তকেও এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লীলাবতী গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ না করাই এই ভ্রান্তির কারণ। সম্পূর্ণরূপে লীলাবতী গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিত না।

লীলাবতী যে, ভাস্করাচার্য্যের পত্নী, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে :—লীলাবতীগ্রন্থে "সখে নবানাঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে ভাস্করাচার্য্য পত্নী লীলাবতীকে "সখে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় লোক কন্যাকে সখে বলিয়া সম্বোধন করে না।

লীলাবতীগ্রন্থে "বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে" ইত্যাদি শ্লোকে ভাস্করাচার্য্য পত্নীকে "হে বালে, হে বালকুরঙ্গ-লোলনয়নে, লীলাবতি," এইরূপ সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পত্নীকে এইরূপে সম্বোধন করিতে পারা যায়। কন্যাকে কেহ "হে মৃগনয়নে, হে মত্ত-চকোরাক্ষি", ইত্যাদিরূপে সম্বোধন করে না। কেহ

কেহ বলেন, এই শ্লোকে এই সম্বোধনে "বালা" শব্দের অর্থ বালিকা।' সুতরাং ভাস্করাচার্য্য স্বীয় কন্যা লীলাবতীকে হে বালে, হে বালিকে এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এইরূপ ধারণা যে, ভ্রমসঙ্কুল, ইহা নিঃশঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কারণ, সংস্কৃতসাহিত্যে বালা শব্দের অর্থ কেবল মাত্র যে, ক্ষুদ্র বালিকা, তাহা নহে, কিন্তু কোমলাঙ্গী নবযৌবনা তরুণী বা যুবতীও বালা শব্দের অর্থ। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ষষ্ঠসর্গে বর্ণিত ইন্দুমতী-স্বয়ম্বরসভায় নৃপতিগণ যখন স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে ভোজরাজের অন্তঃপুর-রক্ষিকা, রাজগণের বংশচরিত্রাভিজ্ঞা, ইতিহাসপণ্ডিতা, মহাবিদুষী সুনন্দা, ইন্দুমতীকে কলিঙ্গরাজসমীপে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গরাজের বংশ ও চরিত্রের পরিচয় দিবার সময় ইন্দুমতীকে বালশব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। সেস্থলে বালাশব্দের অর্থ ক্ষুদ্র বালিকাও নহে কন্যাও নহে। কারণ, তৎকালে বালিকার বরের জন্য স্বয়ম্বরসভার অধিবেশন হইত না। তৎকালে ক্ষত্রিয়রাজকন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেই স্বয়ম্বরসভায় নিজের ইচ্ছামত বর বাছিয়া লইতেন। যদি কেহ বলেন যে, ইন্দুমতী বালা, অর্থাৎ বালিকাই ছিলেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, ঐ সর্গের অন্য একটি শ্লোকে সুনন্দা ইন্দুমতীকে বলিতেছেন, "হে সুন্দরি তুমি তোমার যৌবনশ্রী ভোগ কর"। এইরূপ

বহু সংস্কৃতশ্লোকে নবযৌবনা বা যুবতী অর্থে বালা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—"হে কমলনয়নে, হে দীর্ঘনয়নে বালে, আমার প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত কর। অর্থাৎ পতি, ক্রুদ্ধা যুবতী পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়তমে, আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত কর"। এই শ্লোকে বালা শব্দের অর্থ যুবতী স্ত্রী। সংস্কৃতসাহিত্যে যুবতী অর্থে বালা শব্দের প্রয়োগ ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং "বালে" "বালমৃগনয়নে" এইরূপ পদ দেখিয়া লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া স্থির করা কখনই সঙ্গত নয়। ভ্রান্তসংস্কার বশতঃ যিনি যাহাই বলুনা কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাতে সত্যের মর্য্যাদার অণুমাত্র ক্ষতি হইবে না। কারণ, লীলাবতীগ্রন্থের "অলিকুলদল" ইত্যাদি শ্লোকে ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে হে "কান্তে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "হে কান্তে, তাহা হইলে সমস্ত ভ্রমরের সংখ্যা কত হইল বল"? ইহাই হইল এই শ্লোকের নিষ্কৃষ্টার্থ। যাঁহারা লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া মনে করেন, এই শ্লোকদ্বারা তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হউক। এ জগতে কোন দেশে কোন জাতি কন্যাকে "কান্তে" বলিয়া সম্বোধন করে না। কান্তা শব্দের অর্থ পত্নী। যাঁহারা লীলাবতীগ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে পাঠ করেন নাই কিম্বা মোটেই পাঠ করেন

নাই, তাঁহারাই লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া মনে করেন এবং স্ব স্ব পুস্তকেও ঐ কথা লিপিবদ্ধ করিতে অবাধে অন্যায়রূপে সাহাসী হয়েন। অধুনা এইরূপ ভ্রমোৎপাদক পুস্তকের লেখকগণ যশস্বী হইবার উচ্চআশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূলে অনবরত কুঠারাঘাত করিতেছেন এবং সাহিত্যপুষ্টির ব্যাপদেশে সাহিত্যের মহাঅনিষ্ট সাধনকরিতেছেন। লীলাবতী-গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই ভাস্করাচার্য্য, প্রিয়তমা পত্নী লীলাবতীকে আন্তরিক প্রেমব্যঞ্জক নানাবিধ সুললিত পদে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন এবং লীলাবতীদেবী ও, পদ্যে উহার উত্তর দিয়াছেন। লীলাবতী বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগিনী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা অতি প্রখরা ছিল। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকিলে জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি জন্মে না। তিনি বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা ও সুশীলা স্ত্রী ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিবাহের পর তাঁহার স্বামী তাঁহাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি পিত্রালয়ে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়নকরিয়াছিলেন। তিনি পতির অত্যন্ত অনুগতা ছিলেন। সাধ্বী স্ত্রীর সমস্ত লক্ষণই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে পতির মনো-রঞ্জন করিতেন। কঠিন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনাই

তাঁহাদের দুইজনের জীবনের একমাত্র ব্রত ও লক্ষ্য ছিল।

ভাস্করাচার্য্য যখন জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন একটি কঠিন গণনা করিতে বসিতেন, কিম্বা সেই গণনা করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে যখন শাস্ত্রচিন্তায় মগ্ন হইতেন, সেই সময়ে লীলাবতী দেবী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অসাধারণ বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দ্বারা স্বামীর গণনায় সাহায্য করিতেন। লীলাবতীর বুদ্ধির প্রখরতা-দর্শনে ভাস্করাচার্য্য আনন্দে পুলকিত হইতেন। আবার লীলাবতী যখন কোন একটি কঠিন গণনায় নিবিষ্টচিত্তা হইতেন, তখন ভাস্করাচার্য্য পত্নীর তাদৃশ মনোনিবেশ দেখিয়া অন্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া বসিতেন এবং তাঁহার গণনাকার্য্যে সাহায্য করিতেন। স্বামী ও স্ত্রী একত্র বসিয়া এইরূপে শাস্ত্র আলোচনা করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। স্ত্রী যদি সংসারিক কার্য্য শেষ করিয়া অবশিষ্ট সময় এইরূপে পতির সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে সংসার স্বর্গধাম হইয়া উঠে। আর যাঁহারা আলস্যে পরনিন্দায় ও পরচর্চ্চায় অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই দম্পতীকলহে ও মহাঅশান্তিতে দুঃখভোগ করেন। প্রাচীন ভারতে স্বামী স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করিতেন বলিয়া মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াও স্বর্গ-

সুখ অনুভব করিতেন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পতি ও পত্নীর এইরূপ একত্র শাস্ত্রচর্চ্চার কথা পাঠ করিলে কোন্ সহৃদয় জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে অসীম আনন্দ উৎপন্ন না হয়? অজ্ঞ অভিমানী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কপট ভীরু পামরের আনন্দবোধ হয় না। কারণ, সে ব্যক্তি এই মনে করে যে, তাহার স্ত্রী যদি তাহা অপেক্ষা বেশি শিক্ষিতা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার অপমান হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে না যে, প্রকৃতরূপে সুশিক্ষিতা নারী, পতি মূর্খ বা দরিদ্র বা কুরূপ হইলেও পতিকে কদাপি অপমান বা অবজ্ঞাকরিতে পারে না। সুশিক্ষার এমনই গুণ। সে কালে পতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, পত্নী মৈত্রেয়ীকে দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। পতি মহামুনি অগস্ত্য, পত্নী লোপামুদ্রাকে পতিব্রতাধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। পতি মহর্ষিবশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীকে অধ্যাত্মিক তত্ত্বশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। অরুন্ধতীদেবী রন্ধন-শাস্ত্রে এবং রন্ধনকার্য্যেও বিলক্ষণ দক্ষা ছিলেন। পতিমহর্ষি কশ্যপ যেরূপ বিদ্বান ছিলেন, তাঁহার পত্নী অদিতিও তদ্রূপ বিদুষী ছিলেন। পিতা মহর্ষি বচক্নু পুত্রী গার্গীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এমন কি, দেবতাদিগের মধ্যেও স্বামী, স্ত্রীকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেবও পার্ব্বতীকে শিক্ষা দিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পার্ব্বতী কোন একটা সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে মহাদেবকে প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং মহাদেব তাঁহাকে সেই বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাসকরিতেছেন। পার্ব্বতী, মহাদেবের নিকটে এইরূপে সুশিক্ষা পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছেন। দেবতারাও সুশিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বকালে ভারতের নরনারী সুশিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, আর একালের পতি পিতা ও ভ্রাতৃগণ, পত্নী কন্যা ও ভগিনীদিগকে "থিয়েটারী টপ্পা", "খেঁউড়্," কুরুচিকর নাটক, "নভেল্" এবং ঐতিহাসিক-কথাবিহীন "বাজেগল্প" পুস্তক পড়াইবার জন্য অধীর হইয়া পড়েন। ইহাতে হিন্দুসমাজের যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। ইহা বড়ই ঘৃণা ও লজ্জার কথা। যে শিক্ষা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সুসাধিত হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। যাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম, স্ত্রীলোক জ্ঞানবিজ্ঞানশাস্ত্র বুঝিতে পারে না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মহিলাদিগের বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কোন বিষয়েই ন্যূন নহে। স্ত্রীলোক রাজনীতিশাস্ত্রে এবং যুদ্ধবিদ্যাতেও যে, নিপুণতা লাভ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্যদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা স্ত্রীলোককে উত্তমরূপে সুশিক্ষা দিতে জানেন না ও

পারেন না, এবং স্ববশে রাখিতে জানেন না ও পারেন না, এবং স্ত্রীলোককে অবাধ উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা প্রদান করেন, বিলাসের চরমমাত্রা শিক্ষা দেন, ধর্ম্মশিক্ষায় বিবর্জ্জিত করেন, ভারতের প্রাচীন সুনীতি ও সুরীতি শিক্ষা দেন না, নারীদিগকে আলস্যের মানবীমূর্ত্তিরূপে পরিণত করেন, যাঁহারা মনে করেন, স্ত্রীলোক কেবল মাত্র পুরুষের ঐহিক সুখভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য, গণ্ডা গণ্ডা পুত্র কন্যা উৎপাদনের জন্য, রাঁধিবার জন্য, বাসন মাজিবার জন্য, তাস খেলিবার জন্য, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য এবং কলহিনী বা "পাড়া কুঁদুলী" হইবার জন্যই জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন। অন্য দেশের স্ত্রীশিক্ষার সহিত ভারতের স্ত্রীশিক্ষার তুলনাই হইতে পারে না। ভারতে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতে হইলে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতানুসারে স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ অধ্যয়ন কবাইতে হয়, পরে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হয়। স্ত্রী-জীবনে কি কি কর্ত্তব্য, তাহা যে সকল গ্রন্থে বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে হয়। কেবলমাত্র অর্থকরীবিদ্যা শিখাইলেই ভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পুরুষ অর্থকরীবিদ্যা শিখিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে, অর্থসঞ্চয় করিবে এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে ঐ অর্থ ব্যয় করিবে। পক্ষান্তরে, স্ত্রীজাতি গৃহস্থাশ্রমোচিত

কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে এবং অবসর পাইলেই পুত্র-কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। যে সকল স্ত্রীলোকের কোন প্রতিপালক বা অভিভাবক নাই, যাঁহাদের অবস্থা মন্দ, যাঁহারা পতিপুত্রবিহীন, তাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে ধর্ম্মপথে থাকিয়া অন্যবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া শিল্পকর্ম্ম দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহকরিতে পারেন, তাঁহাদের গৃহের বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। যাঁহারা সৌভাগ্যবতী নারী, যাঁহাদের যথেষ্ট দাসদাসী আছে, যাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা খুব ভাল, তাঁহারা তাম্বুল-চর্ব্বণে, সমস্তদিন শয়নে, নিষ্কর্ম্ম উপবেশনে, অলঙ্কারের সমালোচনায়, পরগ্লানি, পরচর্চ্চায় ও আলস্যে অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া, যে ভাষা অধ্যয়ন করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হয় না কিন্তু যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, তাদৃশ পবিত্র দেবভাষা "মৃতভাষা" সংস্কৃতভাষাটি যদি তাঁহারা আলোচনা করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত-ভাষার "মৃতভাষা" এই নাম ও অপবাদটি ঘুচিয়া যায়। সংস্কৃতভাষা পুনরুজ্জীবিতা হইয়া উঠে। ভারতীয় ভদ্রমহিলাকে বাহিরে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভারতের ভদ্রমহিলা জন্মগ্রহণ করেন না। সুতরাং পুরুষকে গৃহস্থাশ্রমের আধুনিক নানাবিধ ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে হইবে। কিন্তু

স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্যা ছাড়া অন্য অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য পুরুষ উকীল হইতে পারে, হাকিম হইতে পারে, ডাক্তার হইতে পারে, কণ্ট্রাক্টর হইতে পারে, মহাজন হইতে পারে, জমিদার হইতে পারে, সওদাগর হইতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারে, অফিসের কেরাণী, বিদ্যালয়ের মাষ্টার এবং পণ্ডিত প্রভৃতি হইতে পারে, কিন্তু ভারতের গৃহদেবতা লজ্জাশীলা কুলমহিলা গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহকৃত্যে মনো-যোগিনী হইয়া যদি মৃতপ্রায় সংস্কৃত ভাষাটি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে এই দেবভাষা সুরক্ষিত হইতে পারে। এই "মৃতভাষা"কে পুনরুজ্জীবিতা করিবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংস্কৃত শিক্ষাকরা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা, অর্থোপার্জ্জনের উপায় নহে, বিদ্যা-শিক্ষা ধর্ম্মজীবন-সংগঠনের একমাত্র উপায়। বিদ্যাশিক্ষাই যদি অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে শিবাজীরাও, একছত্রপতি মহাপ্রবল মহারাজ হইতে পারিতেন না। তিনি নিজের নামটী পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপী সম্রাট আরংজীবের নিকট হইতেও "চৌথ্" আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শান্তি ও বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বিদ্যাশিক্ষা স্বামী ও স্ত্রীর এক-মাত্র অবলম্বনস্বরূপ হওয়াই উচিত। যাহা অর্থোপার্জ্জনের

ভাষা নয়, সেই সংস্কৃতভাষাকে রক্ষাকরাই তাঁহাদের উচিত। যাঁহাদের স্নান-ভোজন, কবরীবন্ধন, অঙ্গসৌষ্টব-সম্পাদন, সদাশয়ন ও সদানিদ্রা ছাড়া অন্য কোন কার্য্যই নাই, তাঁহারা যদি ঐসকল কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত না করিয়া অন্ততঃ সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার জন্য—তাহা-দিগকে ধার্ম্মিক ও নীতিমান করিবার জন্য তাঁহারা যদি সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র আলোচনা করেন, তাহা হইলে ভারতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। পুরুষকে কেবলমাত্র সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিলেই চলিবে না। কারণ, সংস্কৃতবিদ্যা অর্থকরী নহে। অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে বর্ত্তমানযুগে পুরুষের সাংসারিক অভাব ঘুচিবে না। অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে হইলেই তাহাতে সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অর্থকরীবিদ্যার উন্নতি জন্য বিশেষ মনোযোগ দিলেই সংস্কৃতশিক্ষার অবনতি ঘটিবেই। সেই জন্য সংস্কৃতবিদ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অন্য দেশীয় লোক ইহাকে "মৃতভাষা" এই নাম দিয়াছে। কোন কোন সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক বলেন, ইহা এখনও মরে নাই, তবে মুমূর্ষু বটে। গৃহমধ্যস্থা ভারতমহিলার চেষ্টারূপ মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ করিলে ইহা বাঁচিতে পারে। ভাস্করাচার্য্যের মত বিদ্বান ও কর্ত্তব্যজ্ঞানবান অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পতি অধুনা প্রস্তুত না হইলেও, এবং লীলাবতীর ন্যায় জ্যোতিষ-

শাস্ত্রে মহাবিদুষী মহিলা এ যুগে না হইতে পারিলেও আপাততঃ তত ক্ষতি নাই, কিন্তু বর্ত্তমানযুগে—বিলাসের-যুগে—ধর্ম্ম-নীতির শিথিলতার যুগে স্ত্রীজাতি যদি অন্ততঃ সংস্কৃত-রামায়ণ ও মহাভারতাদি ভারতীয় পবিত্র গ্রন্থগুলি না পড়েন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা না করেন এবং অপত্যগণকে ধার্ম্মিক এবং নীতিমান না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতের প্রাচীনতম মহাগৌরবের মহাক্ষতি হইবে।

বৈজয়ন্তীদেবী।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া গ্রামে শৌনকগোত্রে কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমনামক এক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি মহাকবি কালিদাসের শ্লোকের ন্যায় সরল মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার আনন্দ-লতিকানামক কাব্য কোটালীপাড়ার শৌনকবংশের খ্যাতি ও গৌরব বৃদ্ধিকরিয়াছে। ১৫৭৪ শকাব্দে এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের পত্নীর নাম শ্রীমতী বৈজয়ন্তী দেবী। বৈজয়ন্তী দেবী অসাধারণ পণ্ডিতা ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া বিদুষী ছিলেন।

তাঁহার পতির ন্যায় তাঁহারও অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। তাঁহার পতির আনন্দলতিকানামক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ তিনিই রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, কৃষ্ণনাথ সর্ব্বভৌম স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দলতিকা রচনাকরিয়াছিলেন। স্ত্রীর কবিতাগুলি অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে এবং ওজঃ প্রাসাদ ও মাধুর্য্যগুণে সমলঙ্কৃত এবং গভীরঅর্থযুক্ত। স্ত্রীলোক যে, এরূপ উত্তম সংস্কৃতকবিতা লিখিতে পারে, তাহা আধুনিক নরনারীগণ শ্রবণ করিয়া ইহাকে অদ্ভুত উপন্যাসবার্ত্তা মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পূর্ব্বকালে এইরূপ সরস্বতীরূপিণী মহিলা গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের ইতিহাস-অভাবে ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকের হৃদয়ে নানাবিধ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। দগ্ধভাগ্য ভারতে জীবনচরিত লেখার রীতি বিলুপ্ত হওয়াতেই এবং আলস্য ঔদাস্য ও শৈথিল্যের মাত্রাটা অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতেই ভূতপূর্ব্ব সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতভূমির ইতিহাস-ক্ষেত্রটি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে পদ্মানদীতীরস্থ ধামুকাগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রে ময়ূরভট্টবংশে বৈজয়ন্তী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নানা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু দেশীয় ও বিদেশীয়

ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র দিয়া স্বগৃহে অধ্যয়ন করাইতেন। তিনি যখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, তখন বৈজয়ন্তী প্রতিদিনই তাঁহার অধ্যাপনা শুনিবার জন্য আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া বসিতেন এবং বিশেষরূপে মনোযোগ দিয়া তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর মাত্র। ঈদৃশ অল্প বয়সে বৈজয়ন্তীর অসাধারণ মেধা বা স্মৃতিশক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার পিতা যখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, তখন বৈজয়ন্তী যাহা যাহা শুনিতেন, পরদিন সে সমস্ত কথা অবিকল বলিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার ঈদৃশ শিক্ষানু-রাগ ও এইরূপ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রথম তদ্দেশীয় প্রথানুসারে কলাপ ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। তিনি চারি বৎসরের মধ্যেই ঐ ব্যাকরণ, অমরকোষনামক অভিধান, গণ, ভট্টিকাব্য কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্যের পাঠ শেষ করেন। তিনি কাব্যপাঠ মাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া পিতার নিকটে সর্ব্বশাস্ত্রের বোধক ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র এমনই কঠিন জিনিষ যে, শাস্ত্রে বলে একক্ষণ ন্যায়চিন্তা বাদ দিলে লোক তার্কিক হইতে পারে না। সর্ব্বদা চিন্তা না করিলে ন্যায়-বিদ্যাদেবী সুপ্রসন্না হয়েন না। বৈজয়ন্তী বিবাহের পর পিতৃগৃহে অবস্থানকালে গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যাপৃতা থাকিয়াও

সর্ব্বক্ষণ ন্যায়বিদ্যাদেবীকে হৃদয়ে আরাধনা করিতেন। তাঁহার ঈদৃশী কঠোর অধ্যয়নরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ন্যায়বিদ্যাদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধনে মানে জ্ঞানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত এক যোগ্য পাত্রেই অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বৈজয়ন্তী বিদ্যাবিনয়বতী হইলেও রূপবতী ছিলেন না বলিয়া এবং স্বামীর বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা তাঁহার পিতার বংশমর্য্যাদার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ছিল বলিয়া রূপাভিলাষী ও আভিজাত্যাভিমানী পতির মনের মত স্ত্রী হইতে পারেন নাই। সেই জন্য বিবাহের পর তাঁহার পতি তাঁহাকে কোটালীপাড়ায় স্বগৃহে একবার মাত্র লইয়া গিয়া পরে তাঁহার পিত্রালয়ে ধানুকা-গ্রামে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান নাই। বৈজয়ন্তী পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যৌবনের কিছুকাল পতিবিরহজনিত কষ্টে অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু এইরূপ মনের অশান্তির সময়ে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পিতার নিকটে কঠোর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

এইরূপ কয়েক বৎসরের পর একদা তিনি পতিবিরহে কাতরা হইয়া পতির মনস্তুষ্টির জন্য অনুষ্টুপ্‌ছন্দে একটি

সংস্কৃতশ্লোক* রচনা করিয়া পতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্লোকটি পাঠ করিলেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্লোকটির অর্থ এই যে, হে স্বামিন্, আমার কষ্টের কথা আর কি জানাইব? সামান্য মশারির অভাবে দুর্জয় মশকগণ রাত্রে আমাকে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে দংশন করিয়া থাকে। তাহারা প্রচুর ধূম ও ব্যজনবায়ুর দ্বারা নিবারিত হয় না। তাহারা সায়ংকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি আমাকে অতিশয় কষ্ট দিয়া থাকে। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, আমি আপনার বিরহে বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিয়াছি। শয্যা উপধান (বালিশ) ও মশারি প্রভৃতি শয়নের উপকরণ বস্তুসকল ত্যাগ করিয়াছি। আপনার সেবায় সমর্পিত এই মদীয় শরীর, দুর্ব্বিনীত দুর্দ্দম্য ক্ষুদ্র নীচাশয় নররক্ত-পিপাসু মশকগণ কর্ত্তৃক রাত্রে অন্যায়রূপে আক্রান্ত হইতেছে। তাহারা কোনরূপ শাসন মানিতেছে না। অন্যের অধিকৃত বস্তুকে অন্যায়রূপে অধিকার করিয়া তাহারা চোর তস্করের ন্যায় আচরণ করিতেছে। আমার শরীর আপনার বস্তু। ইহাতে অন্যের কোনমাত্র অধিকার থাকা উচিত নয়। ইহা অন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে আপনারই অপমান কলঙ্ক ও নিন্দা। আপনি আপনার

জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে॥

এই অপমানও কলঙ্ক দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। নতুবা আপনার এ কলঙ্ক ঘুচিবে না। আপনার অপমান ও কলঙ্ক কি আপনার অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না? মানীর মানের নাশ সহ্যকরা উচিত নয়। অন্যের বস্তু আক্রমণ-কারী তস্করবৃত্তি মশকের উপদ্রব হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে গ্রহণ করিলেই আমি বৈরাগ্য-ভাব ত্যাগ করিব। রাত্রে মশারি ব্যবহার করিব। তাহা হইলেই মশকগণ আর আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, ইহাই হইল এই শ্লোকের ভাবার্থ। এই শ্লোকে "হায়" "মশকায়," "কায়ঃ" "সায়" "ও দীয়"রূপ শব্দের সাম্য থাকাতে অনুপ্রাস অলঙ্কার ও চমৎকার গূঢ়ভাব অন্তর্নিহিত থাকায় বৈজয়ন্তীর উত্তম কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্লোক ছাড়া নানাবিধ সুললিত ছন্দো-বন্ধে রচিত অনেকগুলি হৃদয়গ্রাহী সরস শ্লোক তিনি স্বামীর নিকটে প্রেরণকরিয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম এই সকল শ্লোক পাঠ করিয়া পত্নীর অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় স্বামিভক্তি এবং অতিশয় কেশসহনশক্তি অবগত হইলেন এবং অবশেষে নিজের অভিমান ও স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষাভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রথমতঃ পত্নী-প্রেরিত ঐ সকল শ্লোকের উত্তর দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত পত্নীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রথমতঃ আদর সম্ভাষণ জানাইতে একটু

লজ্জা বোধ করিলেন, পরে তাঁহার প্রেমতরঙ্গিণী, তাঁহার অভিমানরূপ বালুকাময় তীরের বাঁধ ভগ্ন করিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া পড়িল। তিনি আদরপ্রেমসূচক সম্বোধন করিয়া পত্নীর নিকটে একখানি প্রেমপত্রিকা লিখিয়া পাঠাইলেন। বৈজয়ন্তী কৃষ্ণনাথের এই সঞ্জীবনী অমৃতময়ী প্রেমপত্রী পাইয়া পতির সহিত মিলনের আশায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার বিরহানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল। তিনি সৌজন্য ধৈর্য্য ও ব্যঙ্গসূচক একটি শ্লোক* রচনা করিয়া পুনরায় পতির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শ্লোকটির অর্থ এই যে, হে মধুকর, নাগকেসর চম্পক লবঙ্গ পদ্ম মল্লিকা যূথিকা প্রভৃতি উত্তম উত্তম সুরস সুরভি মধুপূর্ণ পুষ্পের মধুপানে আসক্ত থাকাই তোমার স্বাভাবিক রীতি। এই সকল উত্তম উত্তম পুষ্পের মধুপান-সম্ভাবনা থাকিতেও অদ্য যে, তুমি এই সামান্য কুন্দ কুড়ুচি ও আকন্দ প্রভৃতি অসুরভি অমধুর পুষ্পের মধুপানে অভিলাষী হইয়াছ, ইহাতে তোমার উত্তমবংশে জন্ম ও হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকটিত হইয়াছে। এই শ্লোকের ভাবার্থ এইযে, হে প্রিয়তম স্বামিন্, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমি

---

* পুন্নাগচম্পকলবঙ্গসরোজমল্লি
মাতঙ্গযূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দবৃন্দকুটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্ত্ব মেতৎ

সুরূপা নহি, স্বলঙ্কৃতা নহি, সুগঠনা নহি, সুশিক্ষিতা নহি ও সুরসিকা নহি, সেইজন্য আপনি বোধহয়, পুনরায় একটি রূপগুণবতী স্বলঙ্কৃতা সুরসিকা পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ আপনি আমার প্রতি সদয় হওয়াতে আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনি ঐরূপ কার্য্য করেন নাই এবং আপনার হৃদয় অতি মহৎ। উত্তমবংশে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনিই মহাশয়-লোক। তাঁহাদের হৃদয়ের মহত্ব এইরূপেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। সামান্য লোকের প্রতি সদয় হওয়া তাঁহাদের মহত্বেরই পরিচয়। বৈজয়ন্তীর এই কবিতাটি পাঠ করিয়া কৃষ্ণনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যে পত্নীর জ্ঞানের পরিমাণটা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ঈদৃশী সুপণ্ডিতা সুরসিকা সুবিনীতা পতিপ্রাণা স্ত্রী শ্বেতাঙ্গী না হইলেও রত্নালঙ্কারভূষিতা বহুশ্বেতাঙ্গী অপেক্ষা অধিকতম আদর ও প্রেমের পাত্রী। ঈদৃশী সর্ব্বগুণান্বিতা সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি তিনি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উপেক্ষাভাব প্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ঐই শ্লোকের উত্তরস্বরূপ একটি শ্লোক* রচনা করিয়া পত্নীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এই

* যামিনীবিরহদূন মানসঃ
অঙ্ককুট্মলিত ভূরিভূরুহঃ।

শ্লোকটির অর্থ এই যে, পদ্মিনী, প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলেই প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পায়, কিন্তু সায়ংকালে সূর্য্য অস্তমিত হইলেই মুদ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে পদ্মিনী মুদিত হইয়াগেলে ভ্রমরের মধুপানে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে। পুনরায় পরদিন সূর্য্য উদিত হইলে পদ্মিনী যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরের ভাগ্যে আবার মধুপান ঘটে। ভ্রমর রাত্রিকালে পদ্মিনীবিয়োগে বড়ই কাতর হয়। ভ্রমর পদ্মিনীকেই যে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসে, তাহার চিহ্ন এইযে, সে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর শত শত প্রস্ফুটিত পুষ্প ত্যাগ করিয়া সরোবরে শোভমানা পদ্মিনীর অভিমুখেই ধাবিত হইয়া থাকে এবং পদ্মিনীর বিন্দু বিন্দু মধুপানেই আশক্ত হইয়া থাকে। নানাবিধ পুষ্প সত্ত্বেও পদ্মিনীছাড়া ভ্রমরের গত্যন্তর নাই। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, হে প্রিয়ে, তুমিই আমার পদ্মিনী। তুমিই আমার একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়। তুমিছাড়া এ জগতে অন্য কেহ আমার আশ্রয়ণীয় হইতে পারে না। আমিও তোমার বিয়োগে কাতর হইয়া ঘোর কালরাত্রিস্বরূপ এতাবৎকাল কষ্টে যাপন করিতে ছিলাম। এক্ষণে সেই ঘোর বিয়োগ-নিশার অবসান হইবে। হে প্রিয়তমে, এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন, ইহা নিশ্চয়

বিন্দুবিন্দুমকরন্দলোলুপঃ
পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে ॥

জানিও। কৃষ্ণনাথের এই কবিতাটি পাঠ করিয়া বৈজয়ন্তী বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিনের পর এইবার নিশ্চয়ই তাঁহার দুর্ভাগ্য-নিশার অবসান হইবে এবং তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। এইবার পতির সহিত তাঁহার সম্মিলন হইবে। ইহার পর কৃষ্ণনাথ, শ্বশুরের নিমন্ত্রণ-পত্র ও আহ্বান ব্যতিরেকেই হটাৎ একদিন শ্বশুরালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে এইরূপে সমাগত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। পরদিন কৃষ্ণনাথ শ্বশুরালয় হইতে বৈজয়ন্তীকে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। বহুদিন পরে সতী পতির সম্ভাষণে ও সমাদরে ধন্য হইলেন এবং পতিগৃহের সম্রাজ্ঞী হইয়া তথায় সাম্রাজ্য ভোগকরিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাথ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কোটালীপাড়ার একজন জমিদার ছিলেন। এইজন্য তাঁহার সার্ব্বভৌম এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতীয় উপাধি ছাড়া বঙ্গের নবাব কর্ত্তৃক প্রদত্ত চৌধুরী এই উপাধিও ছিল। সুতরাং তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি উত্তম ছিল। গৃহে যথেষ্ট দাসদাসী ছিল। তাঁহার "চমৎকারা অন্নচিন্তা" না থাকায় তিনি অনুদ্বিগ্ন মনে শান্তচিত্তে শাস্ত্রচিন্তায় ও পরমেশ্বরের আরাধনায় যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে পারিতেন। বৈজয়ন্তী দেবী ঈদৃশ স্বামি-গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাকে সংসারে কোন কার্য্যই করিতে হইবে না। সংসারে

কোন বিষয়েরই অভাব নাই। কোন বিষয়ের জন্য ভাবনা নাই। অতএব তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত প্রাণের একমাত্র লক্ষ্য সেই শাস্ত্রালোচনায় কোন ব্যাঘাতই ঘটিবে না। তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে সরস্বতীর প্রকৃত আরাধনার জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন। তিনি স্বামি-গৃহের এইরূপ উত্তম অবস্থা দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের পাঠ শেষ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ছয়টিকে দর্শনশাস্ত্র কহে। দর্শনশাস্ত্রপাঠে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অনুদ্বিগ্নচিত্তে কঠোর চিন্তার প্রয়োজন। পিতৃগৃহে বৈজয়ন্তীকে অনেক কার্য্য করিতে হইত। পিতার আর্থিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। সুতরাং তাঁহার দাসদাসী ছিল না। বৈজয়ন্তীকে রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্যই করিতে হইত। এইরূপ অবস্থাতেও তিনি শাস্ত্র-অধ্যয়নে বিরতা হয়েন নাই। কারণ, একটি প্রাচীন কথা আছে যে, "যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? যাহার যে কার্য্যে ইচ্ছা আছে, সে, সে কার্য্য করিতে কোন বাধাই মানে না। তবে কার্য্যে প্রবলা ইচ্ছাটা থাকা চাই। "ইচ্ছা থাকিলেই উপায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।" বৈজয়ন্তী পিতৃগৃহে ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু নানা বাধা আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি ঐ সকল বাধা মানুন আর নাই মানুন, তাহাতে বাধা কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ছাড়িত

না। স্বামি-গৃহে তাঁহার শাস্ত্রঅধ্যয়নে কোন বাধার আশঙ্কা ছিল না। সুতরাং তিনি স্বচ্ছন্দে বিদ্বান স্বামীর নিকটে সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে পিতার নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে স্বামীর নিকটে অন্যান্য দর্শনের অধ্যয়নের সময় বৈজয়ন্তীকে বেশী কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। অন্যান্য দর্শনের জ্ঞানের জন্য ন্যায়শাস্ত্র-অধ্যয়ন প্রথমতঃ অতীব প্রয়োজনীয়। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে অন্যান্য দর্শন উত্তমরূপে বুঝা যায় না। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিলে অন্যান্য শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক দোষ গুণ ও সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। বৈজয়ন্তী পূর্ব্বে পিত্রালয়ে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন বলিয়া অন্যান্য দর্শন গুলি তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন সায়ংকালে কৃষ্ণনাথ সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া "আনন্দলতিকার" শ্লোক রচনাকরিতে আরম্ভ করেন। শ্লোক রচনাকরিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া পড়িল। বৈজয়ন্তী দেখিলেন, তখনও তাঁহার লেখনী চলিতেছে। বৈজয়ন্তী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, এতরাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া কি বর্ণনা করিতেছেন? কৃষ্ণনাথ বলিলেন, এতক্ষণে একটি নায়িকার বর্ণনা প্রায় শেষ করিলাম। বৈজয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন, সামান্য একটা মেয়ে মানুষের রূপ বর্ণনায় কি এত সময় লাগে? দেখুন, আমি এক শ্লোকে আপনার এই নায়িকার সম্পূর্ণ বর্ণনা

শেষ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট আদিরস-ঘটিত শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন। সেই শ্লোকটি কোন কোন পাঠক ও পাঠিকার রুচিকর না হইতে পারে, এই বিবেচনায় উক্ত শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না এবং তাহার অর্থও লিখিত হইল না। সংস্কৃতশ্লোক-রচনার সময় অনেকেই অনেক সময়ে সদা অপ্রচলিত শব্দ এবং সমাসযুক্ত বড় বড় কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু যাঁহারা স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর কবি, তাঁহারা সরল মধুর সুললিত উত্তমভাবার্থযুক্ত মনোহারী শ্লোক রচনাকরিতে পারেন। রচনার সময়ে তাঁহাদিগকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় না, কিম্বা মুহুর্মুহুঃ অভিধান গ্রন্থ খুলিতে হয় না। তাঁহারা লোকের প্রীতি-উৎপাদনের জন্য কবিতা রচনা করেন, শ্রোতা বা পাঠকের মাথায় "ধাঁদা" লাগাইবার জন্য শ্লোকরচনা করেন না। বৈজয়ন্তীর কবিতাগুলি যেমন শ্রুতি মধুর তেমনই আবার চমৎকারভাবার্থযুক্ত। তাঁহার কবিতা প্রায়ই অনুপ্রাস অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বৈজয়ন্তী পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যখন স্বামি-বিরহ-যাতনায় অশান্তি ভোগ করিতেন, সেই সময়ে তিনি শান্তিলাভের জন্য পরমেশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন হইতেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পরের নিকটে বিরহ-ক্লেশ ব্যক্ত করিয়া মনের ক্ষীণতার পরিচয় দিতেন না।

তিনি সেই অশান্তির সময়ে শান্তিলাভার্থ পিতার নিকটে দীক্ষা গ্রহণকরিয়াছিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের পর তিনি সংস্কৃতে স্বীয় ইষ্ট দেবতার অনেকগুলি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। সেই স্তবাবলী-রচনায় তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক কবিতা কোটালীপাড়ায় অনেকের কর্ণেই অবস্থিতি করিত। বৈজয়ন্তী এইরূপ উত্তম উত্তম সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া স্বামীর অসীম আনন্দ উৎপাদন করিতেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিচার-প্রণালী দেখিয়া তাঁহার স্বামী বিস্মিত হইতেন। তাঁহার স্বামী প্রায়ই বলিতেন "প্রিয়ে, আমার বুদ্ধি অপেক্ষা তোমার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম"। বৈজয়ন্তী স্বামীর এইরূপ কথা শুনিয়া লজ্জা ও বিনয়ভারে অধোবদন হইয়া পড়িতেন ও বলিতেন, "হে প্রিয়তম, আপনি আমার শিক্ষক, আমার স্বামী। সুতরাং আমার পরম পূজনীয় ব্যক্তি। অতএব আপনি ঐরূপ কথা শুনাইয়া আমাকে কেন অপরাধিনী করিতেছেন? আপনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সেই জন্য আপনি আমার সকল বস্তুই ভাল বলিয়া দেখেন। ইহা আপনার অসীম দয়ার পরিচয়"। কৃষ্ণনাথ ও বৈজয়ন্তী এইরূপে পবিত্র আমোদে উভয়ে একত্র শাস্ত্রালোচনা করিতেন, কবিতা রচনা করিতেন, পারিবারিক ও বৈষয়িক কার্য্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করিতেন, এবং যথাসময়ে একত্র বসিয়া

পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন। কৃষ্ণনাথ সস্ত্রীক ধর্ম্ম-কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার গৃহে "বারমাসে তের পার্ব্বণ" অনুষ্ঠিত হইত। বৈজয়ন্তী দক্ষতার সহিত এই সকল কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিতেন। কৃষ্ণনাথের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই উৎসবাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ও বহু অনিমন্ত্রিত অতিথির সমাগম হইত। বৈজয়ন্তীর প্রশংসনীয় আতিথ্য-সৎকারে অতিথিগণ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। তাঁহারা লোককে দান করিয়া ও ভোজন করাইয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপ পরমানন্দে তাঁহারা গার্হস্থ্য-জীবনলীলা শেষ করিয়াছিলেন। বৈজয়ন্তীর ও কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর তাঁহাদের শ্রাদ্ধে যেরূপ দান ও মহাভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, মিষ্টান্ন দধি ও ক্ষীর রাখিবার স্থান সংকুলন না হওয়ায় মিষ্টান্ন দধি ও ক্ষীরের হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল। লুচি কচুরী প্রভৃতি ভাজিবার জন্য ঘৃতেরও হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। "দীয়তাং ও ভুজ্যতাং" এই রবে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের পর মাসাবধি এইরূপ মহাব্যাপার চলিয়াছিল।

প্রিয়ম্বদা।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া গ্রামে প্রিয়ম্বদানাম্নী এক প্রতিভাশালিনী ব্রাহ্মণমহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শিবরাম সার্ব্বভৌম। ইনি শৌনক-গোত্র-সম্ভুত হরিহর তর্কপঞ্চাননের পৌত্র। শিবরাম সার্ব্বভৌম নানাশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি ভারতের বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ তৎকালে তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে আসিত। তিনি সেই সকল ছাত্রকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া স্ব গৃহে অধ্যয়ন করাইতেন। তাঁহার একটি পুত্র ছিল। পুত্রের নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। প্রিয়ম্বদা প্রথমে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া শিবরাম প্রিয়ম্বদাকে অতিশয় স্নেহ ও আদর করিতেন। শিবরাম যখন টোলে ছাত্র-দিগকে পড়াইতেন, তখন বালিকা প্রিয়ম্বদা তাঁহার নিকটে বসিয়া পাঠ শুনিতেন। শৈশবে প্রিয়ম্বদার স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রখরা ছিল। তিনি দিবসে যে সকল পাঠ শুনিতেন, রাত্রে পিতার নিকটে সেই সকল পাঠ অবিকল বলিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার ঈদৃশী অদ্ভুত স্মরণশক্তি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন। কিন্তু তখনও তিনি কন্যাকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতে মনোযোগী হয়েন নাই। কারণ, তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, গৃহকৃত্য-

শিক্ষাই স্ত্রীলোকের চরম শিক্ষা। স্ত্রীজাতিকে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রশিক্ষায় স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। ভারতে অনেকেরই এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন শিবরাম হেমাদ্রিগ্রন্থের একটি শ্লোক অন্বেষণ করিতে করিতে দুইটি শ্লোক দেখিতে পাইলেন। শ্লোক দুইটির অর্থ এই যে, কুমারী কন্যাকে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবে। যে কন্যা ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করে, সেই কন্যাই পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের কল্যাণদায়িনী হইতে পারে। কন্যা, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে যখন সুশিক্ষিতা হইবে, তখন তাহাকে এক সৎকুলোদ্ভব সুশীল বিদ্বান বরের করে সমর্পণ করিবে। যে কন্যা ভাবীপতির মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, ও পতিকে কিরূপে সেবা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র শিক্ষা করে নাই, পিতা, ঈদৃশী অশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ যেন কখনও না দেন। শিবরাম, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ শাসনবাক্য লিখিত আছে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব ভ্রান্তসংস্কার ত্যাগ করিলেন এবং একটি শুভদিন দেখিয়া কন্যার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। প্রিয়ম্বদার অক্ষর পরিচয়ের পর শিবরাম তাঁহাকে কলাপব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধার প্রভাবে প্রিয়ম্বদা অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার ঈদৃশী উন্নতি দেখিয়া

তাঁহার পিতার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। শিবরাম বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সহিত কন্যাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। তিনি ব্যাকরণ-সমাপ্তির পর প্রিয়ম্বদাকে সাহিত্য পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে প্রিয়ম্বদা সমগ্র সাহিত্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ নানাশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সংস্কৃতভাষায় বিশুদ্ধভাবে অনর্গল কথা কহিতে পারেন না। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বালিকা প্রিয়ম্বদা স্বীয় মাতৃভাষা বঙ্গভাষার ন্যায় সংস্কৃতভাষায় অতি সহজে অনর্গলভাবে কথা কহিতে পারিতেন।

প্রিয়ম্বদার এইরূপ সংস্কৃতকথনশক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা শিবরাম এবং শিবরামের টোলের ছাত্রগণ বিস্মিত হইতেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়ায় ছাত্রগণ স্বহস্তে পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া পাঠ করিত। প্রিয়ম্বদাও, স্বীয় পাঠ্য পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠ্য পুস্তক লিখিতে লিখিতে তাঁহার হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিলে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর বলিয়া কাহারও বোধ হইত না। তিনি স্বহস্তে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সাহিত্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্লোকরচনা করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। নানাশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করিতে পারিলেও,

অনেকে শ্লোক রচনা করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন যে, এ জগতে প্রথমতঃ মনুষ্যজন্মই দুর্লভ। পূর্ব্বজন্মের মনুষ্যোচিত স্বভাব ও সংস্কার-বলে ইহ জন্মে মনুষ্যত্বলাভ হয়। মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলেই বিদ্যালাভ করিতে পারে না। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও সংস্কার ব্যতিরেকে ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয় না। মানুষ বিদ্বান হইলেও কবি হইতে পারে না। অভিধানে নিরন্তর শব্দ-অন্বেষণ এবং পদযোজনার জন্য কঠোর মানসিক চেষ্টা দ্বারা শ্লোক রচনাকরিতে অভ্যাস করাও কঠিন ব্যাপার। কারণ, সকলেই এইরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত রচনাভ্যাস করিতে সমর্থ হয় না। অতি কষ্টে কোনরূপে কবি হইতে পারিলেও শীঘ্র উত্তম রচনা-শক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস-সংস্কার এবং ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে ঐ শক্তি কেহ লাভকরিতে পারে না। প্রিয়ম্বদার ঐরূপ শক্তি ছিল। সুতরাং তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্লোক রচনাকরিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার ঈদৃশী রচনাশক্তি দেখিয়া একদিন বলিলেন, মা, তুমি আমাদের কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দ-দেবের বর্ণনা করিয়া একটি শ্লোক আমাকে শুনাও। প্রিয়ম্বদা তৎক্ষণাৎ একটি সরল প্রাঞ্জল শ্লোক* রচনা

---

* কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চ্চিতম্।

করিয়া পিতাকে শুনাইলেন। এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে যমুনাতটে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন, কংসাদি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন, যিনি গোপীদিগের নয়নরূপ পদ্ম দ্বারা অর্চ্চিত হয়েন, (অর্থাৎ যাঁহাকে গোপীগণ নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিয়া চক্ষুকে সফল করিয়াছেন) যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা সমলঙ্কৃত, সেই শ্যামবর্ণ মনোহর ব্রজসুন্দর ভবভয়হারী ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনাকরি। কন্যার রচিত এই প্রাঞ্জল মধুর শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভক্ত ভাবুক পিতার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "মা, আমি পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যের বলে তোমাকে পাইয়াছি। মা, তুমি সরস্বতীর অবতার। আমার পূর্ব্বজন্মের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তুমি মানবীরূপে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার এইরূপ প্রাঞ্জল শ্লোক শুনিয়া আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম"। শীঘ্র শ্লোক রচনার শক্তি ছাড়া প্রিয়ম্বদার আর একটি ঈশ্বরদত্ত শক্তি ছিল। তিনি অতি সুমধুর স্বরে সঙ্গীতবিশারদ "ওস্তাদে"র গানের মত তাল মান লয় যুক্ত অতি চমৎকার গান গাইতে পারিতেন। কেহ তাঁহাকে এইরূপ সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষাদান করে নাই।

বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈরঙ্গৈ স্ত্রিভঙ্গং ভজে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলম্।

অথচ তিনি উত্তমরূপে "ওস্তাদী" গান গাইতে পারিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া মনে করিত এবং আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। শিবরাম প্রিয়ম্বদাকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য একটি উপযুক্ত সুপাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বঙ্গদেশে কুত্রাপি মনের মত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না। অবশেষে পাত্র-অন্বেষণার্থ কাশীধামে গমন করিলেন।

তিনি কাশীধামে পৌঁছিয়া একটি মঠে আশ্রয় লইলেন। কাশীতে তীর্থকৃত্য সমাপ্ত করিয়া উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধানকরিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি কাশীতে কিছুকাল বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। শীঘ্র পাত্র না পাওয়ায় তাঁহাকে সঙ্কল্পিত সময় অপেক্ষা বেশী সময় কাশীতে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি কাশীতে মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে মঠে মীমাংসা অধ্যয়ন করিতেন, সেই মঠে হটাৎ একদিন তেজঃপুঞ্জময় এক ব্রাহ্মণ যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যুবকের নাম রঘুনাথ মিশ্র। রঘুনাথের সহিত শিবরামের শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে শিবরাম অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

শিবরাম, স্বীয় অধ্যাপক মহাশয় ও অন্যান্য প্রামাণিক লোকের নিকটে রঘুনাথের কুলশীলাদির সবিশেষ পরিচয় লইয়া প্রিয়ম্বদার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রঘুনাথ হিন্দুস্থানী হইয়া বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবাহ করিতে প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ যখন তিনি শুনিলেন যে, শিবরাম "পাশ্চাত্য বৈদিক" ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমদেশ হইতে বঙ্গদেশে গিয়া বাস করায় "পাশ্চাত্য বৈদিক" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি এ বিবাহে আপত্তি না করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শিবরাম রঘুনাথ মিশ্রকে অতি যত্নের সহিত স্বদেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে গৃহে আনিয়া প্রিয়ম্বদার নিকটে তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রিয়ম্বদা এই প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জাবনতমুখী হইলেন, কিন্তু অন্তরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। রঘুনাথ প্রিয়ম্বদার রূপে ও গুণে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। শিবরাম একটি শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে কন্যাকে পণ্ডিতপ্রবর রঘুনাথ মিশ্রের করে সমর্পণ করিলেন। শিবরাম সার্ব্বভৌম একদিকে যেমন শাস্ত্র-জ্ঞানের অগাধসমুদ্রস্বরূপ ছিলেন, তদ্রূপ অন্যদিকে প্রভূত ধন ও প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও একজন বিশিষ্টসম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। জমিদারী ছাড়া

তাঁহার নগদ সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার গৃহে প্রভূত পরিমাণে সুবর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত ছিল। তিনি কন্যা ও জামাতার ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহার "মাঝ্‌বাড়ী" নামক গ্রামখানি তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার ও জামাতার অন্তঃকরণ খুব উদার ও সরল ছিল। তাঁহারা লোভী ছিলেন না। তাঁহারা লোভকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা উক্ত বৃহৎ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিবরামকে বলিলেন, "আমরা এত বড় গ্রাম লইয়া কি করিব? বেশী ভূসম্পত্তি লইলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদিগকে সদা ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। ভূসম্পত্তি রক্ষণকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিলে আমাদের শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র ভূমিখণ্ড পাইলেই আমাদের যথেষ্ট লাভ হইবে। অন্নচিন্তার জন্য শাস্ত্রচর্চ্চায় আর ব্যাঘাত ঘটিবে না। নিশ্চিন্ত মনে দুইজনে শাস্ত্রালোচনায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।" এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহারা উক্ত বৃহৎ ভূসম্পত্তি-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শিবরাম উক্ত ভূসম্পত্তির কিয়দংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

যে যুগে শ্বশুর একটা বৃহৎ জমিদারী দিতে উদ্যত হইলে জামাতা এবং কন্যা তাঁহাদের শাস্ত্রচর্চ্চায় বিঘ্নের ভয়ে উহা লইতেন না, সেই যুগকে সত্যযুগ বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। উহা কলিযুগ হইলেও তখন কলির প্রভাব তাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। অধুনা ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই প্রায় সর্ব্ব সমাজেই কন্যার বিবাহব্যয়ের ভাবনায় পিতাকে অস্থির হইতে হয়। কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কোন কোন পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এমন কি, যিনি অতি সামান্য মাত্র বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে একটা "সওদাগরী আফিষে" "কেরাণীগিরি" করেন, তাঁহার বিবাহের সময় তাঁহার পিতা, কন্যার পিতার নিকটে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার একখানি লম্বা ফর্দ্দ ফেলিয়া দেন!! পাত্রের পিতার বাসের জন্য দুর্গম পল্লীগ্রামে হয়ত একখানি মাত্র জীর্ণ পর্ণ কুটীর আছে, এবং তিনি হয়ত গ্রামের অন্য লোকের ম্যালেরিয়া ও গলিত পর্ণ-পূর্ণ দুর্গন্ধ "ডোবার" মত একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে স্নান করেন, উক্তরূপ পুত্রের বিবাহে আকাঙ্ক্ষিত মুদ্রা ও দান-সামগ্রী গুলি রাখিবার জন্য তাঁহার পর্ণকুটীরে তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান নাই, অত টাকা রাখিবার জন্য লোহার সিন্দুকের কথা তো দূরের কথা, তাঁহার একটা ক্ষুদ্র দেবদারু কাষ্ঠের সিন্দুক পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রের বিবাহে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের দীর্ঘ ফর্দ্দখানি কন্যার পিতার হস্তে দান করিতে সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ করেন না। আবার যে সকল পাত্র দুই তিনটা বা তিন চারিটা "পাস্" করিয়াছেন এবং

গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের পিতা কন্যার পিতার গলকর্ত্তনের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে সদা খড়গ শাণিত করেন এবং তাঁহার "বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরাইবার জন্য" মহাযত্নপূর্ব্বক ঘুঘু-পক্ষী পুষিয়া থাকেন। ইহা অতি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়ম্বদার স্বামী পণ্ডিত রঘুনাথমিশ্র শ্বশুরের নিকট হইতে "মাঝ্-বাড়ী" গ্রামের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিবার জন্য একটি উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ঐ যৎকিঞ্চিৎ ভূমিখণ্ড হইতে উৎপন্ন শস্যের আয় হইতে স্বীয় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পরমসুখে সস্ত্রীক শাস্ত্র-চর্চ্চায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদা যখন "মাঝবাড়ীতে" আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সাংসারিক কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্য কেহই ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে নিজহস্তেই সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পাদনকরিতে হইত। এরূপ অবস্থাতেও, তিনি স্বামীর সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় বিরতা হয়েন নাই। রঘুনাথমিশ্র কাশীধাম হইতে আসিবার সময় "রঘুনাথ-চক্র" ও "শ্রীধরচক্র"নামক দুইটি শালগ্রাম-শিলা আনিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা প্রত্যহ তাঁহাদের পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন। রঘুনাথ স্বয়ং পূজা করিতেন। কিন্তু শুনা যায় যে, প্রিয়ম্বদা প্রতিদিনই পূজার সময়ে একটি নূতন সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে

নমস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহারা একত্র বসিয়া এক সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করিতেন। "সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়" এই শাস্ত্র-বাক্য তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতেন।

রঘুনাথমিশ্র নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগত বহু ছাত্রকে খাদ্যবস্ত্র দান করিয়া ও স্বগৃহে রাখিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। প্রিয়ম্বদা ঐ সকল ছাত্রের ভোজনের জন্য দুইবেলা স্বহস্তে পাক করিতেন। তিনি প্রতিদিন ছাত্র-গণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইতেন। স্বামীর আহারের পর স্বামীর ভোজন-পাত্রে তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণকরিতেন। প্রিয়ম্বদা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগকরিতেন। প্রত্যহ গৃহ-মার্জ্জন, গোময়-মিশ্রিত জলদ্বারা গৃহের সর্ব্বত্র সিঞ্চন, মৃত্তিকা-মিশ্রিত গোময় দ্বারা পাকগৃহে চুল্লী প্রভৃতি-সংলেপন, শৌচ, স্নান, পূজার আয়োজন, সন্ধ্যাবন্দন, পূজা, ৺নারায়ণ-নমস্কারের দৈনিক নূতন সংস্কৃত শ্লোক-রচনা, রন্ধন, পরিবেশন, এবং তাঁহার নিজের ভোজনে দিবা আড়াই প্রহর কাল অতীত হইত। ভোজনান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে বসিতেন। তাঁহার হস্তলিখিত "শ্যামারহস্য" নামক একখানি তন্ত্রগ্রন্থ তাঁহার বংশধর-গণের নিকটে অদ্যাপি বিরাজমান আছে। তাঁহার স্বামী কাশী হইতে আসিবার সময় সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত অনেক

পুস্তক আনিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা প্রতিদিন বঙ্গাক্ষরে সেই পুস্তকগুলির অনুলিপি গ্রহণ করিতেন। তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়া স্বামীর সমীপে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। "ত্রয়োদশী তিথিতে বৈশেষিক দর্শন এবং পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে নাই," ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি গুলি মানিয়া চলিতেন। অধুনা অনেকে এইরূপ বিধিগুলি মানেন না। প্রিয়ম্বদা বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন। উভয়ের ভাষা পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়ের পরস্পর কথোপকথন বিষয়ে তাঁহাদিগকে বেশী দিন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কারণ, রঘুনাথ অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদার অসাধারণ স্বামিভক্তি ছিল। স্বামীর বাক্যকে তিনি বেদবাক্যের ন্যায় মান্য করিতেন। তিনি মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মের একখানি সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বহু পুস্তকের টীকা প্রণয়ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তালপত্রে লিখিত ঐ সকল পুস্তক তাঁহার বংশধরগণের যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একদা বহু অনুসন্ধানে একটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ পত্রটির অক্ষরগুলি এতই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, উহা কোন রূপেই পড়িতে

পারা গেল না। বহুকষ্টে কয়েকটিমাত্র অক্ষর পড়িতে পারা গিয়াছিল। ঐ অক্ষর গুলির অর্থ এই যে, হে স্বামিন্, আপনার পিতার কৃপাবলেই আমি স্ত্রীলোক হইয়াও এই পুস্তকের টীকা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ অনেক শিক্ষিতমহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনচরিত-লিখনের প্রথা অস্মদ্দেশে বিলুপ্ত হওয়াতেই ভারতের শিক্ষিতমহিলা-দিগের সংখ্যা নির্ণয়করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। প্রিয়ম্বদার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল। তাহাদের লালন-পালন এবং গৃহকৃত্য-সম্পাদনে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইলেও তিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় কখনও বিরত হয়েন নাই। তিনি পুত্র-কন্যাদিগের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সন্তানগণ বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হইতে পারিয়াছিলেন। মাতার নিকটে শিক্ষা পাইলে সন্তানগণের ধর্ম্মজীবন এবং নৈতিকজীবন যেরূপ দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়, অন্যের নিকটে শিক্ষা পাইলে তদ্রূপ হয় না। মাতার নিকটে শিক্ষালাভ করিবার যেরূপ সুবিধা হয়, অন্যের নিকটে তদ্রূপ সুবিধা ঘটে না।

নিরূপিত আছে। একদা রাজা রাজবল্লভ "অগ্নিষ্টোম"-নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইয়া বারাণসী নগরীতে রামগতি সেনের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামগতি সেই সময়ে বারাণসীতে বাস করিতেছিলেন। কাশীর জগদ্বিখ্যাত প্রধান প্রধান পণ্ডিতের নিকট হইতে "অগ্নিষ্টোম"-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং হোমকুণ্ডের ও ঘৃতাধার প্রভৃতি পাত্রের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া রাজনগরে রাজার নিকটে পাঠাইবার জন্য রাজা, রামগতিকে ঐ পত্রে বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কাশীতে রামগতি স্বয়ং একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত ও ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময়ে কাশীর পণ্ডিতগণের নিকটে গমন করিয়া "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞের পদ্ধতি সংগ্রহ করিবার অবকাশ তাঁহার মোটেই ছিল না। অথচ রাজা পত্র লিখিয়াছেন, শীঘ্রই তাহার উত্তর প্রেরণ করা উচিত। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, এই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন। আনন্দময়ী পিতাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিন্তার কারণ অবগত হইয়া তিনি পিতাকে বলিলেন, "হে পিতৃদেব, এই বিষয়ের জন্যআপনাকে কাশীর পণ্ডিতদিগের নিকটে যাইতে হইবে না। আমি স্বয়ংই উহা উত্তমরূপে লিখিয়া রাজার নিকটে প্রেরণ করিতেছি"। এই বলিয়া তিনি স্বয়ংই "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পুংখানুপুংখরূপে লিখিয়া

রাজা রাজবল্লভের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা উক্ত যজ্ঞপদ্ধতির উত্তম লিখন-প্রণালী দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহা কাশীর কোন উত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃকই লিখিত হইয়াছে। ইহা আনন্দময়ী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাঁহার এইরূপ ধারণাই জন্মিল না। তিনি অসন্দিগ্ধচিত্তে ঐ পদ্ধতি অনুসারে রাজনগরে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থিতি সময়ে আনন্দময়ী পরমহংস মহাত্মা ও দণ্ডীদিগের নিকটে বেদান্ত, উপনিষৎ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ও মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য ও অলঙ্কার পাঠের পর রাজনগরেই ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের নিকটে কলাপ-ব্যাকরণের কবিরাজী ও পঞ্জী প্রভৃতি কঠিন টীকাপুস্তক সকল এবং শব্দখণ্ডের অনেক গ্রন্থ পাঠকরিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবলমাত্র বড় বৈয়াকরণ বা শাব্দিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কলাপব্যাকরণ শেষ করিয়া এই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন। আনন্দময়ী স্ত্রীলোক হইয়াও এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় উত্তম পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার কবিতা সরল ও সুমধুর। অন্যান্য কবিদিগের মত তাঁহার যশোলিপ্সা ছিল না বলিয়া তাঁহার কবিতার শেষে নিজ নামের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার "হরিলীলা"র বর্ণন

অতি মধুর। তাঁহার কবিতা শব্দালঙ্কারে সবিশেষ সমলঙ্কৃত। উহাতে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হয়। আনন্দময়ী মধুরভাষিণী বিনীতা এবং সর্ব্বদা লোকহিতে রতা ছিলেন। সেনহাটি, পয়গ্রাম, মূলঘর ও জপসা প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি আনন্দমীর বিদ্যাখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। আনন্দময়ী চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ জাতির (বৈদ্যের) কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-দুহিতা না হইয়াও সংস্কৃতভাষায় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিতা ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ অনেক উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের ইতিহাস অভাবে বঙ্গীয় নারীগণের শিক্ষা বিষয়ে অনেকের ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বহু পরিশ্রমে কয়েকটি শিক্ষিতমহিলার ইতিবৃত্ত লব্ধ হওয়ায় ও সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

রাণী দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষ এক অদ্ভুত মহান্ অসাধারণ সভ্যদেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুরুষ মহাপণ্ডিত হইয়াছে, রাজ-নীতি-বিশারদ হইয়াছে, মহাযোদ্ধা হইয়াছে, বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াছে, মহাকবি হইয়াছে, জ্যোতিষী

হইয়াছে, দার্শনিক হইয়াছে, সমাজ-সংস্কারক হইয়াছে, এবং প্রভুশক্তি উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন রাজা হইয়াছে, সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল দেশের স্ত্রীলোক সেই সকল দেশের উক্তবিধি পুরুষদিগের মত হইতে পারেন নাই। যদিও হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দুই একটি মাত্র হইয়াছেন। বেশী হয় নাই। কিন্তু ভারতের অনেক মহিলা প্রাচীন যুগেও, দর্শন, জ্যোতিষ এবং রাজনীতি প্রভৃতি মহাকঠিন শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিতা হইয়াছেন, যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, রাজনীতিশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত মহামন্ত্রীকেও শিক্ষা দিতে সমর্থা হইয়াছেন, সিংহল, চীন, জাপান ও তিব্বত প্রভৃতি তাৎকালিক মহাদুর্গম দেশে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, সিংহাসনে বসিয়া পুরুষ রাজার ন্যায় প্রজার বিচারকের কার্য্য করিয়াছেন, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং শত্রুগণকে ভয় প্রদর্শনে কাম্পিত করিয়াছেন। ভারতমহিলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া কেবলমাত্র সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করেন নাই। কিম্বা সাক্ষীগোপালের মত কেবলমাত্র মন্ত্রিগণ-পরিচালিত রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। ভারতমহিলা যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিবার জন্য অশ্বে বা গজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। এমন কি, মাত্র তিন চারিশত বর্ষ পূর্ব্বেও ভারতমহিলা

"জগদীশ্বর" উপাধি-ভূষিত দিল্লীশ্বর মহাপ্রতাপ সম্রাট আকবর সাহের অন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধ করিতেও ভীতা হয়েন নাই। যে সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলসম্রাট আকবর সাহের বিজয় পতাকা হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানে পৎপৎ শব্দে উড্ডীয়মান হইত, সেই সময়ে মধ্যভারতের গড়ামণ্ডলা-নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্বাধীনতার ক্ষুদ্রজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া সকলের হৃদয়কে বিস্ময়রসে আপ্লুত করিয়াছিল। যে সময়ে ভারতের প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ আক্‌বর সাহের প্রখর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নীরবে সহ্য করিতেছিলেন, যে সময়ে আকবর সাহ ব্যাঘ্র এবং ধেনুকে এক জলাশয়ে সমকালে জলপান করাইতেন, সেই সময়ে একটি ভারতমহিলা স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষাকরিয়া অপত্যনির্বিবশেষে প্রজাপালন করিতেছিলেন, এই কথা একবার মনে ভাবিলেও কৌতূহলে ও আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেনা কি? রাজ্ঞী দুর্গাবতী রোটা ও মহোবার অধিপতি চন্দেলবংশীয় শালিবাহননামক রাজার দুহিতা ছিলেন। যৌবন সমাগমে তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য ও গুণের কথা যখন সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে রাজপুতানার কোন উচ্চকুলোৎপন্ন প্রতাপশালী কোন বীর রাজার অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গড়ামণ্ডলার রাজা দলপতি সাহ দুর্গাবতীর

রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং চন্দেলরাজের নিকটে স্বীয় মনোরথ অভিব্যক্ত করিলেন। চন্দেলরাজের বংশ-মর্য্যাদা অপেক্ষা দলপতি সাহের বংশ মর্য্যাদা অনেকাংশে ন্যূন হওয়ায় চন্দেলরাজ প্রথমতঃ দলপতি সাহের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। দলপতি সাহ ইহা বুঝিতে পারিয়া চন্দেলরাজের নিকটে দূত প্রেরণকরিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি যদি এই বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন বা অন্য কোন রাজার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে এবং দলপতি সাহ অবিলম্বে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধ্বংসসাধন করিবেন। চন্দেলরাজের বংশমর্য্যাদা উচ্চ হইলেও তিনি দলপতি সাহের ন্যায় ধনবলে ও লোক-বলে বলীয়ান ছিলেন না। অগত্যা তিনি ন্যূনতা স্বীকার করিয়া দলপতির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে দলপতি সাহের সহিত শ্রীমতী দুর্গাবতীর বিবাহ-কৃত্য সম্পন্ন হইল। দুর্গাবতী যথা সময়ে পতিগৃহে আগমন করিয়া স্বামীর সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায় রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র কয়েকদিন মহাআনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। রাজা ও রাণী পরমসুখে রাজ্য-সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইয়া তাঁহাদের সেই অনির্ব্বচনীয় সুখে বাধা জন্মাইল। রাজা দলপতি সাহ হটাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর রাজ্ঞী দুর্গাবতী স্বামিশোকে অত্যন্ত কাতরা হইলেও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখী না হইয়া একটি শুভদিনে সিংহাসনে অধিরূঢ়া হইলেন. এবং স্বয়ংই রাজ্য-পালন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। যাহারা রাজার শোকে অধীর হইয়াছিল, তাহারা রাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিল। রাণী গীতায় শ্রীকৃষ্ণোপদিষ্ট জ্ঞান লাভকরিয়াছিলেন বলিয়া শোক সংবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের চরণে মতি রাখিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জনপূর্ব্বক মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত রহিলেন। সকলেই ঈশ্বরের নিকটে রাজকুমারের শুভকামনা করিতে লাগিল। রাজকুমার বীরনারায়ণ সাহের বয়ঃক্রম তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। রাণী দুর্গাবতী পুত্রের ঈদৃশ অল্প বয়সেই পুত্রকে অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনা প্রভৃতি কার্য্যে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার সুব্যবস্থা-নৈপুণ্য অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, রাজার অভাবে রাণী রাজকার্য্য-পরিচালনে সুদক্ষা। প্রজাবর্গের

মহাসন্তোষ বিধানকরিয়া রাণী কয়েক বৎসর যাবৎ নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে যখন কিঞ্চিৎ অবসর পাইতেন, তখন মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন। ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তুর শীকারে তাঁহার নিপুণতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অশ্বগজপরিচালনা ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভকরিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর সাহের মহাপ্রতাপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মুসলমান সম্রাটই গঢ়ামণ্ডলা-রাজ্যের স্বাধীনতা-হরণের অভিলাষকেও মনে স্থান দিতে সাহসী হয়েন নাই। কারণ, এই রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই মহা-নিবিড় জঙ্গল ছিল। এবং ইহা বহুসংখ্যক দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার গোণ্ডজাতীয় অধিবাসিগণ অসীম সাহসী ঘোর কষ্টসহিষ্ণু ও প্রবলপরাক্রমী ছিল। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষা ইহাদের ইষ্টমন্ত্র ছিল। ইহারা এই মন্ত্রের পরম জাপক ছিল। ইহাদের ভয়ে দিল্লীর কোন সম্রাটই ইহাদের রাজ্য আক্রমণকরিতে সাহসী হয়েন নাই। সুতরাং মুসলমানদিগের প্রথমভারত-আক্রমণ-সময় হইতে রাণী দুর্গাবতীর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। রাণীর রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। মালবদেশে গঢ়া ও মণ্ডলানামক দুইটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। মণ্ডলা একটি জেলা। ইহা জব্বলপুরের

দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং গঢ়ানামক একটি গ্রাম বর্ত্তমান জব্বলপুর সহর হইতে ৪ মাইল দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে রাণী দুর্গাবতীর মদনমহলনামক একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গটি একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত হওয়ায় বহুদূর হইতে ইহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মদনমহল হইতে ৪ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে কটঙ্গানামক একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের উপর আর একটি দুর্গ ছিল। এই পাহাড়ের নামানুসারে ইতিহাস-লেখক ইলিয়ট্ সাহেব নিজের ইতিহাসে রাণী দুর্গাবতীর রাজ্যকে গঢ়াকটঙ্ক এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, কটঙ্ক নামে তথায় কোন স্থান নাই। কটঙ্গানামক পাহাড়ের অস্তিত্ব মাত্রই অবগত হওয়া যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের বর্ণ-সংযোজনার বিকৃতি দোষ অনুকরণ করিলে অনেক সময়ে সত্যের আবিষ্কার করা মহাকঠিন হইয়া পড়ে। রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য জব্বলপুর অঞ্চলে "গঢ়ামণ্ডলা" এই নামেই অদ্যাপি সমধিক প্রসিদ্ধ আছে। গঢ়া ও মণ্ডলা দুইটি স্বতন্ত্র স্থান। এই দুইটি নাম যুক্ত হইয়া রাণীর রাজ্যের নাম হইয়াছে গঢ়ামণ্ডলা। এই রাজ্য তৎকালে বহুসংখ্যক অভেদ্য উচ্চ দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কোন বিদেশীয় রাজা সহসা এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা সুজল সুফল ও

শস্যশ্যামল ছিল। ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে সত্তর হাজার (৭০০০০) ধনজনপূর্ণ গ্রামের অস্তিত্ব শ্রুত হওয়া যায়। তৎকালে গঢ়া একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। সম্প্রতি ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। যেখানে চৌড়াগঢ়নামক দুর্গ ছিল, তথায় রাজধানী ছিল। রাজ-পরিবার ঐ দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। রাজ্যের প্রজাগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইত। প্রজাবর্গ পরিশ্রমী ক্লেশসহিষ্ণু দৃঢ়কায় ও যুদ্ধনিপুণ ছিল। সেইজন্য এই রাজ্য অতি প্রাচীনকাল হইতে আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত মুসলমানগণ অধিকার করিতে পারেন নাই এবং ইহা দিল্লীর সহিত সংযুক্ত হয় নাই। রাণী, ঘন-বসতিপূর্ণ তেইস হাজার প্রধান প্রধান গ্রাম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিতেন এবং অবশিষ্ট বহু সহস্র গ্রাম তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের তত্ত্বাবধানে থাকিত।

গুজরাটের সুলতানবাহাদুর যখন রাইসীন্ দুর্গ জয় করিতে আসিয়াছিলেন সেই সময়ে, রাণী দুর্গাবতীর শ্বশুর রাজা আমনদাস তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য সুলতানবাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বহুধন উচ্চসম্মান ও সংগ্রামসাহ এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা আমনদাসের পুত্রই দলপতি সাহ। ইনিই ধনজন-প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয় রাজা শালিবাহনের

কন্যা রাণী দুর্গাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা শালিবাহন দুরবস্থায় পতিত হওয়াতেই তিনি বাধ্য হইয়া জাত্যংশে নিকৃষ্ট রাজা দলপতি সাহের করে স্বীয় কন্যা দুর্গাবতীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। রাণী দুর্গাবতী অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন এবং একটি সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী হইবার উপযোগী সদ্গুণরাশিতে বিভূষিতা ছিলেন। দলপতি সাহ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সাত বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণী স্বয়ংই সিংহাসনে আধরূঢ় হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধরনামক এক বুদ্ধিমান সুচতুর কায়স্থ রাণী দুর্গাবতীর মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া রাজ্যপালন কর্ম্মে রাণীকে সাহায্য করিতেন মাত্র। রাণী মন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। মন্ত্রীর উপদেশের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া রাজকার্য্য চালাইতেন না। মধ্যে মধ্যে অধরের মন্ত্রণায়ও, দোষ দেখাইয়া দিতেন। অধর রাজনীতিশাস্ত্রে রাণীর বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। অধর ভাল মন্ত্রী হইলেও ভাল যোদ্ধা ছিলেন না। যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণার সময় রাণীর মতই প্রবল থাকিত। রাণী রাজকার্য্যে কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই বনে মৃগয়া করিতে যাইতেন। সৈন্য বিভাগের প্রধান প্রধান ভীমমূর্ত্তি ও ভীমবল মৃগয়া-নিপুণ ব্যক্তি যে সকল ভীষণ বৃহৎ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তুকে

মৃগয়াকালে কখনও বধ করিতে পারে নাই, রাণী দুর্গাবতী সেই সকল দুর্দ্দম্য ভীষণ বন্যজন্তুকে মুহূর্ত্তমধ্যে বধ করিতে পারিতেন। তাঁহার লক্ষ্য কখনই ভ্রষ্ট হইত না, উহা সদাই তাঁহার অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তিনি মৃগয়ালব্ধ বন্যজন্তু মৃগয়া-প্রদেশ হইতে রাজধানীতে আনয়ন করিতেন। নিহত বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তুর শরীরের ভিতর হইতে রক্ত অস্থি মাংসাদি বাহির করিয়া শুষ্ক তৃণ (খড়) পুরিয়া রাখা হইত। উহারা জীবিতবৎ প্রতীয়মান হইয়া রাজবাটীর স্থান বিশেষের শোভাবর্দ্ধন করিত এবং রাণীর মৃগয়া-নৈপুণ্য সূচিত করিত। স্ত্রীলোকের এইরূপ মৃগয়া নিপুণতা পৃথিবীর কুত্রাপি কেহ শুনে নাই। কেবলমাত্র ভারতের মহিলাজাতিরই এইরূপ নিপুণতা শ্রুত হইয়া থাকে। রাণী দুর্গাবতী যেমন মৃগয়ায় সুনিপুণা ও সুশিক্ষিতা ছিলেন, তদ্রূপ যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহার অসাধারণ নিপুণতা ছিল। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় মহাশিক্ষিতা ছিলেন। পারসীক ও ইংরাজি ইতিহাসে তাঁহার সাহস, নির্ভীকতা, রাজকার্য্য-দক্ষতা, বিচারশক্তি এবং বিচক্ষণতার যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অন্যান্য বৈদেশিক স্বাধীন নরপতি-গণের সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাজনীতি-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন। সম্রাট্ আকবর সাহ কর্ত্তৃক মালবদেশ বিজিত হইলে পর সুজা-

ওল্‌খাঁ এই দেশের শাসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বাজ্‌বাহাদুর। এই বাজ্‌বাহাদুর একজন দুর্দ্দম্য যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহার সহিত রাণী দুর্গাবতীর বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই বাজ্‌ বাহাদুর রাণী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ইনি রাণীকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। যখন মালবের মিয়ান্‌ পাঠানগণ তাহাদের শত্রু বাজ্‌বাহাদুরকে উৎখাত করিয়া ইব্রাহিম্‌খাঁনামক এক ব্যক্তিকে মালবের অধিপতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং যুদ্ধে ইব্রাহিম্‌ খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ রচনাকরিয়াছিল, তখন ইব্রাহিমখাঁ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাণী দুর্গাবতী ইব্রাহিম খাঁর সাহায্যার্থ স্বীয় প্রভূত সৈন্য সহ তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। বাজ্‌বাহাদুর যুদ্ধক্ষেত্রে রাণীকে এইরূপে সমাগত দেখিয়া যুদ্ধ-জয়ের আশা পরিত্যাগকরিয়াছিলেন এবং নিজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া মহাভীত হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাণীর চরণতলে পতিত হইয়া এই যুদ্ধে যোগ-দান হইতে বিরত হইবার জন্য রাণীকে সানুনয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাজ্‌বাহাদুরের মত উগ্রপ্রকৃতির লোকও, রাণীকে এতই ভয় করিতেন। খোয়াজাআবদুলমজিদ্‌-খাঁনামক এক ব্যক্তি সম্রাট আকবর সাহের বড়ই

প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দেওয়ানী বিভাগে একটি উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি স্বীয় কর্ম্ম-দক্ষতাগুণে সম্রাটের সন্তোষ উৎপাদন করায় দেওয়ানি বিভাগ হইতে যুদ্ধকার্য্য-বিভাগে সেনানায়ক-পদে সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্য-বর্দ্ধন বিষয়ে কয়েকটি প্রশংসাজনক উচ্চ রাজকার্য্য সম্পাদন করায় সম্রাটের নিকট হইতে "আস্‌ফ খাঁ" এই উপাধি এবং মালবদেশান্তর্গত কারানামক প্রদেশ "জাইগির" রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি মালবের অন্তর্গত পান্নানামক স্বাধীন রাজ্য অধিকার করিবার জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পান্না-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পান্নারাজ্য দিল্লীর অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইলে পর, রাণী দুর্গাবতীর রাজ্যে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। রাণী সে সময়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে স্বীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহকরিতেছিলেন। আসফ্ খাঁ, রাণীর এই মহাপ্রতাপ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সেই জন্য তিনি সহসা একটা অশুভ পরিণামের কার্য্য না করিয়া রাণীর রাজ্যে প্রবেশের জন্য ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাণী, আসফ্‌খাঁর এই ছিদ্রানুসন্ধান বিষয়ে প্রথমতঃ কোন লক্ষ্যই করেন নাই। কারণ, তিনি সম্রাট আকবর সাহকে অণুমাত্র ভয় করিতেন না। সম্রাটের কোন লোক যে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশের জন্য ছিদ্রানুসন্ধান

করিতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিতা ও স্বাধীনতা-প্রিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার অদম্য সাহসের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় রাজ্য পালনকরিতেন। তিনি এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, পান্নারাজ্যের মধ্যে সম্রাট আকবরের আসফ্-খাঁ নামক একজন কর্ম্মচারী বাস করিয়া থাকে মাত্র। সে ব্যক্তি তাঁহার কোন অনিষ্টই করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং তাহার কার্য্যে রাণী প্রথমতঃ ভ্রূক্ষেপই করেন নাই। সুচতুর আসফ্ খাঁ কিন্তু রাণীর রাজ্যে প্রবেশের উপায়-পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য রাণীর সহিত প্রথমতঃ সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপনকরিয়া রাণীর বিশ্বাসপাত্র হইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসফ্ খাঁ রাণীর রাজ্যমধ্যে প্রবেশ ও নির্গমের উত্তম উপায়-নির্দ্ধারণের নিমিত্ত সুদক্ষ গুপ্তচর এবং পণ্যদ্রব্য-বিক্রয়ের ব্যপদেশে বণিকগণকে প্রেরণকরিতে লাগিলেন। যখন তিনি এইরূপ উপায়ে রাণীর রাজ্যমধ্যে প্রবেশ ও নির্গমের পথ, রাণীর সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও দুর্গ-পরিখাদির বিবরণ, এবং কোষাগারে সঞ্চিত অতুল ধনরত্নাদির সম্বাদ অবগত হইলেন, তখন তিনি রাণীর রাজ্য জয়করিবার নিমিত্ত উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাণীর রাজ্যের সীমান্তের পরই তাঁহার জাইগিরের সীমা আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রথমে রাণীর রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশের

গ্রামস্থ প্রজাবর্গের ধন-শস্যাদি লুণ্ঠনকরিতে আরম্ভ করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি দিল্লী রাজধানীতে সম্রাট্ আকবর সাহকে রাণীর রাজ্য জয়করা সম্বন্ধে কোন বিষয়ই নিবেদন করেন নাই। কেবল নিজের ইচ্ছানুসারেই এই সকল কার্য্য করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি রাণীকে পরাজয়করিবার জন্য স্বীয় লিপি-চাতুর্য্যে নানাপ্রকারে সম্রাটকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। সম্রাট্, বার বাঁর এইরূপে প্ররোচিত হইয়া স্বীয় সাম্রাজ্য-বিস্তারের লোভ সম্বরণকরিতে না পারিয়া অবশেষে রাণীর রাজ্যের ধ্বংসের জন্য দিল্লী হইতে মালবদেশে প্রভূত সৈন্য-সামন্ত প্রেরণকরিলেন। রাণী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এ সকল বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি নিজের প্রবল-শক্তি ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে নিজরাজ্য প্রতিপালনকরিতেন, কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যতকাল জীবিত থাকিবেন, ততকাল তাঁহার রাজ্য জয়করিতে পারে, বর্ত্তমান কালে এমন লোক কেহই নাই। রাণীর এইরূপ গর্ব্ব, সাহস, উপেক্ষাভাব এবং স্বশক্তির উপরে একান্ত নির্ভরশীলতাই তাঁহার রাজ্য-ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার কোন দোষই ছিল না, কেবল এই টুকুই মাত্র দোষ ছিল। তিনি হটাৎ সম্বাদ পাইলেন যে, সম্রাট্ আকবরের বহুসংখ্যক সৈন্য

দামুদানামক তাঁহার অন্যতম নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সে সময়ে তাঁহার নিকটে বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কিন্তু, যে সময়ে তিনি হটাৎ শত্রুপক্ষীয় সৈন্য-সমাগম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার পাঁচ-শত মাত্র সৈন্য যুদ্ধার্থে সজ্জিত ছিল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অধরকায়স্থের উপরে তাঁহার রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল। অধর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হটাৎ মোগলসৈন্যের সমা গম-বার্ত্তা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, অধর, তোমার অদূরদর্শিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা-দোষেই এইরূপ ঘটনা ঘটিল। তুমি যদি রাজ্যের সকল বিষয়ে সম্যক্ অনুসন্ধান রাখিতে, তাহাহইলে হটাৎ এইরূপ বিপত্তি ঘটিত না। যাহাই হউক, এক্ষণে চিন্তা বা পরামর্শ করিবার অবসর নাই। বহুকাল পর্য্যন্ত আমার এই রাজ্য আমি স্বয়ং শাসনকরিয়া আসিতেছিলাম। কেবলমাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ তোমার হস্তে ইহার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আমি দুর্ব্বহ ভারের লাঘব-জনিত কিঞ্চিৎ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছিলাম। আমি যখন রাজ্যের সকল বিভাগের সমস্ত ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলাম, তখন এরূপ কলঙ্কজনক কোন ঘটনাই ঘটে নাই। এক্ষণে তোমার দোষেই আমার এইরূপ বিপত্তি ও অপমান ঘটিল। আজ যদি সম্রাট আকবর স্বয়ং আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

হইতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে যেরূপ বলা উচিত তাহা বলিতাম। কিন্তু এক্ষণে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে যুদ্ধ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায়ই নাই। আমরা ক্ষত্রিয়জাতি। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়জাতির মানরক্ষার একমাত্র উপায়। ক্ষত্রিয়রমণী যুদ্ধে ভয় পায় না। শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। উহাতে আমরা ভীত হই না। ভয় কাহাকে বলে তাহা আমি জানিই না। এই কথা বলিয়া রাণী দুর্গাবতী সম্রাট-সৈন্যের গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চারিদিকে চারিটি অভিযানের আদেশ প্রদান করিলেন। কতিপয় সৈন্য ও প্রধান মন্ত্রী অধর কায়স্থ তাঁহার সঙ্গে রহিল। তৎকালে ভারতে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকেও যুদ্ধ করিতে হইত। মন্ত্রীর কেবলমাত্র মন্ত্রণানৈপুণ্য থাকিলেই চলিত না। এই সময়ে এক গুপ্তচর রাণীর নিকটে সহসা উপস্থিত হইয়া বলিল যে, আসফ্ খাঁ বহু সৈন্য সহ দ্রুত-বেগে দামুদা পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গিয়াছেন। আর বেশী দূরে অগ্রসর হইতেছেন না। তথায় বিলম্ব করিতে-ছেন। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার এই বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারা গেল না। রাণী এই কথা শুনিয়াই এই সুযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহকরিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে চারি হাজার অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহকরিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহাকে বলিলেন

যে, আপাততঃ যে পরিমিত সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্বারা শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভকরা যাইতে পারে। এতদপেক্ষা আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটি সুগুপ্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি করাই এক্ষণে আপনার পক্ষে উচিত। রাণী এইরূপ মন্ত্রণায় সম্মত হইলেন এবং এক নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে কতিপয় সৈন্য সহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রাজ্যস্থ নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যেও তাঁহার অনেক দুর্ভেদ্য গুপ্ত সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। তিনি ঐরূপ একটা দুর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং শত্রুপক্ষের গতি-বিধির অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। আসফ্‌খাঁ অনেক অনুসন্ধান করিয়া যখন রাণীর গতি-বিধির কোন সন্ধানই পাইলেন না, তখন তিনি নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে রাণীর অনুসন্ধান করা বৃথা, এইরূপ ভাবিয়া রাণীর রাজধানী গঢ়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম নগরাদি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রাণী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জঙ্গলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা পাঁচ হাজার অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আসফ্‌খাঁ গঢ়া অভিমুখে যাইতেছে, এই সম্বাদ পাইবামাত্র রাণী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসফ্‌ খাঁর গতিরোধের জন্য সসৈন্যে গঢ়াভিমুখে ধাবিত

হইলেন। গড়ায় আসিবার সময় তিনি স্বীয় সৈন্যের মধ্যভাগে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সৈন্যগণকে সময়োপযোগী জাতীয় সঙ্গীত ও উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দ্বারা যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তেজক বাক্য শ্রবণকরিয়া সৈন্যদিগের সাহস চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পথে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিল। এবং উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রাণী এই ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিন শত মোগলসৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল এবং বহুসংখ্যক মোগলসৈন্য অত্যন্ত আহত হইয়াছিল। রাণীর অতি অল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। মোগলসৈন্য রাণীর সৈন্যের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। রাণী ও তাঁহার সৈন্যগণ ঐ পলায়মান মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বহুদূর অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কতকগুলি সৈন্যকে নিহত করিলেন এবং কতিপয় আহত প্রধান প্রধান সেনানীকে বন্দী করিয়া গড়ায় আনয়ন করিলেন। আসফ্‌খাঁ প্রাণভয়ে যে, কোনদিকে পলায়ন করিলেন, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। আসফ্‌খাঁর এই পরাজয়বার্ত্তা দিল্লীতে

সম্রাট্ আকবরের নিকটে যথা সময়ে পৌঁছিল। সম্রাট একটি হিন্দু বিধবার এইরূপ অসাধারণ পরাক্রম এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব রণনৈপুণ্য শ্রবণকরিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রসভাতুল্য দরবারে যে সকল "পাঁচ হাজারী" ও "দশ হাজারী"— পঞ্চসহস্রসৈন্যনায়ক এবং দশসহস্রসৈন্যনায়ক আমীর ওমরাহগণ বসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্বোধনকরিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনারা হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া কোন শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের এইরূপ বীরত্বের কথা পাঠ করিয়াছেন কি? আমীর ও ওমরাহগণ বলিলেন "না, খোদাবন্দ, আমারা কখনই এমন অদ্ভুতবার্ত্তা শ্রবণকরি নাই।" কোন কোন নানাসংবাদজ্ঞ সভাসদ বলিলেন, খোদাবন্দ, "শুনা গিয়াছে যে, হিন্দুদের ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রসেনানাম্নী রমণী ঘোটকে আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহাদের "চণ্ডী"তে লিখিত আছে যে, হৈমবতীনাম্নী এক রমণী অষ্ট নায়িকার সহিত সম্মিলিত হইয়া চণ্ড-মুণ্ড রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি ভীষণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা প্রাচীন যুগের কথা। উহা কেহ বিশ্বাস করে, কেহ বা বিশ্বাস করে না। কিন্তু হিন্দু-দিগের এই কলিযুগে স্ত্রীলোকের এইরূপ যুদ্ধজয়কাহিনী কোন দেশে কখনও কেহ শুনে নাই। ইহা বড়ই

বিস্ময়জনক কথা !" সম্রাট আকবর ও তাঁহার পারিষদগণ এইরূপে রাণী দুর্গাবতীর বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাণীর প্রশংসায় সমস্ত দরবারগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আসফ খাঁর পরাজয়-জনিত অপমানের কথা ক্ষণকালের জন্য সকলেই যেন ভুলিয়া গেলেন। সকলেই আকবর সাহ-কৃত রাণীর প্রশংসায় যোগদান করিলেন। ভারতমহিলার এইরূপ বীরত্বের প্রশংসায় আকবরের ন্যায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপী সম্রাটের দরবার মুখরিত হইয়াছিল, ইহা একবার মনে করিলে কোন্ হিন্দু না আনন্দে পুলকিত হয়েন ? আসফ্খাঁ পরাজিত হইয়া দিল্লীতে সম্রাট্-সমীপে এই যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং পুনরায় রাণীর রাজ্য আক্রমণকরিবার জন্য অধিকসংখ্যক সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্, আসফ্খাঁকে লিখিলেন—"আবদুলমজিদ্, কয়েকটি যুদ্ধে তোমার শৌর্য্য-বীর্য্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে "আসফ্ খাঁ" এই উচ্চ উপাধি ও মালবদেশে জাইগির প্রদান করিয়াছিলাম। তুমি যখন ঐ হিন্দু বিধবার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার মত লোকের পক্ষে সামান্য হিন্দু বিধবার ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণকরা অতি সহজ ব্যাপার। তাই আমি তখন তোমাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন তুমি ঐ হিন্দু বিধবার

পরাক্রম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কর নাই। আমি যদি তখন ইহা জানিতে পারিতাম যে, ঐ মহিলা সামান্য অবলা নয়, কিন্তু ঐ মহিলা, বাজ্ বাহাদুরের মত দুর্দ্দান্ত লোককেও ভীত চকিত করিয়া স্ববশে রাখিতে পারে, তাহা হইলে আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার রাজ্য-আক্রমণের নিমিত্ত তোমাকে অনুমতি দিতাম এবং আরও অধিকসংখ্যক নিপুণতর সৈন্য প্রেরণ করিতাম। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। একটা হিন্দু বিধবার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আসফ্খাঁ-পরিচালিত সম্রাট-সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, একথা আমার ইতিহাস-লেখকগণ তাহাদের ইতিহাসে লিখিবেই লিখিবে। তাহারা স্ব স্ব-প্রণীত ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে আমার এই পরাজয়-কলঙ্ক চিত্রিত করিবে ইহা নিশ্চয় জানিও।”

সম্রাট, আসফ্খাঁর নিকটে পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক সমরকুশল সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সম্রাট্-সৈন্য যথা সময়ে দিল্লী হইতে আসফ্ খাঁর নিকটে গিয়া পৌঁছিল। আসফ্ খাঁ এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া পুনরায় বিজয়ের জন্য গড়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্রাট-সৈন্য প্রবল নদী-প্রবাহের ন্যায় গড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী দুর্গাবতী সম্রাটের এত অধিকসংখ্যক সৈন্যের সমাগমেও, ভীত বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। নিজের সর্দ্দার-

গণকে আহ্বান করিয়া এত অধিকসংখ্যক সম্রাট-সৈন্যের সহিত কিরূপ কৌশলে যুদ্ধ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিলেন। যিনি যতসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, তাঁহাকে তদ্রূপ সৈন্যের অধিনায়কতা করিতে আদেশ দিলেন। সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বে একবার সম্রাট-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া রাণী ও তাঁহার সর্দ্দারগণ সকলেই বিজয়মদে মত্ত, উৎফুল্লহৃদয়, এবং নির্ভীক হইয়াছিলেন। রাণীর ত্রয়োদশবর্ষীয় একমাত্র পুত্র কুমার বীরনারায়ণ সাহ বালক হইলেও, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাণী দুর্গাবতী স্বীয় প্রিয় হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া ভগবতী ভীমা চামুণ্ডার ন্যায় শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের ধ্বংসের জন্য রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রাণী, যুদ্ধোন্মাদক সাহস-উদ্দীপক কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উত্তেজক স্বদেশের জাতীয়সঙ্গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া স্বীয় সৈন্য ও সেনানীগণকে যুদ্ধার্থে অধিকতর প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক কুমার বীরনারায়ণের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করিয়া মোগলসৈন্য সকল স্তম্ভিত হইতে লাগিল। তাহারা এই বালকের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সমস্তদিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষে

জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণকরা কঠিন হইয়া পড়িল। যখন সায়ংকাল উপস্থিত হইল, তখন রাণী প্রধান প্রধান কতিপয় সেনানী সর্দ্দারকে তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য যুদ্ধসময়োচিত ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা রাণীর নিকটে উপস্থিত হইলে রাণী সে সময়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। যাঁহার যাহা মত, তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন। রাণী সকলের কথা শুনিয়া এই মত প্রকাশ করিলেন যে, সম্প্রতি সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া নিজেদের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃকল্প। পরে রাত্রিযোগে শত্রুগণকে সহসা আক্রমণ করিয়া অনায়াসে বিধ্বস্ত করিতে পারা যাইবে। নতুবা আমার এত অল্পসংখ্যক সৈন্যের পক্ষে এত অধিকসংখ্যক শত্রুপক্ষীয় সৈন্যকে পরাজয়করা অসম্ভব। অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা অধিক-সংখ্যক সৈন্য জয়করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। অনেক যুদ্ধে অনেকেরই এইরূপেই জয়লাভ হইয়াছে। আর যদি আপনাদের মধ্যে কেহ এ সময়ে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক না হয়েন, তাহা হইলে যতক্ষণ রাত্রি প্রভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধ চালাইতে হইবে। রাত্রে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যকে আক্রমণ না করিয়া পরদিন প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করা যাঁহাদের মত, তাঁহারা ভ্রান্ত। রাত্রে আমরা যদি হটাৎ অতর্কিতভাবে শত্রু-

সৈন্যকে আক্রমণ না করি, তাহা হইলে কল্য প্রভাতে আসফর্খা নিশ্চয়ই গড়া দখলকরিয়া বসিবে। ইহাই আমার ভবিষ্যৎ বাণী। আমার কথানুযায়ী কার্য্য না করিলে পশ্চাৎ আপনাদিগকে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া রাণী রাত্রে হটাৎ শত্রুসৈন্য আক্রমণকরিবার অভিপ্রায়ে তখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া স্বীয় শিবির অভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কতিপয় ভ্রান্ত অল্পবুদ্ধি সেনানী সর্দ্দার তাঁহার কথার সারবত্তা উপলব্ধি না করিয়া তখনও মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহারা রাণীর সহিত শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আরও কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ চালাইয়া পরে তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন এবং পরদিন প্রভাতে পুনরায় মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া মোগলসৈন্যাধ্যক্ষকে জানাইলেন। তাঁহারা রাণীকে অনুসরণ করিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধেই ব্যাপৃত রহিলেন। সুতরাং রাণীর সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একভাগ রাণীকে অনুসরণ করিল। অপরভাগ যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিল। রাজা বা রাজ্ঞীর কথা না শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, বা সেনানীগণ, স্ব স্ব-মতানুযায়ী কার্য্য করায় ও একমতাবলম্বী না হওয়ায় কয়েক শতাব্দী হইতে ভারতের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া আসিতেছিল, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

রাত্রে মোগলসৈন্যকে হটাৎ আক্রমণকরা বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। সুতরাং রাত্রে হটাৎ মোগল সৈন্যকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণকরা হইল না। রাণী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্ব-শিবিরে চলিয়া আসিলেও তাঁহার যে সকল সেনানী তাঁহাকে অনুসরণ না করিয়া তখন শত্রু-পক্ষের সহিত যুদ্ধেই ব্যাপৃত রহিলেন, তাঁহারা পরদিন প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধ করিবেন এই প্রায়, যুদ্ধ ঘটিত সঙ্কেত-বিশেষের দ্বারা আসফখাঁকে জানাইলেন। তদনুসারে যুদ্ধ থামিল। রাণীর কতিপয় সেনানীর পরস্পর তর্ক-বিতর্কেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রাণীর ভবিষ্যৎ বাণী ফলিল। রাণীর সৈন্যের ক্রমশঃ পরাজয় ঘটিতে লাগিল। আসফ্খাঁ গঢ়া আক্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিক মোগলসৈন্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ফেলিলেন। রাণীর সৈন্য বাধা দিতে পারিল না, ক্রমশঃ দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। রাণী এই দৃশ্য দর্শনে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসফখাঁকে বধকরিবার জন্য কতিপয় বিশ্বস্ত আজ্ঞাপালক সেনানী সর্দ্দার ও তৎপরিচালিত সৈন্য-মণ্ডলীর সহিত তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই সময় তিনি প্রধান মন্ত্রী অধর কায়স্থকে নিজ হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার জন্য আদেশ করিলেন। তৎকালে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। কামানের বৃহৎ বৃহৎ

ভীষণ গোলা ও তীক্ষ্ণবাণে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে রাণীর পুত্র গড়ামণ্ডলের ভাবী অধিপতি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক কুমার বীরনারায়ণ সাহ অমিত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের এইরূপ যুদ্ধনৈপুণ্য ভারত-ইতিহাস ছাড়া অন্য কোন দেশের ইতিহাসে কেহ অবগত হইয়াছেন কি? "ভারত কাপুরুষের দেশ" এইরূপ কথা মুখে আনিতে কেহ সাহসী হইবেন কি? এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত রাণীর সৈন্যের সহিত মোগলসৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। ত্রয়োদশ-বর্ষীয় বালক কুমার বীরনারায়ণ তিন তিন বার মোগল সৈন্যকে বাধা দিয়া—যূথভ্রষ্ট ও বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া অবশেষে একটা গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আহত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। রাণী এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আহত কুমারকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবিরস্থ চিকিৎসাগারে নিরাপদে বহন করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত কতিপয় ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্যবর্গ রাণীর এই আদেশ যখন প্রতিপালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাণীর অধিকসংখ্যক সৈন্য রাণীর নিকট হইতে হটাৎ ইতস্ততঃ অপসৃত হইয়া পড়িল। মাত্র তিন হাজার সৈন্য তাঁহার নিকটে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও রাণী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

পলায়ন করেন নাই। প্রত্যুত দৃঢ়তার সহিত মহা-পরাক্রমের সহিত তাদৃশ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসফ্-খাঁর বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাছে, রাণীর অল্প সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, এই আশঙ্কায় রাণী তাহাদিগকে প্রবলরূপে যুদ্ধ চালাইবার জন্য জাতীয় সঙ্গীত-গানে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্দ্দৈব বশতঃ হটাৎ একটা তীক্ষ্ণ বাণ আসিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল। রাণী তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে উঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু উহার ফলকটি ক্ষতস্থানের ভিতরে রহিয়া গেল। যেই মাত্র এই বাণটি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ হটাৎ আর একটি বাণ আসিয়া তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হইল। তিনি এই বাণটিও পূর্ব্ববৎ টানিয়া বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গলদেশ হইতে অবিরল রুধিরধারা বহিতে লাগিল বলিয়া তিনি ক্ষীণ-রক্তা হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষতস্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা-বোধ হওয়ায় তিনি কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে অধর কায়স্থের চেষ্টায় চৈতন্য লাভকরিয়া অধরকে বলিলেন, "অধর, তুমি সর্ব্বদাই আমার উপদেশানু-যায়ী কার্য্য করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদা আমার আদেশ পালন করিয়াথাক বলিয়া তুমি আমার বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছ। আমি কখনই তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই। কিন্তু অদ্য এক্ষণে তুমি যদি আমার আদেশ অনুসারে

একটি কার্য্য না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এক্ষণে আমার পরমশত্রু বলিয়া মনে করিব”। অধর রাণীর এইরূপ অভূতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, “মা, আমি আপনার কার্য্যের জন্য মুহূর্ত্তমধ্যে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি। কি কার্য্য করিতে হইবে আদেশ করুন”। অধর রাণীর কার্য্য সম্পাদনের জন্য আদেশ প্রার্থনা করিল বটে, কিন্তু অধরের পক্ষে তাদৃশ কার্য্য সাধন-করা অত্যন্ত অসম্ভব। রাণী বলিলেন “অধর, আমার শরীর হইতে যেরূপ রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে, অন্য লোক হইলে এতক্ষণে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। আমি কঠিন-প্রাণা, তাই এখনও জীবিত আছি। আমার অন্যান্য সেনানী সর্দ্দারগণ গতকল্য আমার আদেশ পালন না করায় আমার ভবিষ্যৎবাণী ফলিল। আমার পরাজয় ঘটিল। পরাজয় ঘটায় যদি আমার দেহ শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, যদি আমি বন্দীকৃত হই, তাহা হইলে তাহারা আমার প্রতি নানা অত্যাচার করিবে, সেই অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা ভারতের সতী পতিব্রতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠা কুলমহিলার পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ। তাই বলিতেছি, অধর, আমার এই তরবারিটি গ্রহণকর, এবং ইহাকে একবার উত্তোলন করিয়া ইহারদ্বারা আমার মুণ্ডটি ছিন্ন করিয়া ফেল। এবং ঐ মুণ্ড সমেত আমার দেহটি শ্মশানে লইয়া গিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে দগ্ধ করিও। শত্রু-সৈন্য যেন আমার মৃতদেহ

স্পর্শ করিতে না পারে”। অধর এই কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। অধর বলিল, “মা, এতদিন যে হস্তে আপনার চরণ-সেবা করিয়াছি, যে হস্তে আপনার লবণ খাইয়াছি, লিপি-জীবী সৎকায়স্থের বংশে জন্মিয়া শেষটা কি, সেই হস্ত দ্বারা মাতৃহত্যা করিয়া দুস্তর মহাপাপ-পঙ্কে মগ্ন হইব? মা, আমাকে এরূপ আদেশ করিয়া কেন আমাকে মহাপাপ-পঙ্কে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছেন? মা, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পুত্র হইয়া মার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিব না। মা, চলুন, আমরা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া স্ব স্ব মান প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষাকরি। আসফ্‌খাঁর সহিত যখন আমাদের প্রথমবার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে আসফ্‌খাঁ যেমন রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, তদ্রূপ আমরাও এক্ষণে পলায়নের চেষ্টা পরিতে পারি”। অধরের এইরূপ কথা শুনিয়া রাণী বলিলেন, “অধর, ভারতের ক্ষত্রিয়-কন্যা দুর্গাবতী তদ্রূপ কার্য্য করিতে কখনই পারিবে না। ক্ষত্রিয়-কন্যা প্রাণ অপেক্ষা মানকেই পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য করে। মানরক্ষার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞানকরে। সেইবার যুদ্ধে আসফ্‌খাঁ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পলায়নোদ্যত হইলে আমরা শত্রুসৈন্যের অনুসরণ করিয়াছিলাম। অনেক শত্রুসৈন্য ধৃত নিহত ও বন্দীকৃত হইয়াছিল। আমরাও এবার শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক তদ্রূপ ধৃত

নিহত ও বন্দীকৃত হইতে পারি। পলাইলেই যে, প্রাণরক্ষা ও মানরক্ষা হইবে, এ বিষয়ে কোনই স্থিরতা নাই। আমি বীরকন্যা বীরপত্নী ও বীরপ্রসবিনী ও বীরজাতীয়া হইয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে চাই না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন হইলেই ক্ষত্রিয়জাতির স্বর্গে গমন হয়। অধর, শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক আমার মুণ্ড চ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক আমার দেহ স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, এই দেখ, আমার মুণ্ড চ্ছিন্ন হইল,” এই বলিয়া রাণী স্বীয় তরবারি দ্বারা স্বীয় মুণ্ড চ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরের ন্যায় মরিলেন। স্বর্গে গেলেন। অধর রাণীর এইরূপ মুণ্ড-চ্ছেদ দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

রাণীর অভাবে রাণীর অবশিষ্ট সৈন্যগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। প্রভুর অভাবে ভৃত্যের যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাই ঘটিল। রাণীর অবশিষ্ট সৈন্য রাণীর মুণ্ড সমেত দেহটি লইয়া অধর কায়স্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। শত্রু-সৈন্য যুদ্ধ-জয়ে উৎফুল্ল হইয়া গড়া-দুর্গ আক্রমণ ও দুর্গমধ্যে সঞ্চিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিবার জন্য সেই দিকেই সকলে ধাবিত হইল। রাণীর মৃত্যুর পর মোগলসৈন্য রাণীর মৃতদেহ-অন্বেষণের জন্য যত্নবান হইল না। সুতরাং এই অবসরে রাণীর সৈন্য রাণীর মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া উহার সৎকার করিল। এদিকে মোগলসৈন্য গড়া-দুর্গ আক্রমণকরিয়া লুণ্ঠন করিতে

লাগিল। রাণীর ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র কুমার বীরনারায়ণ সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া প্রথম স্বীয় শিবিরের চিকিৎসাগারে আনীত হইয়াছিলেন। তথায় তৎ-সময়োচিত চিকিৎসার পরই চৌড়াগড়-দুর্গে নীত হইয়া-ছিলেন, এবং সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। আসফ্ খাঁ গড়া-দুর্গ আক্রমণ করিয়া তথায় সঞ্চিত অতুল ধনরাশি, এক সহস্র বৃহৎ বৃহৎ হস্তী এবং বহু যুদ্ধোপ-করণ বস্তু লুণ্ঠন করিয়া তদানীং স্ব-সৈন্য সহ স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহার দুইমাস পরে রাণীর চৌড়াগড়-দুর্গ আক্রমণকরিবার জন্য আসফ্ খাঁ বহু সৈন্য সহ তদভি-মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি চৌড়াগড়-দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইলে বালক বীরনারায়ণ তাঁহার আক্রমণে বাধা দিবার জন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। পুনরায় উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। উভয়পক্ষের অনেকে হতাহত হইল। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের বীরত্ব-দর্শনে প্রৌঢ় আসফ্ খাঁ বিস্মিত হইয়া গেলেন। এবার মোগলসৈন্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বালক বীর নারায়ণ বাধা দিতে অসমর্থ হইলেন। এবং অবশেষে তিনি এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। আসফ্ খাঁ দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকারকরিল। ইংরাজ ও পারসিক ঐতিহাসিকগণ চৌড়াগড়-দুর্গ-সঞ্চিত ধনরাশির যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। উহা অতি-

রঞ্জিত নয়। এই দুর্গে অসংখ্য অমূল্য বা অতি দুর্ম্মূল্য বৃহৎ বৃহৎ হীরক মুক্তা পান্না ও মাণিক্য প্রভৃতি রত্ন ছিল। সুবর্ণ-নির্ম্মিত বহু সহস্র বৃহৎ বৃহৎ থালা, ঘটী, বাটী, এবং অসংখ্য মোহরে পূর্ণ শত শত বৃহৎ বৃহৎ সুবর্ণকলস, এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত অনেক বৃহৎ বৃহৎ দেব-দেবীর মূর্ত্তি সঞ্চিত ছিল। এই সকল এবং অন্যান্য বহু দুর্ম্মূল্য বস্তু বহুপুরুষানুক্রমে তথায় সঞ্চিত হইয়াছিল। আসফ্খাঁ এই সমস্ত বস্তু লুণ্ঠনকরিয়া স্বস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, আসফ্খাঁ এই সকল বস্তু দিল্লীতে সম্রাট-সমীপে না পাঠাইয়া নিজেই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। লুণ্ঠিত এক সহস্র হস্তীর মধ্যে দুইশত মাত্র হস্তী দিল্লীতে সম্রাট-সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। সুবর্ণ রৌপ্য ও মণিমাণিক্যাদি পদার্থ কিছুই প্রেরিত হয় নাই। সে সমস্ত বস্তু আসফ্-খাঁর নিজ কোষাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। সম্রাট, হস্তী ভালবাসিতেন বলিয়া আসফ্খাঁ ২ শতমাত্র হস্তী দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কিছুই প্রেরণ করেন নাই। উদারহৃদয় উন্নতচেতাঃ সম্রাট্ আকবর সাহ এই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিষয়ে বিশেষরূপ কোন সম্বাদ লইতেন না। এ সকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। সেই জন্যই তাঁহার প্রাদেশিক সুবেদার বা নবাবগণ প্রভূত ধন সঞ্চয়করিতে সমর্থ হইতেন। আসফ্খাঁ গড়ামণ্ডলা জয়করিয়া তথায় কয়েকদিন সৈন্য সহ অবস্থিতি করিয়া-

ছিলেন। তারপর যখন সম্রাট্, খাঁজমান্-নামক দুর্দ্দম্য ব্যক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য জৌন্‌পুর অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আসফখাঁ রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য ত্যাগকরিয়া স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে কুমার বীরনারায়ণ ও তাঁহার সামন্ত সর্দ্দারগণ একে একে যুদ্ধে নিহত হইলেন। চৌড়াগঢ়-দুর্গ আক্রান্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুর্গের অন্তঃপুরবাসিনী রাজকুল-মহিলারা এই পরাজয়-সম্বাদ অবগত হইলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে শত্রুহস্তে পতিত হইয়া তাঁহারা বন্দীকৃত হইবেন, এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম, সতীত্ব, ও মান রক্ষা-করিবার জন্য নিজেরাই অতি ক্ষিপ্রহস্তে পর্ব্বতসম কাষ্ঠস্তূপ সাজাইয়া চিতা প্রস্তুতকরিতে লাগিলেন।

যাহাতে ঐ চিতাগুলি অতি শীঘ্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তজ্জন্য উহাতে রাশি রাশি শুষ্কতৃণ, (খড়্) তুলা, ও ঘৃত প্রভৃতি বস্তু সংযোজিত করিলেন। এবং যখন ঐ চিতা-গুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাঁহারা উহাতে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব সতীত্ব ধর্ম্ম ও মান-রক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। চিতাগ্নির উজ্জ্বল শিখায় চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সে অগ্নি দাবানলকেও পরাভূত করিয়াছিল। ঐ ভীষণ প্রলয়াগ্নির শিখা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য বহু মোগলসৈন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল

না। দুর্গের ঐ ভাগে তাহারা অগ্রসর হইতেই সমর্থ হইল না। পরদিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত ঐ ভয়ঙ্করী চিতাগ্নিশিখা দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, রাণী দুর্গাবতীর প্রতাপ-সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতমহিলার স্বাধীন রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। ঐরূপ ভীষণ অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতের সেই প্রদেশের পবিত্রতা রক্ষিত হইয়াছিল। বীরনারী-প্রসবিনী ভৈরবীরূপিনী ভারতজননীর পবিত্রতম অঙ্গে ঐরূপ পবিত্রতম চিতাভস্মলেপই শোভা পায়। ভারতের রাণী দুর্গাবতীর আত্মসম্মানের জ্ঞান ছিল, শিক্ষা ছিল, সাহস ছিল, বল ছিল, পরাক্রম ছিল, ঈশ্বরে ভক্তি ছিল, এবং তাঁদৃশ রাশি রাশি সুবর্ণ ও মহামূল্য রত্নাদি ছিল বলিয়াই তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও, অনাথা বিধবা হইয়াও, পুরুষের ন্যায় স্বাধীনরাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, এবং নিজের ক্ষুদ্র গঢ়ামণ্ডলা-রাজ্যের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপী "জগদীশ্বর", উপাধিধারী সম্রাট্ আকবর সাহের সমুদ্র-তরঙ্গতুল্য তাদৃশ বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত নিজের তাদৃশ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। আসফ্- খাঁর মত রাজনীতি-চতুর সুবেদার বা প্রাদেশিক শাসককেও প্রথমবার যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এবং বাজ্‌বাহাদুরের মত দুর্দ্দম্য ব্যক্তিকেও স্ববশে রাখিতে

পারিয়াছিলেন। তাঁহার কতিপয় সেনানী যদি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সায়ংকালের পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া রাত্রিকালে শত্রুপক্ষকে হটাৎ আক্রমণ করিত, তাহা হইলে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও রাণী আসফ্‌খাঁর পরিচালিত সম্রাট-সৈন্যকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। তিনি সম্রাট্ আকবরের সহিত বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে সমর্থা না হইলেও যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিত, ততক্ষণ তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে কখনই ক্ষান্ত হইতেন না। ভারত ছাড়া এরূপ অদ্ভুত আত্ম-সম্মানজ্ঞা স্বাধীনতা-রক্ষণ-ব্রতে দীক্ষিতা রাজনীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা মহিলা অদ্যাপি পৃথিবীর অন্য কোন অংশে জন্মগ্রহণ করে নাই।

রাণীভবানী।

রাণীভবানী বঙ্গের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন্-গ্রামে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। আত্মারাম চৌধুরী নবাবী আমলের একজন মান্য গণ্য ধনী ও প্রতিষ্ঠাশালী জমিদার ছিলেন। এখনও ছাতিন্-গ্রামের স্থানে স্থানে তাঁহার প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাণীভবানী নিজের জন্মস্থানের চিহ্ন-স্বরূপ তথায় একটি দেবতা-মন্দির নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন।

এবং ঐ মন্দিরের মধ্যে নিজের মাতার নামানুসারে জয়-দুর্গা নামে একটি দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের নিকটে রাণী ভবানীর একটি বৃহৎ কামান ছিল। কামানটি বহুকাল পর্য্যন্ত তথায় ঐ ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কি জন্য তথায় ঐ কামানটি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন নবাবী আমলের নানাবিধ দস্যু-তস্করাদির ভয় হইতে পিতাকে রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয়, রাণীভবানী পিত্রালয়ে একটি কামান রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন রাজা মহারাজ না হইলেও একজন প্রভূতসম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার ধন প্রাণ মান-রক্ষার্থ একটি কামানের প্রয়োজন হওয়ায় উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। যে সময়ে বাহুবল বা "যার লাঠি তার মাটী" এই নীতিমন্ত্র ও ষড়যন্ত্রই লোকের সৌভাগ্য-লাভের একমাত্র উপায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর রাজ্য-বিপ্লবের যুগে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী অর্দ্ধশতাব্দীকাল অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী হইয়া মহাপ্রভাবে ও প্রখরপ্রতাপে অর্দ্ধবঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। একটি বাঙ্গালী বিধবা ব্রাহ্মণীর পক্ষে সেই সময়ে তাদৃশ বিস্তৃত রাজ্য শাসনকরা মহাগৌরবের বিষয়। যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানি ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের সুযোগ-অনুসন্ধানের ছলে কলিকাতা ও

মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের কুঠী সংস্থাপনকরিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জনকরিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই সম্প্রদায়-সংপৃক্ত হল্‌ওয়েল্‌নামক একজন সাহেব বঙ্গের তৎকালীন অবস্থা স্বয়ং স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণকরিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-পাঠকগণের নিকটে হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের নাম সুপরিচিত। হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব স্বীয় "ইণ্টরেষ্টিংহিষ্টরিক্যাল্‌ইভেণ্টস্‌"নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "রাণীভবানীর রাজ্যের বার্ষিক আয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ছিল।" তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা নবাব সরকারে রাজস্ব দিতে হইত। গ্র্যাণ্ট্‌ সাহেব স্বীয় "য়্যানালিশিস্‌ অব্‌ ফাইন্যান্‌সেস্‌ অব্‌ বেঙ্গল"নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশে এমন কি সমুদয় ভারতবর্ষেও, রাজসাহীর ন্যায় এত বড় জমিদারী আর কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তও, নদীয়া মুর্শিদাবাদ যশোহর বীরভূম ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভকালেও রাজসাহীর আয়তন ১২৯০৯ বর্গমাইল স্থিরীকৃত হইয়াছিল।" রাণী-ভবানীর পিতা আত্মারাম চৌধুরী, কন্যার অষ্টমবর্ষবয়সে নাটোরের মহারাজ রামজীবনের পুত্র মহারাজকুমার রামকান্তের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বয়সে কন্যাদানকে শাস্ত্রে "গৌরীদান" কহে। দিঘাপতিয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, নাটোর-রাজ-

বংশের প্রধান মন্ত্রী, ইতিহাস-বিখ্যাত বুদ্ধিমান, সুচতুর দয়ারাম রায় এই বিবাহের প্রধান যোজক ছিলেন। রাণী ভবানীর বিবাহের লগ্ন-পত্রে ইঁহার নাম ছিল। রাণী ভবানীর বিদ্যা বুদ্ধি সচ্চরিত্র ও রাজ্যশাসন-পদ্ধতির ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-বর্ণনার পূর্ব্বে নাটোর-রাজবংশের পরিচয় প্রদান করা উচিত। নাটোর, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি নগর বিশেষ। মহারাজ রামজীবন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা মহারাজ রঘুনন্দন রায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই ভ্রাতৃদ্বয় স্বনামধন্য পুরুষ। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায়ের জমিদারীর প্রভু হইয়াছিলেন। ইঁহাদের পিতা কামদেব মৈত্রেয় রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়ার তৎকালীন মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে অতি সামান্য বেতনে পরগণে লস্করপুরের অন্তর্গত বারইহাটী গ্রামের "তহশীল"-আদায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামজীবন রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম নামে তাঁহার তিনটি পুত্র পুঁটিয়া-রাজধানীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। তৎকালে অনেকেই সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকরিতেন। যাঁহারা নবাব-সরকারে বা কোন জমিদার-সরকারে চাকরি করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহারা আরবি পারসিক ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষাকরিতেন। তৎকালে যিনি আরবি ও পারসীক ভাষায় বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপত্তি লাভকরিতে পারিতেন, তিনি চেষ্টা করিলে

উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। পুঁটিয়ার মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয়করিতেন। তিনি স্বীয় রাজধানী পুঁটিয়ায় বহুসংখ্যক টোল সংস্থাপনকরিয়াছিলেন। ঐ সকল টোলে নানাশাস্ত্র-অধ্যাপনের জন্য বহুদেশের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে পুঁটিয়ায় আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে আর্থিক সাহায্য করিতেন। তৎকালে বঙ্গের নগরে নগরে ও বড় বড় গণ্ডগ্রামে অনেক পারসীক-বিদ্যালয় ছিল। পুঁটিয়ায়ও অনেক আরবি-পারসীক-বিদ্যালয় ছিল। মুসলমান মৌলবীর ন্যায় অনেক নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থও. তৎকালে বঙ্গদেশে অতি উত্তমরূপে আরবি ও পারসীক ভাষা অধ্যাপন করিতে পারিতেন। তৎকালে পুঁটিয়া, রাজসাহী জেলার মধ্যে সংস্কৃত ও পারসীক ভযা-শিক্ষার কেন্দ্রস্থান ছিল। পুঁটিয়ার রাজ-"তহশীলদার" কামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামজীবন ও মধ্যমপুত্র রঘুনন্দন পুঁটিয়ায় থাকিয়া সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভকরিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থাতেই তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দুই ভাই অতি অল্প বয়সেই পুঁটিয়ার রাজ-সরকারে একজন রাজকীয়-ব্যবস্থাশাস্ত্রবিৎ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে ও আর একজন রাজ-কার্য্যাধ্যক্ষের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উচ্চ প্রতিভার

সহিত জনশ্রুতির চিরসংস্রব। প্রতিভাবান রামজীবন ও রঘুনন্দনের সম্বন্ধেও, একটি কৌতূহলজনক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, তাঁহারা দুই ভাই পূর্ব্বে পুঁটীয়া-রাজবাটীর দেবালয়ে পূজকের কার্য্য করিতেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় ক্লান্ত শ্রান্ত অন্যতর ভ্রাতা ঐ দেবালয়ের উদ্যানমধ্যে একটি বৃক্ষের স্নিগ্ধঘনপল্লবের সুশীতল-ছায়াপূর্ণ তলে শয়নকরিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু রৌদ্র, ঐ বৃক্ষের শাখা-পল্লবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক্ পাইয়া ঐ বালকের মুখের উপরে আসিয়া পড়িল। সেই সময়ে এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প ঐ রৌদ্রোত্তাপ-নিবারণের জন্য বৃহৎ ফণা বিস্তারকরিয়া উহার দ্বারা বালকের মস্তকোপরি ছত্র-ধারণের কার্য্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে পুঁটিয়ার মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর পূজা-সমাপনান্তে দেবমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ঐরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন। তিনি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ভৃত্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাগত লোকের কোলাহলে ভীত হইয়া ঐ সর্পটি সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ নিদ্রিত বালকের নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহাকে নিজ-নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, "অদ্য তোমার যেরূপ একটা মহাসুলক্ষণ

দেখিলাম, তাহাতে এই বোধ হইতেছে যে, কালে তুমি একটা খুব বড় রাজা হইবে। সর্প যাহার মস্তকের উপরে ফণা বিস্তারকরিয়া রৌদ্রোত্তাপ নিবারণকরে, সে, কালে চক্রবর্ত্তি-তুল্য রাজা হয়। তুমি যদি কালে একজন ঐরূপ রাজা হও, তাহা হইলে পুঁটিয়ার রাজবংশকে সম্মান করিয়া চলিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে তোমাকে বদ্ধ হইতে হইবে"। ঐ বালক এই সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভীত হইয়া মহারাজার আজ্ঞানুসারে 'তথাস্তু বলিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। মহারাজ নর-নারায়ণ সেই দিন হইতে ঐ বালক ও তাঁহার ভ্রাতাকে পূজকের কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়া পুঁটিয়ার একটি টোলে সংস্কৃত শিক্ষাকরিতে আদেশকরিলেন। তাহারা পুঁটিয়ার একটি টোলে সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকরিয়া পুঁটিয়ায় যতদূর পারসীক ভাষা শিক্ষাকরা তখন সম্ভব ছিল, ততদূর শিক্ষাকরিয়া পারসীক ও আরবী-ভাষায় উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। পুঁটিয়ার মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের ঢাকায় এই শিক্ষার ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় আরবি ও ও পারসীকভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুঁটিয়ায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে রাজনীতিক মহাবিপ্লবের

সূচনা দৃষ্ট হইতেছিল। অওরঙ্গজেব্ তখন দিল্লীর সম্রাট্। তিনি তাঁহার পিতৃদেবকে বন্দীকরিয়া কষ্ট দিতেছিলেন এবং ভ্রাতৃগণের বধ-সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহার কুটবুদ্ধি বাহুবল ও পক্ষপাত-নীতির প্রকাশ্য অভিনয় আরব্ধ হইয়াছিল। হিন্দুদিগকে রাজ-কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করিতেছিলেন। হিন্দুর দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়া তথায় মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণকরাইতেছিলেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও তখন মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পূর্ব্ব-সূচনা আরব্ধ হইয়াছিল। যিনিই বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইয়া শাসন-ভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনিই ছলে বলে কৌশলে দিল্লীর সম্রাটকে অমান্য করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিতেন। সম্রাট অওরঙ্গজেব্ এই ব্যাপার দেখিয়া নিজের পৌত্র আজিম্ ওশ্মান্‌কে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার “নবাব নাজিম” নিযুক্ত করিয়া এবং স্বীয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মুর্শিদ্‌কুলিখাঁকে “নবাব-দিওয়ান্” নিযুক্ত করিয়া ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা দুইজন বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী ঢাকা-নগরীতে থাকিয়া বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদ্‌কুলিখাঁ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। তিনি যখন অল্প-বয়স্ক বালক ছিলেন, তখন এক ধনবান মুসলমান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-

ছিলেন এবং তাঁহাকে আরবী ও পারসীক ভাষায় সুশিক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন। মুর্শিদ্‌কুলিখাঁ উচ্চ-শিক্ষা লাভকরিয়া দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট অওরঙ্গজেব্ তাঁহার প্রতিভা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ-পৌত্র আজিম্ ওশ্মানের দেওয়ানী-পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলিখাঁ বঙ্গের রাজকোষের দুরবস্থার মূল কারণ অচিরে অবগত হইয়া তাহার প্রতিকারপূর্ব্বক প্রথম বর্ষেই সম্রাটের নিকটে এক কোটি টাকা-রাজস্ব প্রেরণকরিয়া সম্রাটের মহা-সন্তোষ উৎপাদনকরিয়াছিলেন। এই সময়েই বঙ্গের ভূস্বামিগণের পক্ষ হইতে নবাব-সরকারে দেয় রাজস্বের "হিসাব-নিকাশ" বুঝাইয়া দিবার জন্য এক এক জন মোক্তারকে ঢাকায় নবাব-দরবারে থাকিতে হইত। এই মোক্তারগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার উপরেই বঙ্গের জমিদারদিগের সম্মান যশ ও জমিদারীর শুভ পরিণাম নির্ভর করিত। এইরূপ কার্য্যে সর্ব্বদা প্রত্যুৎপন্নমতির প্রয়োজন হইত। পারসীকভাষায় বিশেষব্যুৎপত্তি না থাকিলে কেহই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এই সকল মোক্তারকে নবাব-সরকারের "কাননগো"র নিকটে স্ব স্ব-প্রভু জমিদারের পক্ষ হইতে "হিসাব-নিকাশ" বুঝাইতে হইত।

"কাননগো"-কার্য্যালয়ে দুইজন "কানন্‌গো" নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা "নবাব দিওয়ানে"র "হিসাব নিকাশ"-পত্র পরীক্ষাকরিয়া উহা নিজ-নামাঙ্কিত মোহর দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিলে তবে তাহা দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে প্রেরিত হইত এবং সম্রাট উহা গ্রহণকরিতেন। সুতরাং নবাব-দিওয়ান প্রভূতক্ষমতাশালী হইলেও, এই দুইজন নিম্নপদস্থ "কানন্‌গো"কে কিঞ্চিৎ ভয়করিয়া চলিতেন। নবাব-দিওয়ানের যথেচ্ছাচার-নিবারণের জন্যই সম্রাট এই দুইটি "কানন্‌গো"র পদ সৃষ্টিকরিয়াছিলেন। মুর্শিদ্ কুলিখাঁ যে সময়ে বঙ্গের নবাব-দিওয়ান্ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে নাটোর্-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন পুঁটিয়ার মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুরের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ মোক্তার নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় নবাব-দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার নাটোর-রাজ্য-লাভরূপ সমৃদ্ধির চরমসীমায় আরোহণের প্রথম সোপান। রঘুনন্দন ঢাকায় নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পারসীকভাষায় "হিসাব-নিকাশ" প্রস্তুত করিবার এক সহজ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা সম্রাট-পৌত্র আজিম্ ওশ্মানের ও মুর্শিদ কুলীখাঁর কর্ণে পৌঁছিল। দিল্লী হইতে যে সকল উচ্চশিক্ষিত পারসীকভাষাবিৎ মুসলমান তাঁহাদের

সঙ্গে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও, একজন বাঙ্গালীর এইরূপ বিদ্যা-বুদ্ধির উত্তম পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া-গেলেন। বাঙ্গালীজাতি "হিসাব-নিকাশ" প্রভৃতি বিদ্যা-বুদ্ধির কার্য্যে অতিশয় নিপুণ, এই ধারণা তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তাঁহারা ঈর্ষা ও অনিষ্ট-চেষ্টার পরিবর্ত্তে রঘুনন্দনের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনকরিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া নবাব-দরবারে আদৃত হইতে লাগিলেন। এবং এই প্রশংসার প্রভাবেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নবাব-সরকারের "নায়েবকাননগো"র পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা গুণে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বাড়িতে লাগিল, এবং সেই সুযোগে তাঁহার অর্থাগমের পথও সুপ্রশস্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে কোন কারণবশতঃ আজিম্ ওশ্মানের সহিত মুর্শিদ-কুলিখাঁর বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে রঘুনন্দনের ক্ষমতা চরমসীমায় উপনীত হইতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইতে লাগিলেন। আজিম্-ওশ্মান্ সম্রাট-পৌত্র বলিয়া গর্ব্বিত ছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলীখাঁকে সামান্য ক্রীতদাস হইতে "নবাব-দিওয়ানে"র পদে উন্নীত দেখিয়া কথাচ্ছলে উপহাস করিতেন এবং সকলের সম্মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমে তাঁহাদের

পরস্পর মনোমালিন্য, তৎপরে বিবাদ, তৎপরে বিসম্বাদ, ও অবশেষে প্রকাশ্য শত্রুতা আরব্ধ হইল। আজিম্-ওশ্মান্ মুর্শিদকুলীখাঁকে হত্যাকরিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সেই ষড়যন্ত্র, ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে সংবাদ দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে পোঁছিল। সম্রাট অওরঙ্গজেব নিজ-পৌত্রকে পাটনার নবাব নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন। এবং মুর্শিদ-কুলীখাঁকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন একবার স্বয়ং দিল্লীতে আসিয়া তাঁহার (সম্রাটের) সম্মুখে বঙ্গরাজ্য-সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক ঠিক ঠিক হিসাব-নিকাশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। সম্রাটের এইরূপ আদেশ অবগত হইয়া আজিম্ ওশ্মানের এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে, যদি মুর্শিদকুলীখাঁ দিল্লীতে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ ও অবশেষে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলে সম্রাট তাঁহাকে (আজিম্ ওশ্মানকে) তিরস্কার করিবেন। অতএব এক্ষণে কি উপায় উদ্ভাবন করা যায়? তিনি বহুক্ষণ ভাবিয়া এই এক উপায় স্থির করিলেন যে, যদি বঙ্গের "নায়েবকাননগো" রঘুনন্দন মুর্শিদ কুলীখাঁর হিসাব-নিকাশ পত্র মোহর-অঙ্কিত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। তিনি সম্রাটের পৌত্র। তাঁহার আদেশ রঘুনন্দন অবশ্যই প্রতিপালন করিবে।

এই স্থির করিয়া তিনি রঘুনন্দনকে ঐ পত্রে মোহর-অঙ্কিত করিতে নিষেধ করিয়া শাসন করিয়া দিলেন। রঘুনন্দন সম্রাট-পৌত্রের শাসনবাণী ও নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন যে, মুর্শিদকুলিখাঁ একজন ভৃত্যমাত্র। অদ্য তিনি স্বপদে আছেন, কল্য থাকিবেন্ কি না সন্দেহ। আর কল্য থাকেন, তো, পরশ্ব থাকিবেন কি না, তাহার স্থিরতা নাই। আর, আজিম্ ওশ্মান্, সম্রাট-পৌত্র। ইনি কালে সম্রাট হইলেও হইতে পারেন। অতএব ইঁহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করাই উচিত এবং ইঁহার আজ্ঞা সর্ব্বপ্রকারে মান্য করা উচিত। নতুবা পরে শাস্তি পাইতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া রঘুনন্দন সম্রাট-পৌত্রের আজ্ঞা ও শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে কোন প্রকারেই সাহসী হইলেন না। মুর্শিদকুলিখাঁ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার-লাভের নিমিত্ত যখন অন্য কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন তিনি "নায়েব-কাননগো" রঘুনন্দকেই রাজদ্বারে বিপদের একমাত্র বন্ধু একমাত্র সহায় স্থির করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, সম্রাট-পৌত্র যখন পাটনায় থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনি তথা হইতে ঢাকার নবাবের কর্ম্মচারীর উপরে সহসা অত্যাচার করিতে পারিবেন না। আর তিনি (মুর্শিদ কুলিখাঁ) যদি একবার দিল্লীতে গিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া বঙ্গের

নবাব নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঢাকায় আসিবামাত্রই তাঁহার (রঘুনন্দনের) কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে কখনই বিস্মৃত হইবেন না। মুর্শিদকুলিখাঁ নানাবিধ যুক্তিযুক্ত ও আশাজনক বাক্যে রঘুনন্দনকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার হিসাব-নিকাশ পত্র মোহর-অঙ্কিত করিতে সম্মত করিলেন। রঘুনন্দনের মোহর-অঙ্কিত হিসাব-নিকাশ পত্র ও নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকনদ্রব্য সংগ্রহকরিয়া মুর্শিদকুলীখাঁ যথাসময়ে দিল্লীতে গিয়া পৌঁছিলেন। ঢাকার "কাননগো"-কার্য্যালয়ে দুইজন "কাননগো" কার্য্য করিতেন। এই দুইজনের মধ্যে রঘুনন্দনই প্রধান ছিলেন। কিন্তু নবাব-দিওয়ানের হিসাব-নিকাশ পত্রে এই দুইজনেরই মোহর দ্বারা স্বাক্ষর করিবার কথা।

কিন্তু এই ঘটনায় কেবলমাত্র রঘুনন্দনই নবাব-দিওয়ান কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তরূপে প্ররোচিত হইয়া এবং অদৃষ্ট সাহস ও উচ্চতম আশার উপর নির্ভর করিয়া ঐ পত্র মোহর-অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীটি সম্রাট-পৌত্রের ভয়ে ঐরূপ স্বাক্ষর করেন নাই। মুর্শিদকুলীখাঁ কেবলমাত্র রঘুনন্দনের স্বাক্ষরিত পত্র সম্বল করিয়াই দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে গিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলীখাঁ বহুমূল্য অনেক উপঢৌকন-দ্রব্য এবং প্রভূত অর্থ লইয়া নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলে সম্রাট্ অওরঙ্গজেব আনন্দে

অধীর হইয়া উঠিলেন। কারণ, সে সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যুদ্ধে অত্যন্ত অর্থব্যয় হওয়াতে সম্রাট চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকোষে অতিশয় অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদকুলীখাঁর আনীত অর্থ পাইয়া সম্রাট্ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বঙ্গরাজ্যের হিসাব-নিকাশ পত্রে দুইজন কাননগো স্বাক্ষর করিয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর কোন প্রয়োজনই হইল না। তিনি মহামূল্য বহু উপঢৌকন ও প্রভূত অর্থ পাইয়া মুর্শিদকুলীখাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাব নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় প্রেরণকরিলেন। মুর্শিদ-কুলীখাঁ ঢাকায় আসিয়া রাজদ্বারে বিপদুদ্ধারের একমাত্র বন্ধু ও সহায় রঘুনন্দনকে নিজের দিওয়ান নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার জন্য যথাসময়ে সম্রাটের নিকট হইতে "রায়রাঁইয়ান্" এই উপাধির সনদ্ আনাইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব-দিওয়ান্ রঘুনন্দন রায় রাঁইয়ান্ মহাশয়ের ঢাকায় নবাব-দরবারে মহতী প্রতিপত্তিই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নাটোর-রাজ্য-লাভের মূল কারণ। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ ঢাকা ত্যাগকরিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া রাজধানী স্থাপনকরিলেন। তাঁহার নামানুসারেই ঐ রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ হইল। মুর্শিদাবাদ রাজধানী

অচিরে মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া উঠিল। নবাব, প্রধান মন্ত্রী রঘুনন্দনের সুমন্ত্রণার বলে মহাপ্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। দিওয়ান রঘুনন্দন রায়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি-উদ্ভাবিত নূতন ও সহজ রাজস্ব-নির্দ্ধারণ-পদ্ধতি ও রাজস্ব-সংগ্রহ-নীতি অনুসারে নবাবের দৌহিত্রী-পতি মহম্মদ্ রেজার্খাঁ রাজস্ব সংগ্রহকরিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালের বঙ্গের জমিদারগণ প্রায় স্বাধীন-ভাবে জমিদারী করিতেন। তৎকালে বঙ্গে নবাবী রাজ্য-তন্ত্র, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল ও যদৃচ্ছা-পরিচালিত হওয়ায় বঙ্গের ভূস্বামিগণ স্বাধীনভাবে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। নবাব-সরকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর প্রদান করিতেন না। কেহ কেহ মোটেই কর দিতেন না। তাঁহাদের ধনবল ও জনবল এই দুই উপায়ই থাকাতে তাঁহারা নবাবের ফৌজদার বা স্বয়ং নবাবকেও অনেক সময়ে ভয় করিতেন না। মহম্মদ রেজার্খাঁ বঙ্গের ভূস্বামি-গণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বাহুবলে শাসনকরিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ শাসন-প্রভাবে শীঘ্র শীঘ্র রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল। তাঁহার কঠোর শাসনের ভয়ে বিহ্বল হইয়া বঙ্গের অনেক জমিদার স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অনেকে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন ও অনেকে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। যে সকল জমিদার রাজস্ব না

দিয়া স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে জমিদারী করিতেন, মহম্মদ রেজাখাঁ, বহুসৈন্য ও যুদ্ধোপযোগী প্রভৃত অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া তাঁহাদের আবাস-ভূমিতে যাইতেন এবং তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকরিয়া আনিতেন। তাঁহাদের সেই সকল পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি হইতে রাজস্ব-লাভের নিমিত্ত নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টিকরা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। সেই সকল পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি অন্য লোককে না দিয়া রামজীবনকেই দেওয়া হইল। ইহাই রামজীবনের নাটোর-রাজ্য-লাভরূপ সমৃদ্ধির উচ্চসীমায় আরোহণের দ্বিতীয় সোপান। নবাব, রঘুনন্দনকে ঐ সকল জমিদারীর অধিকার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলে বিখ্যাত জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-ভক্ত রঘুনন্দন, নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে উহা প্রদান করিতে বলিতেন। নবাব তদনুসারে রামজীবনকে ঐ সকল নূতন জমিদারী প্রদান করিতেন। রামজীবনও, মহম্মদ রেজাখাঁর ন্যায় প্রবল পরাক্রমে ও বাহুবলে নিজের সেই সকল নূতন প্রাপ্ত জমিদারী হইতে কর আদায় করিয়া যথাসময়ে নবাব-সরকারে রাজস্ব প্রদানকরায় তিনিও, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার ন্যায় নবাবের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে বিনা চেষ্টাতেই অনেক জমিদারী তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। তিনি নবাবের কৃপায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজাবাহাদুর এই উপাধি; "বাইশ খান্

খেলাৎ," বহুসংখ্যক হস্তী উষ্ট্র অশ্ব ও পতাকা এবং পাল্‌কি রাখিবার অধিকার, এবং প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজাইবার ও বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে নাটোরে একটি বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ও তথায় বাস করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই বৃহৎ প্রাসাদের উচ্চ গগনস্পর্শি-চূড়া, তদুপরি পৎপৎ শব্দে উড্ডীয়মানা উচ্চ রাজপতাকা, চতুর্দ্দিকে সমুন্নত পুর-প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে প্রশান্তসলিলা দুর্গপরিখা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, সেনানিবাস, পান্থনিবাস, দেবমন্দির, অট্টালিকাসমূহ, রাশি রাশি পণ্যদ্রব্যের সুপ্রশস্ত হট্ট, এবং নানাবিধ মনোহারিণী বিপণিশ্রেণী, নাটোর রাজ-ধানীর গৌরব বৃদ্ধিকরিয়াছিল। যে তিনটি দুর্গপরিখা, প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিত, তাহা এক্ষণে স্থানে স্থানে জলশূন্য হইয়াছে। প্রাসাদের উচ্চ দৃঢ় সিংহদ্বারের জরাজীর্ণ ভগ্নাবশেষ মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদের দোলমঞ্চ ও অন্যান্য অনেক অংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই অতীত গৌরবের যাহা কিছু স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর কৃপায় মহারাজ রামজীবন দিন দিন নূতন নূতন জমিদারী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাণগাছি পরগণার প্রাচীন বিখ্যাত জমিদার গণেশরাম চৌধুরী যথাসময়ে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় নবাব তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিয়া তাঁহার জমিদারী মহারাজ রামজীবনকে প্রদান করিলেন। আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সম্মিলন-স্থানের নিকটে সান্তোল্ রাজ্যের রাজধানী ছিল। রামকৃষ্ণনামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার সান্তোলের রাজা ছিলেন। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার-জজ শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রামদেব চৌধুরী মহাশয়, সান্তোল-রাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই জমিদারী হইতে যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় মহম্মদ রেজাখাঁ সসৈন্যে সান্তোলে আসিয়া সান্তোল-রাজবাটীকে শ্মশান-ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, সেই বিপদের সময় রামদেব চৌধুরী, অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর মায়া ত্যাগ করিয়া ৺শালগ্রাম শিলাটি লইয়া রাত্রে নদী পার হইয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ শিলা তাঁহাদের হরিপুরের বাটীর ঠাকুর ঘরে যথাবিধি পূজিত হইতেছেন। রাজা রামকৃষ্ণের স্ত্রী রাণী সর্ব্বাণী এই বিপদে মানরক্ষার্থে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব, এই উত্তরাধিকারি-বিহীন সান্তোল-রাজ্য রাজা রামজীবনকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাজলাকী

জেলায় রাজা উদিত নারায়ণ-নামক একজন প্রবলপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। উদিত নারায়ণ নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ-দমনের নিমিত্ত নবাব বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। নবাব-সৈন্য উদিত নারায়ণের প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ গোলাম মহম্মদকে হত্যা করিয়া উদিত নারায়ণকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছিল। উদিত নারায়ণ সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার জমিদারীটিও নবাব, রামজীবনকেই প্রদান করিলেন। যে সময়ে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের পরাক্রমশালী ভূস্বামিগণ ভয়ে নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর পদানত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গের যশোহর জেলার ভূষণা পরগণার রাজা সীতারাম রায়-নামক এক প্রবলপরাক্রম কায়স্থ জমিদার স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিয়া নবাবী রাজ্যতন্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞানকরিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে স্বাধীনভাবে স্বীয় রাজ্য প্রতিপালন করিতেছিলেন।

যশোহর জেলায় মধুমতী নদীর তীরে হরিহরনগরে তিনি বাস করিতেন। প্রথমে তাঁহার শ্যামনগর-নামক একটি ক্ষুদ্র তালুক ভিন্ন অন্য কোন জমিদারী ছিল না। পরে তিনি বঙ্গে নবাবী রাজতন্ত্রের অধঃপতনের সুযোগ পাইয়া ভূষণা "চাকালা"র অধিকাংশ স্থান ও অন্যান্য বহু

স্থান বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের উচ্চ আশায় বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদপুর-নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের বার্ষিক আয় ৭০ লক্ষ টাকার উপরে উঠিয়াছিল। তাঁহার রাজধানী ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। রাজা সীতারাম কখনই নবাবকে রাজস্ব দেন নাই। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ সীতারামকে বশীভূত করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সীতারামের সাহস ও পরাক্রম ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নবাব, সীতারামকে বশীভূত করিবার জন্য আবুতোরাপ্-নামক এক দুর্দ্দান্ত রাজ-কর্ম্মচারীকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বহু সৈন্য সহ তাঁহাকে ভূষণায় পাঠাইয়াছিলেন। আবুতোরাপের সহিত সীতারামের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। এই ঘোরতর যুদ্ধে সীতারামের একজন সেনানী, আবুতোরাপের মুণ্ডটি কাটিয়া সীতারামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। সীতারাম তাহাকে এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধে আবুতোরাপ্ নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করায় সীতারাম এই ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। নবাব, আবুতোপের নিধন-সংবাদ শুনিয়া

সীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, এবং আবুতোরাপের নিধন ও পরাজয়-বার্ত্তা দিল্লীতে সম্রাট-সমীপে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যাহাতে সীতারামের ধ্বংস সাধিত হয়, তজ্জন্য দেওয়ান রঘুনন্দনের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ মন্ত্রণার পর নবাব, রঘুনন্দনের হস্তেই সীতারামের ধ্বংস-সাধনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন। রঘুনন্দন নিজের সুচতুর সাহসী বুদ্ধিমান দিওয়ান দয়ারাম রায়কে সংগ্রাম সিংহ-নামক সেনানী ও বহুসংখ্যক সৈন্য সহ সীতারামের ধ্বংস-সাধনার্থ মহম্মদপুরে প্রেরণ করিলেন। এইবার দয়ারামের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির কৌশলে সীতারাম পরাস্ত হইয়া ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া মুর্শিদাবাদে নবাব-সকাশে আনীত হইয়াছিলেন। সীতারাম মুর্শিদাবাদে বন্দি-ভাবে কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য-নাশ ও অপমানজনিত শোক-দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া অন্তকালে পবিত্রতম গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যে, গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এই বিষয় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ কর্ত্তৃক বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত, তাঁহার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্রের সংস্কৃতশ্লোকে উল্লিখিত আছে। নবাব মুর্শিদ-কুলীখাঁ, রাজা রামজীবনের দিওয়ান দয়ারামের সাহায্যে রাজা সীতারামের ধ্বংস-সাধন করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দয়ারামের সাহায্যে সীতারামের

ধ্বংস-সাধন হওয়ায় দয়ারাম, নবাব সরকার হইতে রায়-রাঁইয়ান এই উপাধি এবং সীতারামের অনেক তৈজসপাত্র প্রভৃতি বস্তু পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহার কতক-কতক অংশ বঙ্গের দিঘাপাতিয়ার রাজবাটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এইরূপ শুনা যায়। দিঘাপতিয়ার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়, রাজনীতিশাস্ত্রের সকল বিভাগেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রন্থ না পড়িয়াও, বুদ্ধির প্রভাবে সেই রাজ্যবিপ্লব-যুগে যেরূপ রাজনীতি-বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক মহাপ্রশংসার্হ। তিনি এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের বৃহৎ রাজ্যের রাজা রামজীবনের "দিওয়ানখানা"য় বসিয়া দিওয়ানী কার্য্য ও বিচারকার্য্যও, সম্পাদন করিতেন, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধকার্য্যেও সংলিপ্ত হইতেন। সীতারামের ধ্বংসের পর তাঁহার ভূষণা-রাজ্য নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ নাটোরের রাজা রামজীবনকেই প্রদান করিলেন। রাজা রামজীবন ভূষণা-রাজ্য পাইয়া বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমিদার হইয়া পড়িলেন। সীতারামের রাজ্যের বার্ষিক আয় ৭০ লক্ষ টাকার উপরে উঠিয়াছিল। রাজা রামজীবন নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর অতিপ্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া নিজের নাটোর-রাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদায় ক্ষমতা-পরি-চালনের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এনায়েৎখাঁ,

কিশোরখাঁ, সমসেরখাঁ এবং ইস্‌কিন্দার্‌বেগ্‌-নামক মুসলমান জমিদার ও অন্যান্য জাইগির্‌দারগণ, নরহত্যা ও অবশ্যতাদি-দোষে স্ব স্ব জমিদারীর অধিকার হইতে বিচ্যুত নিহত ও নির্ব্বাসিত হইলে নবাব তাঁহাদের জমিদারীগুলিও রাজা রামজীবনকেই প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা রামজীবন নবাব মুর্শিদকুলীখাঁকে "সতের লক্ষ তেষট্টি হাজার তিন শত বিরাশী টাকা বার্ষিক রাজস্ব প্রদানকরিতেন।

রামজীবন নাটোরের রাজা হইয়া নাটোরেই থাকিতেন এবং তাঁহার মধ্যমভ্রাতা মুর্শিদাবাদের নবাবের দিওয়ান্‌ ছিলেন বলিয়া মুর্শিদাবাদে বড়নগর-নামক স্থানে গঙ্গাতীরে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণকরাইয়া তথায় বাস করিতেন। এই বড়নগর-প্রাসাদের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংস্রব। রাণী ভবানী ইংরাজকোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে গঙ্গাতীরস্থ এই প্রাসাদে জীবনের অধিকাংশ সময়ে এবং বিশেষতঃ শেষদশায় বাস করিয়াছিলেন। ভূষণা-রাজ্য-লাভের পর রাজা রামজীবন দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজ বাহাদুর" এই উপাধি এবং রাজকীয় বহু উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাহসী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক দীর্ঘকায় সুচরিত্র ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মধ্যমভ্রাতা রাজা রঘুনন্দন রায় তৎকালে মহাপ্রতিভাশালী প্রধান রাজনীতিবিৎ বলিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশে বিশেষরূপে সুপরিচিত ছিলেন।

উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃত পারসীক ও আরবী ভাষায় বিশেষ-রূপে সুশিক্ষিত ছিলেন। রাজা রঘুনন্দনের অসীম ক্ষমতাই মহারাজ রামজীবনের নাটোর-রাজ্য-লাভের মূল কারণ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ রামজীবনের প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রঘুনন্দনের অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়া তৎকালে লোক সকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজা রঘুনন্দনের অশেষ প্রশংসা করিত। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদাবাদের দুইজন পাঠান-জমিদার বহুসৈন্য সংগ্রহ করিয়া নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা একদিন পথিমধ্যে নবাবের যাট্ হাজার টাকা লুণ্ঠনকরিয়া লইয়াছিলেন। ঐ টাকা রাজস্বরূপে মুর্শিদাবাদে নীত হইতেছিল। তৎকালের হুগলির ফৌজদার আহসান্ আলিখাঁ ঐ পাঠান বিদ্রোহিদ্বয়কে বন্দীকরিয়া মুর্শিদাবাদে নবাব-সকাশে লইয়া গিয়াছিলেন। নবাব, তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের জমিদারী নিজের দিওয়ান রঘুনন্দনকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ উহা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রামবীবনের চরণযুগলে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নবাবের নিকট হইতে যখন যে জমিদারটি পাইতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রীচরণে উৎসর্গকরিতেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামজীনের একমাত্র পুত্র মহারাজকুমার কালিকাপ্রসাদ কালগ্রাসে

পতিত হওয়ায় মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রণা উপশমিত হইতে না হইতেই তাঁহার লক্ষ্মণতুল্য ভক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাটোর রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা রঘুনন্দন রায় তাঁহাকে শোকসাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। তাহার পর তাঁহার প্রিয়তম প্রভু, বিপদের একমাত্র সহায়, বঙ্গের নবাব মুর্শিদ-কুলীখাঁও, অল্পদিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তহইলেন। এই সকল নানা কারণে তিনি শোকে ও চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এত বড় বিস্তৃত রাজ্য নির্ব্বিঘ্ন নির্ব্বিপদে কে ভোগ করিবে? এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে দত্তক পুত্র লইবার জন্য অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন অজ্ঞেয় কারণবশতঃ তিনি তাহা না করিয়া রাজসাহী জেলার রসিক রায় খাঁ ভাদুড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র রামকান্তকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রামকান্ত রায়েরই ধর্ম্মপত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া বিখ্যাত রাজ-নীতিকুশলা মহাশিক্ষিতা দানশীলা দীনদুঃখ-কাতরা মহারাণী ভবানী। রসিক রায়ের পূর্ব্বপুরুষ জগদানন্দ রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যদেব মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি গৌড়ের মুসলমান নবাবদিগের অধীনে

উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইয়াও "খাঁ বাহাদুর" এই উপাধি পাইয়াছিলেন। রসিক রায় নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিয়া মহারাজ রামজীবনের বংশরক্ষা করায় মহারাজ তাঁহাকে প্রত্যুপকারস্বরূপ দুইটি মূল্যবান জমিদারী প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুইটির নাম চৌগ্রাম ও ইস্লামাবাদ। রসিক রায়ের বংশধরগণ অদ্যাপি "চৌগাঁয়ের রাজা" বলিয়া খ্যাতি পাইয়া আসিতেছেন। মহারাজ রামজীবন রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদ অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। বাহিরে দুঃখপ্রকাশ বা ক্রোধপ্রকাশ না করিয়া অন্তরে তিনি এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনিই নাটোর-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অতএব তিনিই কালে যে কোন প্রকারে উহা অধিকার করিবেনই। মহারাজ, দেবীপ্রসাদকে রাজ্যের ছয় আনা ভাগ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবীপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হইলেন না। দেবীপ্রসাদ মহারাজের আদেশ অমান্য করায় মহারাজ সেই ছয় আনা অংশও তাঁহাকে দিলেন না। সুতরাং রাজ্যের ষোল আনা অংশই রামকান্তেরই রহিয়া গেল। মহারাজ রামজীবনের বৃদ্ধাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া বঙ্গের অনেক শক্তিশালী দুর্দ্দান্ত জমিদার তাঁহার রাজ্য

আত্মসাৎ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত দিওয়ান দয়ারাম রায়ের বিখ্যাত সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবে ও শাসন-কৌশলে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। মহারাজ, দয়ারামের প্রভুভক্তি ও বিশ্বাসিতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ইহার পুরস্কারের স্বরূপ অনেক তালুক প্রদান করিয়াছিলেন। দয়ারামকে তৎকালে সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। মহারাজ রামজীবন তাঁহাকে ভৃত্য বলিয়া কখনই মনে করিতেন না। নিজের পুত্র বলিয়া মনে করিতেন। দয়ারাম রায়কে জ্যেষ্ঠভ্রাতা মনে করিয়া "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিবার জন্য মহারাজ স্বীয় দত্তকপুত্র রামকান্তকে আদেশ করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, পর পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে স্থিতা অন্তঃপুরবাসিনী লজ্জাশীলা রাণী ভবানী দিওয়ান দয়ারামের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার সহিত কথা না কহিলেও, তাঁহাকে "দায়াদাদা" বলিয়া ডাকিতেন। রামকান্ত বিবাহযোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে অনেকেই তাঁহার হস্তে কন্যা-সমর্পণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দয়ারামের পছন্দের উপর নির্ভর করিয়া মহারাজ রামজীবন ছাতিন-গ্রামের জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা সুলক্ষণাক্রান্তা শ্রীমতী ভবানী দেবীর সহিতই স্বীয় দত্তক-পুত্র রামকান্তের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে যেরূপ মহাসমারোহ হইয়াছিল, তাহার কিম্বদন্তী অদ্যাপি রাজ-

সাহীতে প্রচলিত আছে। এই বিবাহে অনেক দেশের অনেক রাজা, মহারাজা, আমির্ ওম্রাহ ও রায় রাঁইয়ান উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাটোর-রাজবংশের এই নিয়ম ছিল যে, বর, কন্যার দেশে বা কন্যার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ করিতেন না। কিন্তু কন্যার পিতাকে বরের বাড়ীতে আসিয়া নিজকন্যার বিবাহ দিতে হইত। কুমার রাম-কান্তের বিবাহের সময় এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। আত্মারাম চৌধুরী প্রাচীন নবাবী আমলের একজন মহামান্য জমিদার ছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার বাটীর কুল-মহিলাগণ তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দেখিতে না পাইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন বলিয়া তাঁহার আগ্রহাতি-শয্যে মহারাজ রামজীবন, ছাতিন গ্রামে গিয়া স্বীয় দত্তক পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই বিবাহের পর ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামজীবন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর মহারাজকুমার রামকান্ত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দিওয়ান দয়ারামের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পরে দিওয়ান মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় তিনি নবাব-সরকার হইতে প্রথমতঃ নিজনামে জমিদারীর সনদ্, পশ্চাৎ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজ বাহাদুর" এই উপাধি এবং অন্যান্য রাজকীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বালিকা মহারাণী

ভবানী শ্বশুরালয়ে আসিয়া এক বিদুষী ব্রাহ্মণী মহিলার নিকটে সংস্কৃত ব্যাকরণ, বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ, কয়েকখানি সংস্কৃতকাব্য, সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও সংস্কৃত রাজনীতিগ্রন্থ সকল এবং অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং পতির নিকটে জমিদারীকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পতির নিকট হইতে তাঁহার বাল্যাবস্থায় জমিদারীকার্য্যশিক্ষা বিষয়ে মহাপ্রতিভার পরিচয় শুনিয়া বিখ্যাতসূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন দিওয়ান দয়ারামও, বিস্মিত হইয়া যাইতেন। মহারাণী বিবাহের পূর্ব্বে ছাতিনগ্রামে পিতার নিকটে অক্ষর-লিখনপঠন, "কষ্ট্যক," "গণ্ডাকে," ও "নামতা" প্রভৃতি অঙ্ক শিক্ষাকরিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। বঙ্গভাষাও এত পরিপুষ্টতা লাভ করে নাই। তখন সংস্কৃত-শিক্ষা জ্ঞানকরী ছিল এবং উর্দ্দু-পারসীকভাষা-শিক্ষা অর্থকরী ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা সংস্কৃতই শিখিতেন। মহারাণী ভবানী বাল্যকালেও, অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেন। তিনি প্রতিদিনই প্রত্যূষে স্নান করিতেন। স্নানান্তে শিবপূজা ও স্তোত্র পাঠাদি সমাপন করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাপ্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক সকল পাঠকরিতেন। বালিকা মহারাণী যখন পাঠ করিতে বসিতেন, তখন প্রাসাদের

নারীগণ তাঁহার নিকটে বসিতেন, তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল পবিত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। অন্তঃপুরে তাঁহার শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন কেহ না থাকিলেও, অনেক পরিচারিকা, সদ্বংশীয়া দীনা বিধবা, এবং স্বজাতীয়া দূরসম্পর্কীয়া অসহায়া নারী বাসকরিতেন। পরিচারিকাগণ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর দাস্যবৃত্তি করিত, এবং কতকগুলি কোন কার্য্যই করিত না। অথচ তাহারা উচ্চবেতন ও উত্তম খাদ্য ও বেশ-ভূষা পাইত। এই শ্রেণীর পরিচারিকাগণ এবং সদ্বংশীয়া দুর্দ্দশাপন্না মহিলারা তাঁহার সখীর কার্য্য করিত। মহারাণী ভবানী বাল্যাবস্থায় যেরূপ দৈনিক কার্য্যাবলী নিয়মপূর্ব্বক সমাধা করিতেন, যৌবন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থাতেও, তদ্রূপই করিতেন। তবে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর যখন স্বহস্তে তাঁহাকে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল, তখন পূজা-স্তবপাঠ-পুরাণ-পাঠাদির সমাপনান্তে তিনি স্বয়ং পাককরিয়া আহারকরিতেন এবং জমিদারীকার্য্যে এবং বিচারকার্য্যে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তিনি ভোজনান্তে জমিদারীর কাগচ-পত্র সকল দেখিতে বসিতেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্তকরিয়া পুনরায় রাজকার্য্য করিতে বসিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পানকরিতেন এবং কিঞ্চিৎ ফল

ভক্ষণ করিতেন। পরে শয়ন করিতেন। বঙ্গের ব্রাহ্মণ বিধবানারী একবেলামাত্র অন্ন আহারকরেন। তাঁহারা নিরামিষাশিনী। তাঁহারা রাত্রে অন্ন রুটি বা লুচি প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণকরেন না। তাঁহারা একাহারিণী। রাত্রে কেবল দুগ্ধ ও ফল ভক্ষণকরিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় বিংশ-শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্ঞানালোক ও পূর্ণ সভ্যতার দিনেও, বঙ্গের ব্রাহ্মণ বিধবামহিলা একাহারিণী ও নিরামিষাশিনী। বঙ্গের ব্রাহ্মণ-বালিকাও বিধবা হইলে ঐরূপ রীতি অদ্যাপি অবলম্বন করিয়া থাকেন। মহারাজ রামজীবনের মৃত্যুর পর যে সময়ে তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ রামকান্ত, স্বীয় যুবতী পত্নী মহারাণী ভবানী ও দিওয়ান দয়ারামের সাহায্যে রাজকার্য্য সম্পাদনকরিতেছিলেন, সেই সময়ে সফর্‌রাজ্‌খাঁ বঙ্গের নবাব ছিলেন। বঙ্গে তখন মহারাজ্যবিপ্লবের যুগ। তাঁহার পিতা সুজাখাঁ দিন কয়েক মাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি রুগ্ন হইয়া পড়ায় তাহার পুত্র সফর্‌রাজ্‌খাঁ, পিতার নামে রাজত্ব করিতেন। দেশের লোক সুজাখাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল। সফর্‌রাজ্‌খাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাণী ভবানী যখন সর্ব্বপ্রথম জমিদারীকার্য্যে মনঃ-সংযোগ করিতে আরম্ভকরিয়াছিলেন, তৎকাল হইতে তাঁহার মৃত্যুকালপর্য্যন্ত বঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব প্রায় সমভাবেই

উগ্রমূর্ত্তি ধারণকরিয়াছিল। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে কত মানী ধনী ও সতীর মাননাশ, প্রাণনাশ, ধননাশ, ও সতীত্বনাশ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লবযুগে রাণী ভবানী অত বড় বিস্তৃত জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণকরিয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রতাপের সহিত ঐরূপ জমিদারী রক্ষাকরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রবলশক্তি মহাধন্যবাদার্হ। রামকান্ত, "মহারাজ" উপাধি ও নিজনামে জমিদারীর সনদ্ পাইয়া স্বীয় শিক্ষিতা পত্নী মহারাণী ভবানীর সাহায্যে যখন সুচারুরূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম, দেওয়ানীকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণকরিয়া নাটোরের নিকটবর্ত্তী দিঘাপাতিয়া-নামক স্থানে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণকরাইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিজের জমিদারীর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণকরিতে লাগিলেন। দেবীপ্রসাদ এতদিন পর্য্যন্ত দয়ারামের ভয়ে মহারাজ রাম-কান্তের কোন অনিষ্ট সাধনকরিতে পারেন নাই। এক্ষণে দয়ারাম, দিওয়ানীকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-করায় মহাসুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ রামজীবন রামকান্তকে যে, দত্তক গ্রহণকরিয়াছিলেন ঐ দত্তক-গ্রহণের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি প্রথমতঃ নবাব-দরবারে

অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হইল না। রাজা রঘুনন্দনের অসীম ক্ষমতা তখনও লোক ভুলিয়া যায় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ রাম-জীবন যখন রামকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন এবং পরে রামকান্তের যখন বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন নবাবের পারিষদ অনেক ক্ষমতাশালী হিন্দু রাজা মহারাজা ও মুসলমান আমির-ওম্‌রাহগণ নাটোরে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া দেবীপ্রসাদ নিজ কার্য্য সাধনকরিতে কোন প্রকারেই সমর্থ হইলেন না। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুদেব দেবরায় রাজস্ব-প্রদানে অক্ষম হইলে নবাব সুজার্খাঁর আদেশে তাঁহার জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইল দেখিয়া দেবী-প্রসাদ, রামকান্তের উপর নবাবের যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি আছে, ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। দেবীপ্রসাদ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, নবাব সুজার্খাঁর রাজত্বকালে তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইবে না। সুতরাং তিনি রামকান্তের অনিষ্ট-চেষ্টার জন্য অন্য সুযোগ প্রতীক্ষাকরিতে লাগিলেন। রামকান্তও নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক নূতন নূতন জমিদারী তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। যথাসময়ে নবাব-সরকারে

রাজস্ব প্রদত্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে দয়ারাম রায় দিঘাপাতিয়ায় নিজ বাটীতেই থাকিয়া নিজের জমিদারীর উন্নতিসাধন করিতেছিলেন। তিনি কখন কখন অবসর পাইলে নাটোরে আসিয়া মহারাণী ভবানী ও মহারাজ রামকান্তের কুশল-সংবাদ লইতেন। এই সময়ে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে কখন সুজার্থা কখনও বা তাঁহার পুত্র সফর্ রাজ্থাঁ উপবেশন করিয়া নানারূপ রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন। মুর্শিদাবাদে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক দলের লোক, রুগ্ন বৃদ্ধ সুজার্থার প্রতি অনুরক্ত ছিল, এবং অন্য দলের লোক তাঁহার পুত্র সফর্ রাজ্থাঁকে ভালবাসিত। মুর্শিদকুলীখাঁ, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে বঙ্গের রাজস্ব প্রেরণ করিতেন বলিয়া বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য "পুণ্যাহ"-নামক এক নূতন পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বাহে জমিদারগণ স্বয়ং কিম্বা তাঁহাদের প্রতিনিধিরা মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব বৎসরের রাজস্ব প্রদান-করিতেন। মহারাজ রামকান্ত জমিদারী-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম-তত্ত্বজ্ঞা সহধর্ম্মিণী মহারাণী ভবানীর সাহায্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবযুগে মহা-যোগ্যতার সহিত রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় বঙ্গের অনেক ভূস্বামী ঐ "পুণ্যাহ"-দিবসে দেয় রাজস্ব

দিতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহাদের জমিদারীগুলি রামকান্তের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে নবাব সুজাখাঁ, আলিবর্দ্দীখাঁ-নামক সৈন্য বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর মহাযোগ্যতা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আলীবর্দ্দীখাঁর সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় সফর্ রাজ্‌খাঁ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। সেইজন্য ইঁহাদের দুইজনের পরস্পর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। নবাব সুজাখাঁ এই ব্যাপার অবগত হইয়া আলিবর্দ্দীকে সফররাজের দৃষ্টির অন্তরাল করিতে ইচ্ছুক হইলেন ও তাঁহাকে পাটনার শাসনভার প্রদান করিয়া স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। সুজাখাঁর মৃত্যুর পর সফররাজখাঁ বঙ্গের সিংহাসনে স্থায়ি-রূপে অধিরোহণ করিলেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁহার পাপনদীর স্রোত খরতর বেগ ধারণ করিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত ধনী মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের পুত্রবধূর অসামান্য রূপলাবণ্য শ্রবণে অধীর হইয়া নবীন নবাব সফররাজখাঁ তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য জগৎশেঠের নিকটে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জগৎশেঠ, নবাবের এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাব শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে নবাবকে কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুরমণীকে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া থাকিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র ভূয়োঃভূয়ঃ শাসনকরিয়াছেন। পুংলিঙ্গবাচক চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃক্ষাদি পদার্থ দর্শনকরাও হিন্দু

রমণীর পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অতএব প্রভো, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ঐরূপ ভয়ঙ্কর কুপ্রস্তাব আর করিবেন না। আপনি দেশের শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মরক্ষক রাজা। প্রজার ধর্ম্ম রক্ষাকরা বা প্রজার ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ে বিঘ্ন নিবারণ-করাই আপনার ধর্ম্ম"। ইত্যাদিরূপে জগৎশেঠ নবাবকে অনেক বুঝাইলেও নবাব এই সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক জগৎশেঠের পুত্রবধূর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য একদিন সৈন্য-সামন্ত সহ শেঠ-ভবনে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার দর্শন-বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া-ছিলেন, এবং শেঠ-ভবন লুণ্ঠনকরিয়া অনেক দুর্ম্মূল্য বিখ্যাত ধনরত্ন আত্মসাৎকরিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে পর্য্যন্ত যখন এইরূপ কথা রটিয়াছে, তখন "যাহা রটে, তাহা কতকটা বটে," এই শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন-করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বীয় ইতিহাসে এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেঠ-বংশধর-গণ এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। জগৎশেঠের ন্যায় মানী ও ধনী ভারতে কুত্রাপি ছিল কি না সন্দেহ। নবাবদিগের টাকার প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা জগৎশেঠের শরণাগত হইতেন। "এ হেন জগৎশেঠের যখন এইরূপ অপমান ও দুর্দ্দশা হইল, তখন অন্য লোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা অসম্ভব," এইরূপ আন্দোলন বঙ্গে সর্ব্বত্র চলিতে

লাগিল। তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীখাঁ গিরিয়ার প্রান্তরে সফররাজ্খাঁকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া বঙ্গের প্রজাবর্গের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীখাঁ কার্য্যদক্ষ স্বনামধন্য পরিশ্রমী বুদ্ধিমান স্বধর্ম্মরত সচ্চরিত্র প্রজাবৎসল নবাব বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঘটনাচক্রের অনির্দ্দেশ্য ঘূর্ণন বশতঃ ঈদৃশ নরপতির শাসন সময়েও, মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানীর এক মহাবিপদ ঘটিল। এতদিন পর্য্যন্ত দেবীপ্রসাদ, মহারাজ রামকান্তকে নাটোর-রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণকরিতেছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুজাখাঁ ও সফর রাজখাঁর রাজত্বসময়ে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ বঙ্গের সকল জমিদারকে পূর্ব্ব হইতে সবিশেষ চিনিতেন না। তাঁহার চিনিবার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, তিনি পূর্ব্বে সৈন্যবিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন মাত্র। তাঁহার রাজত্বকাল উপস্থিত হওয়ায় দেবীপ্রসাদ আর একবার নিজ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টাকরিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া নবাবকে জানাইলেন যে, রাজসাহীর জমিদারীর অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ঐ জমিদারীর প্রকৃত

অধিকারী। তিনিই মহারাজ রামজীবনের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র। মহারাজ, রামকান্তকে শাস্ত্রবিধিপূর্ব্বক দত্তকগ্রহণ করেন নাই। রামকান্ত একজন গরিবের ছেলে। সে, মহারাজার শরণাপন্ন হওয়ায় মহারাজ তাহাকে স্বজাতীয় লোক বিবেচনাকরিয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন মাত্র। রাজসাহী-জমিদারীর নবাব-সরকারে প্রদেয় যাহা নির্দ্দিষ্ট কর আছে, তিনি (দেবীপ্রসাদ) তদপেক্ষা বেশী রাজস্ব দিতে প্রস্তুত আছেন। ইত্যাদিরূপে তিনি নবাবকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বহুমূল্য অনেক উপঢৌকন প্রদান করিয়া এবং বেশী রাজস্ব দিবার প্রলোভন দেখাইয়া নবাবকে সম্মত করিলেন। সফর্‌রাজ খাঁর অমিতব্যয়িতা-দোষে মুর্শিদাবাদের নবাবী কোষাগারে অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। রাজ্যে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য নূতন নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর প্রভূত অর্থের অতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। "উপস্থিত বস্তু পরিত্যাগকরা উচিত নয়," এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধানে কালক্ষয় না করিয়া দেবীপ্রসাদের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। দেবীপ্রসাদ নিজ-নামে রাজসাহী-জমিদারীর নূতন সনদ্‌ সংগ্রহকরিয়া নাটোরে উপস্থিত হইলেন। নাটোরে আসিয়াই মহারাজ রামকান্ত ও তাঁহার পত্নী মহারাণী ভবানীকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মহারাজ রামকান্ত এই ভয়ঙ্কর বিপদের

একমাত্র সঙ্গিনী বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী মহারাণী ভবানীকে এই ঘোর বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য একটা উপায় নির্দ্ধারণকরিতে বলিলেন। প্রসিদ্ধা বুদ্ধিমতী রাণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকরিয়া বলিলেন, এ বিপদে মুর্শিদাবাদে গিয়া জগৎশেঠের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায়ই নাই। মহারাজ রামকান্ত, মহারাণী ভবানীর সুমন্ত্রণানুসারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধমন্ত্রী দয়ারাম ও কতিপয় ভৃত্য সহ মুর্শিদাবাদে ফতেচন্দ্ জগৎশেঠের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণী ভবানীর এই রাজ্য-চ্যুতি সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ রামকান্তের যৌবনোচিত চাঞ্চল্যদোষে বিলাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাব সরকারে দেয় বার্ষিক রাজস্ব বাকি পড়িয়াছিল। সেই সময়ে তিনি স্বীয় প্রভুত্বশক্তির গর্ব্বে স্বর্গীয় পিতার বাক্য অমান্য করিয়া বৃদ্ধ দিওয়ান দয়ারামকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন মহারাজ রামকান্তের উত্তম মন্ত্রীর অভাবে ও কুসংসর্গ-প্রভাবে রাজকার্য্য-পরিচালনার মহাবিভ্রাট ঘটিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ তদনুসারে বাড়িয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ নবাব-সরকারে বার্ষিক রাজস্ব প্রদত্ত না হওয়ায় নবাবের সৈন্য আসিয়া নাটোর-রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া-

ছিল। এই সুযোগে দেবীপ্রসাদ মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে গিয়া নিজ-নামে রাজসাহী-জমিদারীর নূতন সনদ্ সংগ্রহকরিয়া নাটোরে আসিয়াই মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানীকে রাজবাটী হইতে বহিষ্কৃতকরিয়া দিয়াছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রবাদ শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ রামকান্তের সুচরিত্রের বিরুদ্ধে এই সকল কথা স্বকপোল-কল্পিত, জনশ্রুতি-মাত্র-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত, এবং ঐতিহাসিকপ্রমাণ-বিবর্জ্জিত বলিয়া অগ্রাহ্য। আবার কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, দিওয়ান দয়ারাম, মহারাজ রামকান্তের নবাব-সরকারে এই রাজস্ব-দানে অক্ষমতার সুযোগ পাইয়া অপমানের শোধ লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজার রাজ্যনাশ ঘটাইয়াছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি কথাও অগ্রাহ্য। কারণ, নবাব-সরকারের প্রাচীন কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ রামকান্তের শাসন-সময়েই রাজসাহী-রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নূতন নূতন জমিদারী তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। নাটোর-রাজ-কোষাগারে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরেই নবাব-দপ্তরে মহারাণী ভবানীর নামজারী দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য দেবীপ্রসাদের চাতুরী-প্রভাবে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। সেই বৎসরের কাগজপত্রে তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

দয়ারামের প্রভুভক্তি ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি কিঞ্চিৎ জমিদারী ফাঁকি দিয়া লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া প্রভু-পুত্র মহারাজ ও লক্ষ্মীস্বরূপা দয়াস্নেহবতী মহারাণী ভবানীকে রাজচ্যুত করাইয়াছিলেন ও তাঁহাদিগকে মহাবিপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। তিনি বহুকাল মন্ত্রিত্ব করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ রামজীবনের সময় হইতেই "তরফ্ নন্দকুজাদিগরে"র তালুকদার বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামজীবনের কৃপায় তিনি এই বৃহৎ তালুক লাভকরিরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে উহা ভোগকরিতেছিলেন। তিনি বহুবার মহারাজ রামজীবন ও রাজা রঘুনন্দনের নিকট হইতে বহু মহামূল্য পারিতোষিক লাভকরিয়াছিলেন। কুচক্রী দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্র-প্রভাবে মহারাজ রামকান্ত একবার রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং প্রভুভক্ত ক্ষমতাশালী বৃদ্ধ দিওয়ান দয়ারাম ও ফতেচন্দ্ জগৎশেঠের সাহায্যেই তিনি অধিকারচ্যুত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। তিনি ও মহারাণী ভবানী, দেবীপ্রসাদ কর্ত্তৃক রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছিলেন। পরে মহারাজ স্বীয় সহধর্ম্মিণী বুদ্ধিমতী মহারাণী ভবানীর সুমন্ত্রণানুসারে

রাজ্যোদ্ধারের জন্য মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাই ঐতিহাসিক সত্যঘটনা। এই সময়ে জগৎশেঠের অত্যন্ত গৌরবাবস্থা। তাঁহার ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ মহিমাপুর-নামে বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে সেই মহিমাপুরের লেশমাত্র মহিমা নাই। উহার অধিকাংশ ভাগীরথী-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই জগৎশেঠের দুর্দ্দশাগ্রস্ত বংশধরগণ সেই জরাজীর্ণ ভগ্নাবশিষ্ট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাসাদে বাসকরিয়া মনঃকষ্টে দিনযাপন করিতেছেন। সম্রাট্ ফেরোক্‌সাহার রাজত্বকালে এই শেঠবংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ পুরুষানুক্রমে জগৎশেঠ এই উপাধি এবং বঙ্গের নবাবের আসনের ঠিক পার্শ্বেই বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মুর্শিদাবাদে যখন যিনি নবাব হইয়াছেন, তখন এই বংশের যিনি যখন প্রধান ছিলেন, তিনিই ঐরূপ সম্মান পাইতেন। ইতিহাস-লেখক বিভারিজ্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই শেঠ-ভবনের যে কক্ষে বসিয়া বৃটিশ বণিকগণ গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা-করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই কক্ষ এক্ষণে ভাগীরথী-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস-লেখক হন্টার্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, যে স্থানে বাদ্‌সাহী "টাক্‌শাল" বা মোহর টাকা পয়সা প্রভৃতি নির্ম্মাণের মুদ্রাযন্ত্র-গৃহ ছিল,

তাহার চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। ইংরাজবণিকগণ তাহার সামান্য শেষ ইষ্টকখানিও, গুণগ্রাহী ধনী ইংরাজদিগের নিকটে উচ্চমূল্যে বিক্রয়করিয়াছেন। সেই মুদ্রাযন্ত্রের সাজ্‌সরঞ্জাম্ গুলির ভগ্নাবশেষ অন্যত্র যাদুঘরের গৌরব বৃদ্ধিকরিতেছে। জগৎশেঠের গৃহের যে কক্ষে বাৎসরিক "পুণ্যাহ-পর্ব্ব" উপলক্ষে বঙ্গের বড় বড় জমিদারকে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া অনুগ্রহ-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বহু ঘটিকা পর্য্যন্ত বিষন্ন বদনে বসিয়া থাকিতে হইত, যেখানে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার নবাবগণকে সময়ে সময়ে আসিতে হইত, যেখানে ভারতসাম্রাজ্য-সংস্থাপক বড় বড় বৃটিশ বণিকগণ, ঋণ গ্রহণের জন্য কিম্বা নবাবের অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জগৎশেঠের কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় মহাচিন্তান্বিত হইয়া যে কক্ষে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং প্রাসাদের সিংহদ্বারস্থ প্রহর-ঘণ্টার ধ্বনি গণনাকরিতেন, সেই সকল ঐতিহাসিক প্রাসাদ-কক্ষ এক্ষণে মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কেবল রাশি রাশি তৃণ-লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত কয়েকটি জরা-জীর্ণ ভগ্ন তোরণ ও কক্ষ এবং ইষ্টক প্রস্তর ও মৃত্তিকা-স্তূপ ব্যতীত আর তথায় কোন দ্রষ্টব্য বস্তুই নাই। কিন্তু প্রত্যেক জীর্ণ ইষ্টক, প্রস্তরখণ্ড ও ধূলিকণার সঙ্গে সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এখনও যেন সজীব হইয়া রহিয়াছে। এই শেঠভবনে নাটোর-রাজ-

পরিবারের যেরূপ মহাসমাদর ও সম্মান ছিল, তাহাতে মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানী রাজ্যচ্যুত হইবার পর স্বয়ং মুর্শিদাবাদে না আসিয়া যদি তথায় একজন প্রতিনিধিকে পাঠাইতেন, ও তাহার প্রমুখাৎ নিজেদের বিপদের কথা জগৎশেঠকে জানাইতেন, তাহা হইলেও, তাঁহাদের মানরক্ষার ক্রটি হইত না এবং তাঁহারা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন জগৎশেঠ তাঁহাদিগকে মহাসমাদর করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের রাজ্য-উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য, ক্ষমতাশালী অমাত্যদিগকে যোগ্যতানুসারে বহু বহুমূল্য উপঢৌকন-দানে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত এই কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ রামকান্তের সঙ্গে সে সময়ে তাদৃশ অর্থ না থাকায় তিনি পুনরায় মহা-বিপন্ন হইলেন। রাণী ভবানী তাঁহার বদন বিষণ্ণ দেখিয়া বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে বিষাদের কারণ নিবেদন করিবামাত্র রাণী ভবানী তৎক্ষণাৎ তাঁহার বহুমূল্য সমস্ত অলঙ্কার তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই অলঙ্কারগুলি শেঠজীর নিকটে বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয়করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ-করুন"। পতি বিপদে পড়িলেও, পতিকে, বিপদ হইতে

উদ্ধার করিবার জন্য অনেক সময় অনেক স্ত্রীলোক নিজের অলঙ্কারগুলি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া পতিকে প্রদান করেন না। এইরূপ ঘটনা বহুস্থলে দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়াছে। কিন্তু পতিব্রতা পতিদুঃখকাতরা সতী নারী মহারাণী ভবানীর পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব। তাই তিনি স্বামীকে বিপদ হইতে উদ্ধারকরিবার জন্য নিজের বহুমূল্য অলঙ্কার গুলির মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ঐ অলঙ্কারগুলি দয়ারামের হস্তে প্রদান করিলেন। দয়ারাম ঐগুলি শেঠজীর নিকটে বিক্রয়করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া বহুমূল্য বস্তু উপঢৌকন সংগ্রহকরিলেন। তারপর মহারাজ রামকান্ত, দয়ারাম ও জগৎশেঠের সহিত নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ উপঢৌকন সহ নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবাবকে যথারীতি উপঢৌকন দিয়া ও অভিবাদন করিয়া দরবারে বসিলেন। তারপর ফতেচন্দ্ জগৎশেঠ নবাবকে রাজসাহী জমিদারীর প্রকৃত অবস্থা এবং কে ইহার প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী, তাহা উত্তমরূপে প্রমাণ প্রয়োগের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। তখন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, ফতেচন্দ্ জগৎশেঠের বিশেষ প্রার্থনায় বিশেষরূপে খাতা-পত্র অনুসন্ধান করিয়া মহারাজ রাম-কান্তকেই পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ বঙ্গদেশে আসিয়া লোকের ধনশস্যাদি লুণ্ঠন করিয়া অকথ্য অত্যাচার-উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইতিহাসে ইহা বর্গীর উৎপাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্র-নরপতি শিবাজীর অর্থাগমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাঘোজী ভোন্‌স্‌লা ও তাঁহার মন্ত্রী ভাস্করপণ্ডিত-প্রমুখ মহারাষ্ট্র-দস্যু-দলপতিগণ, বহুসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রতিবর্ষেই বঙ্গে আগমনকরিয়া বঙ্গভূমিকে শশ্মানে পরিণত করিত। তাহাদের ভীষণ উপদ্রবে কত সতীর যে, সতীত্বনাশ হইয়াছে এবং কত লোকের যে, ধন প্রাণ মান নষ্ট হইয়াছে, এবং কত লোককে যে, নিজ নিজ "বাস্তুভিটা" পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নদিয়ার বিখ্যাত প্রতাপী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও, বর্গীর ভয়ে কৃষ্ণনগর ত্যাগকরিয়া মূলাজোড়ে গিয়া বাসকরিতে হইয়াছিল। বঙ্গের রাজা মহারাজ ও জমিদারদিগের কথা আর কি লিখিব, ষ্টুয়াট সাহেবের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন কি, স্বয়ং বঙ্গের স্বনামধন্য নবাব আলিবর্দ্দী খাঁও, তাঁহার পরিবারবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ইতিহাস-বিখ্যাত এই ভয়ঙ্কর উপদ্রবের সময় রাণী ভবানী যেরূপ অকুতোভয়ে প্রবল প্রতাপে ধন-জনবলে রাজনীতি জ্ঞান-প্রভাবে তাঁহার রাজসাহী-রাজ্যে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্ময় জন্মে। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার স্বনামধন্য পুরুষ স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, যিনি ইতঃপূর্ব্বে সহস্র সহস্র

সৈন্যের পরিচালক সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনিও, নিজ-পরিবারবর্গকে বর্গীর উপদ্রব হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিয়া যখন কুত্রাপি মনের মত নিরাশঙ্ক স্থান পাইলেন না, তখন মহারাণী ভবানীর রাজধানী নাটোরের নিকটবর্ত্তী রামপুরবোয়ালিয়ার অনতিদূরস্থ গোদাগাড়ী গ্রামে নিজ পরিবারবর্গকে রাখিয়াছিলেন। এই স্থানের নাম কেল্লা বারুইপাড়া। এই স্থানে নবাব এক বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। বর্গীর উপদ্রবের সময় এই দুর্গে তাঁহার পরিবারবর্গ নির্ভয়ে বাস করিত। ইহা রাণী ভবানীর রাজ্যমধ্যে স্থিত। এখনও, ঐ নবাবী দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও সীমাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র-দস্যুদিগকে শাসনকরিতে গিয়া নবাব আলিবর্দ্দী-খাঁর কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। বহুসেনাক্ষয় হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের নির্যাতনে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতিবর্ষেই এই উপদ্রবের মাত্রাটা মেদিনীপুর বর্দ্ধমান প্রভৃতি দেশেই বৃদ্ধি পাইত। এমন কি, "মুতক্ষরীণ্" প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠনকরিয়াছিল। মিল্ সাহেবের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলিবর্দ্দীখাঁর পঞ্চদশবর্ষব্যাপী রাজত্বের মধ্যে এমন একটি বৎসর অতীত হয় নাই, যে বৎসরে তাঁহাকে বর্গীর উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই। বঙ্গে

অদ্যাপি "ছেলে ঘুমল পাড়া জুড়ল বর্গী এল দেশে; বুল্‌বুলিতে ধান্ খেয়ে গেল খাজ্‌না দিব কিসে"? এই গানটি গাইয়া শিশুগণকে নিদ্রাক্লিষ্ট করিবার জন্য ভয় দেখান হইয়া থাকে। এই বর্গীর উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া পশ্চিম বঙ্গের সহস্র সহস্র অধিবাসী দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে পলায়নকরিয়া বাস করিয়াছিল। রাজসাহী প্রদেশ, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধি-শালী হইয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া ইউরোপীয় বণিকগণ, ইহার স্থানে স্থানে অনেকগুলি বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সকল বাণিজ্যালয় বা কুঠীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বর্গীর উৎপাতের সময় এই সকল ইউরোপীয় বণিকদিগকেও অত্যন্ত ভীত হইতে হইয়াছিল। তৎকালে জলপথেই অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করিত; কিন্তু মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ সেই সকল পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠনকরিবার জন্য নদী-তীরে বসিয়া থাকিত। সে সময়ে লুণ্ঠন-ভয়ে কেহ কলিকাতা অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিত না; ইহাতে অন্যদেশে বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইলেও কৃষি-প্রধান রাজসাহীর তাদৃশী ক্ষতি হয় নাই। এই সময়ে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামকান্ত সহসা পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার পত্নী মহারাণী ভবানীই অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরী হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্রবিপ্লব। স্বয়ং দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপী নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ মহারাষ্ট্র-দস্যুদিগের ভয়ঙ্কর

দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কত মহাপরাক্রম রাজা মহারাজা মান-প্রাণ-ধন-রক্ষার্থে অসমর্থ হইয়া স্বদেশ স্বরাজ্য ও স্বগৃহ পরিত্যাগকরিয়া পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। ঈদৃশ সময়ে রাণী ভবানী তিন তিনটি ভয়ঙ্কর শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও, নির্ভয়ে অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্র দুইটি একের পর এক, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তাহারপরই তাঁহার স্বামীরও অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একে এই তিনটি ভয়ঙ্কর শোক; তারপর চতুর্দ্দিকেই ভয়ঙ্কর এই রাষ্ট্রবিপ্লব; ঈদৃশ দুঃসময়ে এই বিশাল রাজ্য-রক্ষার মহতী চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি দৈনিক গীতাপাঠ ও গীতার্থ আলোচনার প্রভাবে এই সকল শোক ও চিন্তাকে দমনকরিয়া সর্ব্ব-প্রথম মহারাষ্ট্র দস্যুগণের উপদ্রব হইতে রাজ্যরক্ষার্থ উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় হইতেই যে, তাঁহার প্রকৃত রাজত্বকাল আরব্ধ হইল তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর জীবিতাবস্থাতেও তাঁহার রাজকার্য্য-পরিচালনার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বামী অপেক্ষা রাজকার্য্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব বেশী বুঝি-তেন। যখন দয়ারাম দিওয়ান ছিলেন, তখনও মহারাজ

রামকান্ত রাণীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। রাণীর বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া দয়ারামও সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রে যখন তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে সকল উপায় ও কৌশল অবলম্বনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল উপায় ও কৌশল রাণীর বুদ্ধির দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

দিওয়ান্ দয়ারামের অবসর-গ্রহণের পর রাণীর বুদ্ধির দ্বারাই এতবড় রাজ্য পরিচালিত হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী সমগ্র রাজ্যটা রাণীর নখদর্পণে প্রতিফলিত ছিল। গ্র্যাণ্ট্ সাহেবের "য়্যানালিশিস্ অব্ ফাইনান্শেস্ অব্ বেঙ্গল্" নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখন সমগ্র বঙ্গদেশ একাদশ "চাক্লা"য় বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাণী ভবানীর রাজ্য আট "চাক্লা"য় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই আট"চাক্লা"ই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবে পূর্ণ। "যার লাঠী তার মার মাটী" এই নীতি-বাক্যই তখন বঙ্গের জমিদারদিগের মূলমন্ত্র ছিল। যথা-সময়ে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে স্বীয় অধি-কারের মধ্যে স্বাধীন রাজার ন্যায় তখন রাজত্ব করিতে পারা যাইত। এহেন দুর্দ্দান্ত অবশ্য জমিদারগণ বর্গীর উপদ্রব-সময়ে স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগকরিয়া স্থানান্তরে গিয়া মহারাষ্ট্র-দস্যুগণের ভয়ে চোরের মত লুকাইয়া থাকিতে

যখন বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী, পতি-পুত্রহীনা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণীর পক্ষে অবিচলিত চিত্তে অত বড় রাজ্য শাসনকরা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তিনি প্রথমতঃ বর্গীর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার্থ ও প্রজারক্ষার্থ মথুরা পঞ্জাব ভোজপুর প্রভৃতি দেশের বলিষ্ঠ যুদ্ধনিপুণ সাহসী লোক সংগ্রহকরিয়া একটি বড় সৈন্যদল সংগঠিত করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ সৈন্যদল-সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয়করিতে হইয়াছিল। নাটোর-রাজবাটীর পার্শ্বেই এক প্রশস্ত সেনানিবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের বড়নগরস্থ প্রাসাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নাটোরেই কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে বাস করিতে হইয়াছিল। শুনা যায় যে, এই সময়ে তাঁহার এই বড়-নগর-প্রাসাদও মহারাষ্ট্র-দস্যুগণকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। শুনা যায় যে, এই দস্যুগণ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর নিকট হইতেও "চৌথ্" বা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজস্বের চারি অংশের এক অংশ প্রতিবর্ষে আদায় করিত। ইহা ছাড়া তাহারা তাঁহার নিকট হইতে কখন দশলক্ষ কখন বা বারলক্ষ টাকা অতিরিক্তরূপে আদায়করিয়া লইত। আলিবর্দ্দীখাঁ ইহাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে অবসন্ন হইয়া

অবশেষে কুটনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন মহারাষ্ট্র-দস্যুদলপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজের শিবিরে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণকরিয়া আনিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই বঙ্গে বর্গীর উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত "মন্‌সুর্‌জি" ও "চৌথ্‌মারহাট্টা" প্রভৃতি নামে অনেক প্রকার "বাজে জমা" বা অতিরিক্ত দেয় কর প্রচলিত হইয়াছিল। রাণী ভবানী, নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত এই "বাজে জমা" অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করিয়াও, নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। তখন যাঁহারা রাজস্ব ও "বাজে জমা" সকল ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর বাকি ফেলিতেন, নবাব-সৈন্য তাঁহাদের গৃহ লুণ্ঠনকরিয়া অকথ্য উৎপীড়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইত এবং তথায় নবাবী কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিত। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের দেয় রাজস্ব চুকাইয়া না দিতেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নবাবী কারাগারের নরকযন্ত্রণা ভোগকরিতে হইত। সামান্য জমিদারগণের উপরই যে, এইরূপ উৎপীড়ন হইত তাহা নহে, কিন্তু নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় বিখ্যাত প্রতাপী জমিদারদিগের উপরেও এইরূপ ঘোর উৎপীড়ন হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে একবার নয়, এমন কয়েকবার এইরূপ ভীষণ যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে।*

মহারাণী ভবানীর দুইটি পুত্র ও স্বামী অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার একমাত্র কন্যা তারাদেবীই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল হইয়া পড়িল। তারাদেবীকে তিনি বাল্যকালে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদানকরিয়াছিলেন। তারাদেবী জমিদারী-কার্য্যেও অতিশয় শিক্ষিতা হইয়া-ছিলেন। রাণী ভবানী বৃদ্ধাবস্থায় তারাদেবীর মন্ত্রণা-সাহায্যেই রাজকার্য্য পরিচালনকরিতেন। কারণ, দয়ারাম

---

* একবার কোন কারণবশতঃ ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। মহারাজ মনে-করিয়াছিলেন যে, জগন্নাথ সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত আর কিছুই নয়। একটা সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভয় করিয়া চলিলে জমিদারী না করাই ভাল। জগন্নাথপণ্ডিত আমার কি করিবে? কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাল-যাপন করিতে ছিলেন। বিখ্যাত মেধাবী তেজস্বী বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মহারাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাবের হিন্দু পারিষদ একজন মহারাজকে সেই অপমানের কথা নিবেদনকরিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে অত্যন্ত সম্মানকরিতেন। তাঁহাকে কে না সম্মান করিত? কৃষ্ণনগরের মহারাজকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খোষামোদ করিয়া আকাশে তুলিয়াদিতেন বলিয়াই মহারাজ দিন দিন গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি জগন্নাথকেও সেই শ্রেণীর প্রধান পণ্ডিত মনে-করিয়া তাঁহার প্রতিও প্রভুত্বভাব দেখাইতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ, মহারাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় তেজস্বিতাভাব দেখাইতেও ত্রুটি

ইতঃপূর্ব্বেই নাটোরের দেওয়ানী-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণকরিয়াছিলেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে পরলোকং গমন করিয়াছিলেন। খাজুরা-গ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই তারাদেবী বিধবা হইয়াছিলেন। রাণী ভবানী তারাদেবীকে নাটোর-রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিবার মানসে নবাব-সরকারের কাগজ-

---

করেন নাই। ইহাতেই পরস্পরের বিবাদ ঘটিয়াছিল এবং অবশেষে মহারাজ জগন্নাথকে অপমান করিয়াছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় অদ্ভুত মেধাবী পণ্ডিত বঙ্গে জন্মগ্রহণ করেনাই। তাঁহার প্রখর মেধার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মানকরিতেন। বঙ্গের হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম চিফ্‌জষ্টিশ স্যার্ উইলিয়াম জোন্স্ ও তাঁহার পত্নী লেডী উইলিয়াম্ জোন্স্ তাঁহার ত্রিবেণীস্থ বাটীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। লেডীজোন্স্ তাঁহার সহিত সংস্কৃতে কথা কহিতেন। মগরার নিকটবর্ত্তী আকনা গ্রামের একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, তিনি তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, এমন কি, ভারতের সর্ব্বপ্রথম বড়লাট্ ওয়ারন্ হেষ্টিংস্ সাহেব পর্য্যন্ত ত্রিবেণীগ্রামে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কোম্পানির জন্য "বিবাদভঙ্গার্নব-সেতু" নামক হিন্দু "আইন্" গ্রন্থ-সংকলনার্থ মাসিক সাত শত টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। তৎকালে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে সাত শত টাকার কত মূল্য ছিল, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ মাত্রেই অবগত আছেন।

পত্রে জামাতা রঘুনাথের "নামজারি" করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে রাণীর আশা ফলবতী হয় নাই। তারাদেবীকে সকলে "তারা ঠাকুরঝী" বলিত। দয়ারাম অবসর গ্রহণকরিয়া যে সময়ে দিঘাপতিয়ায় নিজবাটীতে থাকিয়া নিজের জমিদারীর উন্নতিসাধন করিতেন, সেই সময়ে তিনি অবকাশ পাইলে নাটোরে আসিয়া মহারাণী ও তারাদেবীর তত্ত্ব লইতেন। দয়ারামের সহিত তারাদেবীর

এ হেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে অপমানকরায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ইহার বিলক্ষণ ফল ভোগকরিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে নবাব-সরকারে মহারাজার বহুলক্ষ টাকা দেয় রাজস্ব বাকি পড়িয়াছিল। এইসূত্র পাইয়া নবাবের পারিষদ সেই হিন্দু মহারাজ জগন্নাথেরপ্রতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের-কৃত সেই অপমানের শোধ লইবারজন্য নবাবকে বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রকে কৃষ্ণনগর হইতে বন্দীকরিয়া মুর্শিদাবাদে আনাইয়া নবাবের ভীষণ কারাগারে নিক্ষেপকরিয়াছিলেন। পরে মহারাজ নবাবসরকারে রাজস্ব চুকাইয়া দিয়া সেইবার নিষ্কৃতি লাভকরিরাছিলেন। বহুদিবস পরে দীপান্বিতা কালী পূজার রাত্রে হটাৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কৃষ্ণনগর-রাজ-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে পূজার সময়ে পূজার দালানে উপবিষ্ট মহারাজ, জগন্নাথকে দেখিয়াই বলিলেন "কিমদ্ভুতম্"। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার? অর্থাৎ আমাকে এত নিগৃহীত করিয়া বিনা নিমন্ত্রণে আবার আমার বাড়ীতে আসা হইল কেন? জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ আর তিন চরণ পূরণ করিয়া এই শ্লোকটি রচনা করিয়া তাহার উত্তর দিলেন :—

শিবস্য নিন্দয়া যয়াত্যজদ্বপুঃ স্বকীয়কম্।
তদংঘ্রিপঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্॥

অর্থাৎ দক্ষকন্যা সতী, শিবের নিন্দা-শ্রবণে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া

মধ্যে মধ্যে কলহ হইত। তারাদেবী জমিদারীর কাগজ-পত্র একবার পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, দয়ারাম কেবলমাত্র নিজের নামটি স্বাক্ষর করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছেন। রাজভৃত্যের পক্ষে এইরূপ কার্য্য করা অন্যায়। যে সকল ব্রাহ্মণকে ঐ সকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি দেওয়া হইয়াছিল, তারাদেবী তাঁহাদিগকে রাজবাটীতে আহ্বান করাইয়া জানাইলেন যে, দিওয়ানের রাজকার্য্য-পরিচালনার অধিকার থাকিলেও ভূমি-দানের অধিকার নাই। ব্রাহ্মণগণ বিপন্ন হইয়া দয়ারামের শরণাপন্ন হইলেন। দয়ারাম কোন প্রতিবাদ না করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে বলিলেন, আপনারা নাটোর-রাজবাটীতে চলুন। আমি কিঞ্চিৎ পরেই আসিতেছি। এই বলিয়া তিনি

নিজদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন। যিনি পতি-নিন্দা-শ্রবণে নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পতি-নিন্দা-শ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার চরণদ্বয় শিবের বক্ষের উপরে বিরাজমান!! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্রোধ অল্পকাল স্থায়ী। তিনি মহারাজের এতদূর অপমান ঘটাইয়া ভাল কার্য্য করেন নাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থকরা পাপ। অতএব মহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে সন্তুষ্ট করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি হটাৎ দীপান্বিতা-পূজার রাত্রে কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের নবচরিত।

এক-খণ্ড কাগজ লইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া দরবারগৃহে প্রবেশকরিলেন। দরবারের এক প্রান্তে পর্দ্দার অন্তরালে মহারাণী ভবানী ও তাঁরাদেবী সমাসীনা ছিলেন। দয়ারাম যথারীতি দরবারে বসিলে তারাদেবী পর্দ্দার ভিতর হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মোত্তর-দানপত্রে তাঁহার নিজ নাম স্বাক্ষর করিবার কি অধিকার আছে? দয়ারাম বলিলেন, মা, রাজ সরকার হইতে যে সকল ব্রহ্মোত্তরভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দানকরা হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্মোত্তরভূমির দানপত্রে আমি মাত্র রাজভৃত্য হইয়া নিজনাম স্বাক্ষর করিয়াছি বলিয়া যদি ঐ ভূমিদান অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই জীর্ণ পত্রে লিখিত বিষয়টিও কি সেই নিয়ম অনুসারে অসিদ্ধ হইবে? ইহাতে কেবলমাত্র আমারই স্বাক্ষর আছে। এই বলিয়া তিনি একখানি জীর্ণ পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, দেখুন, ইহা আপনার মাতাঠাকুরাণী মহারাণী মহোদয়ার বিবাহের লগ্নপত্র। ইহাতে কেবল আমারই স্বাক্ষর আছে। দয়ারাম মহারাণী ভবানীর বাল্যদশায় ছাতিনগ্রামে গিয়া মহারাজ রামকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রথম স্থির করিয়াছিলেন। পরে ঐ বিবাহের লগ্নপত্রে মাত্র নিজের নামটি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তারা ঠাকুরাণী দয়ারামের এই কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ব্রহ্মোত্তরদান অসিদ্ধ হইল না। রাণী ভবানীও, পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া-

ছিলেন। তিনি তারাদেবীকে বলিলেন, "তারা, দয়াদাদাকে আর বিরক্ত করিও না। বিরক্ত করিলে আরও স্পষ্ট স্পষ্ট কথা শুনিতে হইবে"। স্বয়ং মহারাণী ভবানী দয়ারামকে দয়াদাদা বলিয়া ডাকিতেন ও স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাসুরের ন্যায় তাঁহাকে সম্মানকরিতেন। "দয়াদাদা"ও, তাঁহাদের জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য দেহ মন প্রাণ সমর্পণকরিয়াছিলেন এবং নাটোর-রাজ্যের উন্নতির জন্য জীবনের প্রায় সমস্ত ভাগই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সর্ব্বলোক-বিদিত দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী যুবক নবাব সিরাজদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বতন নবাবগণের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র-দস্যু, গোঁসাই, বর্গী, রাঢ়দেশীয় ডাকাত, নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট মুসলমান, পর্টুগিজ্, মগ্ ও আরাকান্‌দেশীয় জলদস্যু ও স্থলদস্যুদিগের ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে দেশরক্ষার উত্তম ব্যবস্থা না থাকিলেও রাণী ভবানী স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে নিজরাজ্যমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে তাঁহাকেও বিচলিত হইতে হইয়াছিল। সিরাজের রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্রদেশ মহাবিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুপ্রজার ধর্ম্ম অর্থ মান প্রাণ বজায়-রাখিয়া দিন যাপনকরা মহাকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

নিতান্ত দুর্দ্দান্ত সিরাজ ও তাঁহার পারিষদবর্গের উপদ্রবে সতীর সতীত্ব রক্ষাকরা মহাকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। মানীর মান রক্ষাকরা অসম্ভব হইয়াছিল। ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষাকরা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় ইংরাজগণ এই সিরাজ-উৎপীড়িত দেশ রক্ষা না করিলে দেশের যে, কি ভয়ঙ্কর শোচনীয় পরিণাম ঘটিত, তাহা বস্তুতঃই অবর্ণনীয়। "যার লাঠি তার মাটি," এই নীতি পূর্ব্বেও দেশে অনুসৃত হইত বটে, কিন্তু সিরাজের সময়ে দিল্লীর সম্রাট একেবারে অকর্ম্মণ্য ও শক্তিহীন হইয়া পড়ায় অনেকেই ঐ নীতিমন্ত্র-সাধনায় দীক্ষিত হইতে লাগিল। এই মন্ত্রের সাধক হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে লাগিল। দেশে পূর্ণমাত্রায় অরাজকতা বিরাজকরিতে লাগিল। দেশের অশান্তি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইদানীং কোন কোন পুস্তকলেখক সিরাজকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিররূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেও সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে জগতের সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় সংস্কারটি কখনই ঘুচিবে না। দুই একখানি পুস্তক লিখিলে সিরাজের কলঙ্ক-কালিমা কখনই বিধৌত হইতে পারে না। কারণ, যাঁহারা ঐ সকল পুস্তক পাঠকরিবেন তাঁহারাই ঐ সকল পুস্তক হইতে নূতনতত্ত্ব অবগতহইতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা মোটেই পুস্তক পাঠকরেন না, সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে কেবল প্রচলিত প্রবাদ মাত্র শ্রবণকরিয়া থাকেন,

সেই প্রবাদ-শ্রবণে তাঁহাদের হৃদয়ে যে সংস্কারটি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সে সংস্কারটি বিলুপ্ত হইবে কিরূপে? কেহ কেহ বলেন, ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ সিরাজের চরিত্র বিকৃতরূপে বর্ণনা করিয়া লোকের কুসংস্কার উৎপাদন করিয়াছেন। ইহাও অত্যন্ত ভুল কথা। কারণ, যাহারা সমগ্র জীবনে ইংরাজীর একবর্ণও শিক্ষা করে নাই, বা ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে সিরাজ সম্বন্ধে একবর্ণও শ্রবণকরে নাই, যাহারা সহর হইতে বহুদূরে অরণ্যময় পল্লীগ্রামে বাসকরে, যেখানে ইংরাজি-শিক্ষিত এক ব্যক্তিও নাই, ঈদৃশ মূর্খ কৃষকগণও, কোন দুষ্ট অনিষ্টকারী উদ্ধত ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, "ব্যাটা যেন নবাব সিরাজদ্দৌলা"। কেহ কেহ আবার ইতিহাসের অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহির করিয়া বিদ্যা "জাহির" করিয়া থাকেন যে, রাণী ভবানী এদেশে ইংরাজের রাজত্বের পক্ষপাতিনী ছিলেন না। সিরাজের রাজত্বের পক্ষপাতিনী ছিলেন, বা মুসলমান রাজত্বের পক্ষ-পাতিনী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এদেশে হিন্দু-সাম্রাজ্যের পক্ষপাতিনী ছিলেন। এ সকল কথাও অত্যন্ত ভুল কথা। কারণ, যে সিরাজদ্দৌলা, তাঁহার কন্যা তারা-দেবীর অসামান্য রূপলাবণ্যের প্রশংসা-শ্রবণে কর্ণের তৃপ্তি-সাধন করিয়া চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং মহারাণী ভবানীর ধর্ম্ম-প্রাণে মহাভীতিসঞ্চারকরিয়া-

ছিলেন, যাঁহার ভয়ে মহারাণী মহাবিপন্ন হইয়া ভীম-পরাক্রম বলিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের সাহায্যে সেই মহাবিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাদৃশ অত্যাচারী সিরাজের রাজত্বের পক্ষপাতিনী হওয়া মহারাণীর পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। তারাদেবীর প্রতি নবাব সিরাজের অত্যাচার চেষ্টা, জগৎশেঠের পুত্রবধূর প্রতি নবাব সফর রাজের অত্যাচারের কথা মিথ্যা হইলেও, নবাবদিগের চরিত্রের কথা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। এক এক জন নবাবের বহুসংখ্যক বেগম থাকিলেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ হইত না। তাঁহারা কোন ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইলেই অন্ততঃ তাঁহাকে একবার দেখিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক রাজস্ব যথাসময়ে আদায় করিয়া স্ব স্ব সুখভোগবিলাসের ব্যয়োপযোগী অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ দিল্লীতে সম্রাটসমীপে প্রেরণকরাই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল এবং কোন কোন নবাব দিল্লীতে মোটেই রাজস্ব প্রেরণ করিতেন না, ইহা রাণী ভবানী বেশ বুঝিতেন। নবাব সরকারে যথাসময়ে বার্ষিক রাজস্ব দিয়া জমিদারগণ স্ব স্ব জমিদারীর মধ্যে স্ব স্ব প্রজার প্রতি সহস্র সহস্র প্রকার অত্যাচার করিলেও, স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে প্রবলতরঙ্গপূর্ণ পাপ-মহানদীর সৃষ্টি করিলেও নবাবগণ তাহার কোন সন্ধানই লইতেন না।

এখনকার মত তখন গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে পুলিশের শাসন ছিল না। এত দেওয়ানি-ফৌজদারী আদালত ছিল না। প্রাদেশিক হাইকোর্ট ছিল না। ইংরাজরাজত্বের সুবিচারের ন্যায় সুবিচার ছিল না। ছিল কেবল অদ্ভুত "কাজীরবিচার" ও ফৌজদারের অত্যাচার। তাঁহার শ্বশুর যাঁহার ভৃত্য ছিলেন, এবং যাঁহার কৃপায় তাঁহার শ্বশুরের নাটোর-রাজ্য-লাভ হইয়াছিল, সেই মুর্শিদকুলীখাঁও, নিজ প্রভু আজিম ওশ্মানের কিরূপ অনুগত ভৃত্য ছিলেন, প্রভুর প্রতি তিনি কেমন ভৃত্যোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর কথায় —সম্রাট পৌত্রের কথায়—তিনি কিরূপ সহনশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, রাণী ভবানীর তাহা জানিতেও বাকি ছিল না। নবাবীআমলে রাজ্যশাসন করিয়া রাণী ভবানীকে অনেক ক্লেশ ভোগকরিতে হইয়াছে। তিনি নবাবী চরিত্র ও নবাবী রাজ্যশাসনতন্ত্রের সারমর্ম্ম বুঝিয়া যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাবী রাজত্বের পক্ষপাতিনী হওয়া প্রসিদ্ধা বুদ্ধিমতী রাজনীতিশাস্ত্রপণ্ডিতা রাণী ভবানীর পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। যে আলিবার্দ্দীখাঁ ইতিহাসে বুদ্ধিমান সুবিবেচক ধার্ম্মিক প্রকৃত বিচারক প্রজাহিতৈষী ও সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত, সেই আলিবর্দ্দীখাঁর রাজত্বকালে সেই আলিবর্দ্দীখাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা সুবিবেচনা ও সুবিচারের ফলে রাণী ভবানীকেও দেবীপ্রসাদ-পরিচালিত

বিপচ্চক্রে পড়িয়া রাজবাটী হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল, দেশত্যাগিনী হইতে হইয়াছিল এবং অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুলবধূ ভাবিনী অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী হইয়া কুষীদজীবী জগৎশেঠের দ্বারে তাঁহাকে শরণ লইতে হইয়াছিল। নবাবদিগের বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সুবিবেচকতার পরিচয় পাইয়া রাণী ভবানী বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগকরিয়াছিলেন, দারুণ মর্ম্মব্যথা পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্বান বিচারক নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ" নামক গ্রন্থে নবাবী অত্যাচারে উৎপীড়িতা নবাবীরাজ্য-উচ্ছেদকামনায় জগৎশেঠভবনে গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় পর্দ্দারঅন্তরালেউপবিষ্টা রাণী ভবানীর উক্তি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীম অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে
সহি কিসে মাতৃদুঃখ"।

জগৎশেঠ ও দয়ারামের চেষ্টায় তাঁহার হস্তচ্যুত রাজ্যের উদ্ধার সাধিত হইলেও, অব্যবস্থিতচিত্ত, যথেচ্ছাচারী, হঠকারী, চাটুভাষি-কর্ণেজপদিগের ক্রীড়কন্দুক, ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, বিলাসী, ব্যসনী নবাবদিগের রাজ্যশাসনতন্ত্রের মন্ত্রের জ্বালায় রাণী ভবানী অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর মুর্শিদকুলীখাঁকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধারকরিয়া-

ছিলেন বলিয়া—মুর্শিদকুলীর্খাঁর মহাউপকার করিয়াছিলেন বলিয়া মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট হইতে প্রত্যুপকার পাইয়াছিলেন।' নতুবা বঙ্গের অন্যান্য অনেক জমিদারকে মহম্মদরেজার্খাঁ-কৃত অকথ্য অপমান ও অবাচ্যযন্ত্রণা ভোগকরিতে হইয়াছিল ও মুর্শিদাবাদের ঘোর অন্ধকার-আচ্ছন্ন ভীষণকারাগারে নিক্ষিপ্তহইয়া অবর্ণনীয় নরকভোগ করিতেহইয়াছিল, ইহাও বুদ্ধিমতী মহারাণী ভবানী বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। রাণী ভবানীর ধৈর্য্যশীলতা, নির্ভীকতা, শক্তিমত্তা, শ্রমসহিষ্ণুতা ও প্রজাবৎসলতার তুলনা নাই বলিয়া তিনি সেই ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবযুগেও স্বীয় বিশাল রাজ্য রক্ষাকরিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা অন্যের পক্ষে ঐরূপ রাজ্যরক্ষা করা অসম্ভব হইত। যাঁহারা বলেন, রাণী ভবানী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতিনী ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত। কারণ, রাণী ভবানী যে সময়ে বঙ্গে নিজ রাজ্য শাসনকরিতেছিলেন, সে সময়ে হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের কথা আকাশে প্রাসাদনির্ম্মাণের কথার ন্যায় অগ্রাহ্য।

প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম বঙ্গে হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের প্রয়াসী হইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, একথাও রাণী ভবানী বিলক্ষণ জানিতেন। যে দেশে পিতা ও পুত্র একমনাঃ হইয়া একটি কার্য্য করিতে পারে না, যে দেশে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরস্পর মনের মিল

নাই, সে দেশে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করা অত্যন্ত অসম্ভব, ইহাও রাণী ভবানী জানিতেন। ব্যষ্টি উত্তমরূপে প্রস্তুত না হইলে সমষ্টি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহাও তিনি জানিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রতাপাদিত্য বা সীতারামের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি দেখিয়া যশোহর জেলায় তাঁহাদের স্বজাতীয় পরশ্রীকাতর কায়স্থজমিদারগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর রাজত্ব-কালেও "যার লাঠী তার মাটি," এই নীতিমন্ত্রের সাধনায় অনেকেই রত থাকিতেন। বঙ্গের জমিদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য-রক্ষার জন্যই সদা বদ্ধপরিকর হইতেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে নবাবকেই প্রদেয় রাজস্ব দিতেন না। পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি ছিল না। ত্যাগস্বীকার ছিল না। সংযম ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পর বিবাদমান হইতেন। দেশে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজকরিত। নবাব-গণ তাঁহাদিগকে শাসনকরিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদিগকে সংযত করিতে উপায়ান্তর না দেখিয়া নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের উপর অকথ্য ঘোর উৎপীড়নের ব্যবস্থাকরিতেন। এক জমিদার অন্য জমিদারের অনিষ্টসাধনের উপায়-উদ্ভাবনে রত থাকিতেন। এই সকল জমিদারদিগকে লইয়া বঙ্গে একটি হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা পোষণকরা বুদ্ধিমতী রাজ্যশাসনে

অভিজ্ঞা রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ধর্ম্মরতা পরিণামদর্শিনী রাণী ভবানীর পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব ছিল। তিনি প্রতিবেশী জমিদারগণের চরিত্র উত্তমরূপে বুঝিয়া ছিলেন। তাঁহার ধনবল জনবল বুদ্ধিবল ধর্ম্মবল ও চরিত্রবল ছিল বলিয়া প্রতিবেশী জমিদারগণ বা নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। নবাবী রাজ্যধ্বংসের পর বঙ্গের জমিদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য-রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত থাকুক্, প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বল ক্রমান্বয়ে উৎপীড়িত হউক, পরস্পরের কলহ উপলক্ষে দেশ সর্ব্বদাই রুধিরধারায় রঞ্জিত হউক, ধর্ম্মাধিকরণে বিচারব্যবস্থার পরিবর্ত্তে লগুড়প্রভাবে বিচারসিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হউক, এইরূপ ইচ্ছা রাণী ভবানীর ন্যায় শিক্ষিতা রাজনীতিজ্ঞা সুশীলা লোকহিতৈষিণী মহিলার হৃদয়ে উদিত হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব। তিনি ইংরাজের পরিবর্ত্তে দেশীয় জমিদারগণের সম্মিলনে বঙ্গে একটি স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের বা পৃথক্ পৃথক্ একটি একটি জমিদারের অধীনে পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনের পক্ষপাতিনী ছিলেন, এই কথা বলিয়া তাঁহার অন্যায় ও অপ্রকৃত প্রশংসা করা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে কোম্পানীর কর্ম্মচারী অথচ ব্যবসায়ী ইংরাজগণ বঙ্গের কৃষক ও তন্তুবায়দিগকে দাদন দিয়া তাহাদের উপর ঘোর অত্যাচার করিবেন, তাহাদের

সর্ব্বনাশ সংসাধন করিবেন, তাঁহারা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিয়াও দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবেন না, সিরাজদ্দৌলার সৈন্যাধ্যক্ষ নূতন নবাব মির্‌জাফর্‌আলিখাঁকে তাঁহারা কলের কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে বসাইয়া পুনরায় কল টিপিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিবেন, আবার সিংহাসনে বসাইবেন, তাঁহারা দেশের প্রজার কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতিকারে পরাঙ্মুখ থাকিবেন, রাণী ভবানীর পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই ইত্যাদিরূপে বিবেচনা করিবার কোন কারণই ছিল না। ইংরাজের দেশ বিলাতে যদি সাধু, সদ্‌বিবেচক, রাজনীতি-বিশারদ, পরদুঃখকাতর উদারচরিত মহাত্মা মহাপ্রভাব লোক সকল না থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্ব-প্রথম বড়লাট ওয়ারণ হেষ্টিংস্‌ সাহেবের অপরাধের বিচারের জন্য বিলাতে ইতিহাসবিখ্যাত তুমুল কাণ্ড ঘটিত না। বিলাতে ঐরূপ মহাপ্রাণ তেজস্বী সুবিচারক না থাকিলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব মহোদয় সহজেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহাকে এত লাঞ্ছিত হইতে হইত না। যিনি একদা বহুকোটি ভারতীয় প্রজার দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকেও স্বদেশ গিয়া স্বদেশ-বাসীর নিকটে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য—বিচারালয়ে স্বীয় অপরাধের বিচারকার্য্যে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কপর্দ্দকশূন্য হইতে হইয়াছিল। ইহাই বিলাতের ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয়।

একটা রাজ্যবিপ্লবের পর রাজার বিনাশ সাধিত হইলে সেই রাজ্য যদি বিদেশীয় রাজার হস্তগত হয়, তাহা হইলে ঐ নূতন রাজত্বের প্রারম্ভকালেই সহসা শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দেশে মহাঅশান্তি ঘটে। এই জন্যই নিজদেশে রাজ্যের ধ্বংস কামনা করিতে নাই। ঐরূপ কামনাকরা মহাপাপ। ইহাই পবিত্র হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ। এই তথ্যটুকু ইতিহাসগ্রন্থ শিক্ষা দিয়া থাকে। নূতন রাজত্বের প্রারম্ভে শাসনবিষয়ে অব্যবস্থা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। নূতন রাজা ভাল হইলেও রাজ-পুরুষগণ বুদ্ধিমান বিবেচক ও কার্য্যকুশল হইলেও, দেশে সহসা শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ইতিহাস-পাঠে এই তত্ত্বটুকু বুঝিতে পারা যায়। আলিবর্দ্দীখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর সম্রাটের আজ্ঞা ও সনদ্ ব্যতিরেকেই বলপূর্ব্বক বঙ্গের সিংহাসনে উপবেশনকরিয়া যে সকল কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। সুতরাং রাণী ভবানীর বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া ঐ সকল কথা লিখিয়া গ্রন্থকলেবর বিস্তৃতকরা নিষ্প্রয়োজন। তবে, যেটুকু প্রাসঙ্গিক কথা, সে টুকু না লিখিলে চলেই না। সিরাজদ্দৌলাকে যাঁহারা অধুনা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগকে অন্যায়রূপে আক্রমণকরেন, তাঁহাদের এই টুকু বুঝা উচিত যে, সিরাজ প্রথম শ্রেণীর

উৎপীড়ক না হইলে সংসারত্যাগী সাধু ফকির ভিক্ষোপ-জীবী দীন দানাশাহ তাঁহাকে ধরাইয়া দিল কেন? তিনি পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া লুৎফউন্নিশানাম্নী তাঁহার প্রিয়তমা বেগমের সহিত যখন নৌকাযোগে পাটনা অভিমুখে গুপ্তভাবে পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জলপথে ক্ষুধায় কাতর হইয়া দানাশাহনামক ফকিরের মস্‌জিদে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে দানাশাহ তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল কেন? তিনি কি নিরীহ দীন ভিক্ষোপজীবী ঐ ফকিরকে পূর্ব্বে একবার নিগৃহীত করেন নাই? তিনি একবার ঐ ফকিরের একটি কর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে একটা অপবাদ রটে নাই কি? ব্যক্তিবিশেষের নামে একটা অপবাদ রটে কেন? নিষ্কারণেই রটে কি? মূলে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত না থাকিলে অকারণ একজনের নামে একটা অপবাদ কখনই রটে না। সিরাজদ্দৌলা রাণী ভবানীর মনে একটা বিষম আঘাত দিয়াছিলেন এইরূপ একটা প্রবাদ থাকাতেই রাণী ভবানী-প্রকরণে সিরাজ সম্বন্ধে এই টুকু লিখিতে হইল। সিরাজ, রাণী ভবানীর কন্যা তারাদেবার অসামান্য রূপলাবণ্যের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য মহাব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই বিষয় লইয়া অনেক পুস্তকে অনেকপ্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন মুর্শিদাবাদের

বড়নগরস্থ নাটোর-রাজবাটীর ছাদের উপরে তারাদেবী তাঁহার সুদৃশ্য সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি আলুলায়িত করিয়া রৌদ্রে শুখাইতেছিলেন। সেই সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা নদীগর্ভে বজ্‌রায় আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে তারাদেবীকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তারাদেবীর জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রথম তিনি রাণী ভবানীকে পত্রদ্বারা নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া জানাইয়াছিলেন। পরে রাণী ভবানী ঐ পত্র-বাহককে যথেষ্ট অপমানকরাইয়া রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দিলে সিরাজ নিজেকে অপমানিত জ্ঞানকরিয়া তারাদেবীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার জন্য এক সেনানীকে আদেশ করেন। সেনানী কতিপয় সৈন্য সহ বড়নগরস্থ রাজবাটী আক্রমণকরিলে রাণী ভবানী ও তারাদেবী সেই সংবাদ অবগত হইয়া রাজবাটীর পশ্চাদ্ভাগস্থিত গঙ্গাতীরে যাইবার গুপ্ত "খিড়কিদ্বার" দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরের উপর দিয়া দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে তাঁহারা মস্তরাম বাবাজীর আখ্‌ড়ায় পৌঁছিয়া আশ্রয় লইলে মস্তরাম বাবাজী তাঁহাদিগকে বলিল, "মাইলোক, কুছ্‌ ডর্‌ নহি। হাম্‌লোক্‌ গোসাঁই হায়্‌। হাম্‌লোক্‌ নবাবী রাজত্বকো উড়ায়্‌ দেগা। হামলোগোংকে পাশ্‌ অস্ত্র-শস্ত্র সব্‌ কুছ্‌ চিজ্‌ হায়। হিঁয়া নবাবকে ফৌজ আনেসে হাম্‌লোক্‌ টুক্‌ড়া টুক্‌ড়া করকে কাট্‌ডালেংগে। মাইলোক্‌, কুছডর্‌

নহি হায়। হাম্‌লোক্‌, আপ্‌লোক্‌কো ঘর্‌মে পঁহুছায় দেংগে”। অনন্তর সেই সন্ন্যাসীরা তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে নাটোরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া নানাগ্রন্থে নানারূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সন্ন্যাসীদের সাহায্যে যে প্রকারেই হউক, রাণী ও তারাদেবী যে, এই বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, এবং সন্ন্যাসীদের পরাক্রম সেই সময়ে যে, খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ ও অন্যান্য গ্রন্থ-পাঠেই জানিতে পারা যায়। হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীরাই যে, কেবল সে সময়ে মহাপ্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নয়, বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরাও অত্যাচারপূর্ণ নবাবীরাজ্য ধ্বংসকরিয়া শান্তিপূর্ণ হিন্দু-রাজত্ব-সংস্থাপনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজসাহীর ভবানীপাঠক ইহাদের মধ্যে অন্যতম নেতা-ছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী সৈন্য ছিল। তাহারা নিবিড় জঙ্গল মধ্যে বাসকরিত। তাহারা নবাবের খাজনা লুঠকরিয়া ব্যয়নির্ব্বাহ করিত এবং নবাবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত মহাবিপন্ন জমিদার ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে ঐ ধন দানকরিয়া সাহায্য করিত। মুসলমান নবাবের ধন লুঠকরিয়া হিন্দুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিত। ভবানীপাঠক একজন মহামহোপাধ্যায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজবিদ্রোহী হইয়া পাপ আচরণ করিতেন। ইহাই তাঁহার একটি মহাদোষ ছিল। তিনি হিন্দুর

কাতরক্রন্দন শ্রবণে অস্থির হইয়া নবাবী উৎপীড়ন হইতে বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসি-সৈন্য সংগঠিতকরিয়া হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের জন্য মহাপ্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মহাভ্রমেরই পরিচয়। কারণ, বিদ্রোহী হইয়া সাম্রাজ্যস্থাপন করা যায় না। ইহাই হিন্দুরাজনীতিশাস্ত্রের মর্ম্ম। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও তাঁহার প্রভাব প্রকটিত ছিল। দেবী-নাম্নী তাঁহার এক শিষ্যা ছিলেন। তিনিও সর্ব্বশাস্ত্রে ও যুদ্ধকার্য্যে সুশিক্ষিতা ছিলেন। ইঁহাকেই বঙ্কিম বাবু দেবী চৌধুরাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজ সেনা কয়েকবার অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। কয়েকজন ইংরাজ সেনানী ও বহু ইংরাজ সৈন্যকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। পরে ভবানীপাঠক ও দেবী ইংরাজ-সৈন্যকে বাধা দিতে অসমর্থ হওয়ায় মান বাঁচবার জন্য ইচ্ছা করিয়া ইংরাজের নিকটে আসিয়া স্বয়ং ধরা দেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় ইহাই ইতিহাসে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। সন্ন্যাসীরা স্থানে স্থানে কেল্লা নির্ম্মাণকরিয়া তথায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বাস করিত। তাহাদের কেল্লার চিহ্ন বহু অনুসন্ধান করিলে এখনও বঙ্গের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলি জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরেও, গোঁসাই-দের একটি কেল্লা ছিল। সন্ন্যাসী জয়রামগিরি দোর্দ্দণ্ড-

প্রতাপে এখানে রাজত্ব করিতেন। সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহাদের ধনবল ও জনবলও খুব যথেষ্ট ছিল। ইংরাজ-রাজত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাঁইদের প্রভাব কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারকেশ্বরের ইতিবৃত্তগ্রন্থে এই বিষয় উত্তমরূপে লিখিত হইবে। সন্ন্যাসীরা রাণী ভবানী ও তারাদেবীকে সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া রাণী ভবানী এই সন্ন্যাসীদিগের জন্য নাটোরে একটি বড় "আখড়া" নির্ম্মাণকরাইয়া দিয়াছিলেন এবং তথায় তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গে সিরাজদ্দৌলার রাজত্বের ধ্বংসের পর ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি, শক্তিশূন্য দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি-পদ গ্রহণকরিয়াছিলেন। শাহ আলম্ এই সময়ে এলাহাবাদেই থাকিতেন। মহারাষ্ট্র-সেনাপতিগণ তাঁহাকে দিল্লীতে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তিনি কখন বা আহম্মদশাহ আব্দালির কখন বা অযোধ্যার উজির বাহাদুরের শরণাগত হইয়া নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজকর লইয়া ইংরাজদিগকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনদ্ প্রদানকরিয়াছিলেন। কোম্পানির সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ্ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শুভ পুণ্যাহের নিয়ম স্থাপনকরিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় ইংরাজ রাজত্বের মূলভিত্তি স্থাপন

করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই ইংরাজের রাজত্ব আরব্ধ হইল। ইংরাজ, দেওয়ানী-পদ গ্রহণকরিলেন বটে, কিন্তু শাসনভার গ্রহণকরিলেন না। শাসনভার শক্তিশূন্য মিরজাফরের হস্তেই ন্যস্ত রহিল। সুতরাং দেশে পূর্ণরূপে অরাজকতা বিরাজকরিতে লাগিল। কোম্পানির কর্ম্মচারী অথচ ব্যবসায়ী ইংরাজদিগের অত্যাচারে সহস্র সহস্র তন্তুবায় স্ব স্ব ব্যবসায় ও জন্মস্থান ত্যাগকরিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ রাজসাহীজেলায় রাণী ভবানীর রাজ্যমধ্যে অধিকাংশ বাণিজ্যালয় স্থাপনকরিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও রাণী ভবানীর স্বাধীন শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং "ইংরাজকুঠিয়াল্"দিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিতে আরম্ভ হইল। তাঁহারা রাণীর রাজাশাসনপদ্ধতি বিষয়ে নানাপ্রকার দোষ উদ্‌ঘাটনকরিতে আরম্ভ করিলেন। রাণী কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যথাবিধি নিজরাজ্য শাসনকরিতে লাগিলেন। রাণীর রাজ্যে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি রাজ্য শ্রীবর্দ্ধক পদার্থ সকল উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কার্পাস, পট্টবস্ত্র ও রেশমের বাণিজ্যের জন্য তৎকালে রাজসাহীর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। রাজসাহীর কৃষির উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল।

সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত রাণী বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয়করিতেন। তৎকালে বঙ্গের এমন কেহ বিখ্যাত পণ্ডিতই ছিলেন না, যিনি নিজের টোলের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য রাণীর সাহায্য না লইয়াছেন। পারসীক ভাষার শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত তিনি বহু অর্থ দান-করিতেন। রাণীর সময়ে দুইটি রাজকর প্রচলিত ছিল। একটির নাম "আসল্‌জমা" ও অপরটির নাম "আব্‌ওয়াব্‌"। "আসল্‌ জমা" যৎসামান্য ছিল। "আব্‌ওয়াবে"র সংখ্যা ও পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট থাকায় তাহাই অধিক ছিল। যাহারা কৃষিজীবী ছিল, তাহারা যৎসামান্য রাজকর দিত। যাহারা ব্যবসায়ী ছিল, তাহাদিগকে অধিক রাজকর দিতে হইত। রাণীর রাজ্যে ভূমিকর অত্যন্ত সামান্য ছিল। তাঁহার রাজ্যে অধিকাংশ বাস্তুভূমির নানাকারণে কর না থাকায় প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে তাঁহার রাজ্যে বাসকরিতে পারিত। এইজন্য তাঁহার রাজ্যে সুখী প্রজার পরিমাণও যথেষ্ট ছিল। আর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর পীরোত্তর ও লাখেরাজ্‌ প্রভৃতি নামে অধিকাংশ ভূমিই নিষ্কর ছিল। তাঁহার রাজ্যে উত্তরদ্বারী গৃহের কর ছিল না বলিয়া অনেক প্রজাই করদান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে শিল্পবাণিজ্যাদির লভ্যাংশের উপর "আবওয়াব্‌"কর ধার্য্য থাকায় তাঁহার অনেক টাকা আয় হইত। সামাজিক পারিবারিক ও মাঙ্গলিক ব্যাপারের জন্যও, আবওয়াব্‌-কর দিতে হইত। বিচার-

কার্য্যে অর্থী প্রত্যর্থীদিগের নিকট হইতেও প্রচুর অর্থ লব্ধ হইত। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী কর্ম্মচারিগণ রাণীর রাজ্যের এইরূপ উন্নত অবস্থা দেখিয়া রাজসাহীর নানাস্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালীরা কার্পাসবৃক্ষের কৃষিকার্য্যে কার্পাস-সূত্রের ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যে এবং কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের বিনিময়কার্য্যে ইউরোপ হইতেও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনকরিত। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম-জমিদারী-লাভ ও বাণিজ্যার্থ অধিকার-লাভের পর হইতেই তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের অসঙ্গত আচরণ ও অত্যাচারে বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইয়াছিল। ভারত-সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি-সংস্থাপক স্বনামধন্য পুরুষ মহাত্মা লর্ড ক্লাইভ্ দ্বিতীয়বার ভারতে আগমনকরিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন রাজত্বের প্রারম্ভে শীঘ্র শান্তি স্থাপনকরা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন রাজত্বের প্রারম্ভে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে এইরূপ অশান্তি হইয়া থাকে। বঙ্গের নবাব মির্জ্জাফর্ আলির্খাঁ, প্রভু সিরাজের ধ্বংস-সাধনের পর নবাব হইয়া রাজশক্তির পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি সবেমাত্র রাজ্যের দেওয়ানি-পদ লাভকরিয়াছিলেন। তাঁহারা

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। এই সময়ে বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসক ও সকল সমস্যার পূরক হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর পূর্ব্বে বঙ্গের যেরূপ অবস্থা ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এইরূপ ভীষণতর অবস্থায় একটি বঙ্গীয় বিধবা ব্রাহ্মণীর পক্ষে স্বাধীনভাবে অতবড় রাজ্য প্রতিপালনকরা যে, কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা একবার ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সময়ে বঙ্গে দস্যু-তস্করের ভয় মহাপ্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে বিপন্না বিধবার আর্ত্তনাদ, ও অনাথ দুর্ব্বলের কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি-শ্রবণে রাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তাঁহার রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের বাস ছিল। তাঁহার রাজ্যের তন্তু-বায়গণ এই বিংশতি লক্ষ লোকের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত-করিয়া অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ বস্ত্রখণ্ড ইউরোপীয় বণিকদিগের নিকটে বিক্রয় করিত। কিন্তু তাহাদের এইরূপ ব্যবসায় কোম্পানির ব্যবসায়ী কর্ম্মচারিগণ সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকাল হইতেই তন্তুবায়গণ জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। শিল্প দ্রব্য, উত্তম উত্তম চাউল, নীল, তামাক, খর্জ্জুর ও শর্করা প্রচুররূপে উৎপন্ন হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিত। বাঙ্গালীরা এই সকল দ্রব্যে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-পোত পূর্ণ করিয়া বিদেশে প্রেরণকরিত এবং বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ

উপার্জ্জনকরিত। লঙ্ সাহেবের "সিলেক্‌সন্‌স্ ফ্রম্‌দি রেকর্ডস্ অব্ দি গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া"-নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৪৬ সংখ্যক রেকর্ডতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ, বাঙ্গালী বণিক্‌দিগের কয়েকটি বাণিজ্যপোত লুণ্ঠনকরায় নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর আজ্ঞায় তাঁহাদিগকে দ্বাদশলক্ষমুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে ১১৭৭ বঙ্গাব্দের "সাতাত্তুরেমন্বন্তর"-নামক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় বঙ্গে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রাম ও নগর বিজনবনে পরিণত হইয়াছিল। শস্যক্ষেত্রে তৃণশূন্য হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে অন্নপূর্ণারূপিনী মহারাণী ভবানী রাজ-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গের বহু কোটি লোক তাঁহার কৃপায় অন্ন-বস্ত্র লাভকরিয়াছিল। এই প্রাকৃতিক ভীষণ লীলার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া রাণী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হস্তী, ঘোটক, অস্ত্র-শস্ত্র, ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া যে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধ তদপেক্ষা ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছিল। রাণীর কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সমগ্র রাজসাহী জেলা, বিরাট্ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। অতুল ঐশ্বর্য্য-শালিনী রাণী শূন্যহস্তে উর্দ্ধনেত্রে এই দৈবী বিপদের কথা

চিন্তা করিতে করিতে ভগ্নহৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগকরিতেন। অধুনা সদাশয় বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্ট্ দেশ-বিশেষে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় "রিলিফ্" প্রভৃতি দেশ-হিতকর বিপন্ন-পোষণ-কার্য্যের সৃষ্টিকরিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণকে মহামারীর ভয়ঙ্কর করাল কবল হইতে রক্ষা-করেন। তখন মুসলমানগবর্ণমেণ্ট্ তদ্রূপে বা কোন রূপেই বিপন্ন প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতেন না। দেশের রাজা মহারাজ-উপাধিধারী জমিদারগণের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া থাকিত, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব প্রজাদিগকেমাত্র অন্ন-বস্ত্র দানকরিয়া সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কেহ কেহ বা অন্যের বিপন্ন প্রজাকেও রক্ষা করিতেন। রাণী ভবানীর মত শক্তিশালিনী মহিলা নিজ-পর বিচার না করিয়া সেইরূপ বিপদে বিপন্ন সমাগত নর-নারীমাত্রকেই অন্ন-বস্ত্র ও ঔষধাদি প্রদানকরিয়া রক্ষা-করিতেন। রাণী ভবানীর রাজত্বের শেষদশায় মাননীয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব মহোদয় কোম্পানি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম ভারতের বড়লাট্ রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোম্পানি, নবাব মির্জাফরকে রাজ্যশাসনকার্য্যে অত্যন্ত অক্ষম দেখিয়া এবং রাজ্যে দিন দিন অশান্তির মাত্রার বৃদ্ধি দেখিয়া অবশেষে স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণকরিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বড়লাটের পদ সৃষ্টিকরিলেন। মাননীয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাহাদুরের ন্যায় ভাগ্যবান ও

স্বনামধন্য পুরুষ ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। "রুলর্স্ অব্ ইণ্ডিয়া"-নামক পুস্তকে হেষ্টিংস্-অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাকে প্রথম ভারতে আসিবার সময় পাথেয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পাথেয়ব্যয়-নির্ব্বাহের সংস্থানপর্য্যন্ত ছিল না। তিনি প্রথম মুর্শিদাবাদস্থ কাসিম্‌বাজারের ইংরাজকুঠীর সামান্য একজন অতিঅল্পবেতনভোগী কেরাণী নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ ভারতের বড়লাট্ হইয়াছিলেন। তিনি বড়লাট্ হইয়া কোম্পানির "খাস্ তহসিল্"-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যবস্থাকরিতে আরম্ভকরিলেন। তজ্জন্য তিনি বহু পুরাতন জমিদারকে স্ব স্ব জমিদারীর অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন নূতন জমিদারের সৃষ্টিকরিতে আরম্ভ করিলেন। মিডিল্‌টন্, ডেকার্, লরেন্স্ ও গ্রেহাম্-নামক চারিজন সদস্য লইয়া তিনি একটি কমিটি গঠনকরিয়াছিলেন। এই কমিটি জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য একজন কর-সংগ্রাহক জমিদার মনোনীত করিতেন। সর্ব্বপ্রথম এই কমিটি নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন। এই কমিটি, নদিয়া মহারাজার যে পরিমাণ রাজস্ব নির্ণয়করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ সম্মত না হইলে তাঁহার জমিদারী অন্যের হস্তে সমর্পিত হইবে, এই কথা তাঁহারা মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত

ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পলাশী-যুদ্ধের পর তিনি কোম্পানির নিকট হইতে পারিতোষিকস্বরূপ একটি কামান ও "রাজেন্দ্র বাহাদুর" এই উপাধি পাইয়া যে হস্ত-যুগল উত্তোলনকরিয়া কোম্পানিকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সেই হস্তযুগল এক্ষণে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়াও, কমিটির মত পরিবর্ত্তনকরিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া কমিটির প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে কমিটির মতানুসারে স্বীয় জমিদারী বন্দোবস্তকরিয়া লইলেন। কমিটির সদস্যগণ নদিয়া হইতে কাসিম্‌বাজার ও কাসিম্‌বাজার হইতে রাণী ভবানীর রাজ্য রাজসাহীতে উপস্থিত হইলেন। রাণী ভবানী তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া কমিটির প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি যে, ইংরাজকে সম্মান করিতেন, এই ঘটনার দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মাননীয় হেষ্টিংস্ সাহেবের স্বহস্ত-লিখিত কার্য্য-বিবরণা হইতে তাঁহার মন্তব্য অনূদিত হইল।

"কৃষ্ণনগর প্রদেশের রাজস্ব-নিরূপণ-সময়ে যে নিয়মে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, রাজসাহী ও হুজুরি জেলাতেও সেই নিয়ম অনুসৃত হইল। রাজসাহী-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরগণা কে কত অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তাহা জানিবার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচার-

করিয়া নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষাকরা হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের পরগণাগুলি অন্য লোক যে টাকায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তদপেক্ষা রাণী ভবানীর প্রস্তাব-অনুযায়ী বন্দোবস্ত করাই লাভজনক বোধ হইল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গেই ৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইল। তাঁহার ধনবল আছে। বিশ্বাসপাত্রী বলিয়া লোক-সমাজে তাঁহার সুখ্যাতি আছে। তাঁহার চরিত্রগুণে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপনকরিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করায় আর এক সুবিধা এই যে, তিনি কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বন্দোবস্তী মহাল-গুলি চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্তকরিয়া যথাকালে রাজস্ব দানের অঙ্গীকারে নিজের প্রজাবর্গের "কবুলিয়ত্" "দাখিল" করিতে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে অন্য কেহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপিত না করায় তাহাও তাঁহাকেই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। রাণী বহু বৎসর রাজ্য-শাসন করিয়া শাসনকার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছেন, তাহাতে অন্য লোক তাঁহার অপেক্ষা অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সাহস পায় নাই। রাজসাহীর ন্যায় রাণী ভবানীর বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজ্য হইতে যে, পূর্ণ-মাত্রায় যথাসময়ে রাজস্ব সংগৃহীত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন সমৃদ্ধ রাজবংশের সহিত বন্দোবস্ত করায় আমাদের রাজস্ব-সংগ্রহে ব্যয়-বাহুল্যও

হইবে না। পঞ্চম রিপোর্ট। এই বন্দোবস্ত বাঙ্গালার জমিদারী সিরেস্তায় "পঞ্চসনা বন্দোবস্ত" নামে পরিচিত। রাণী ভবানী ভারতের সর্ব্বপ্রথম বড়লাট মাননীয় ওয়ারণ্ হেষ্টিংস্ সাহেবকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিতে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। হেষ্টিংস্ সাহেব তাঁহাকে যে সর্ত্তে রাজস্ব দিতে বলিয়াছিলেন, তিনি অম্লানবদনে সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন এবং সেই সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি মাননীয় হেষ্টিংস্ সাহেব বাহাদুর রাণীর রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বাহারবন্দর-পরগণা-নামক একটি সুবিস্তৃত উত্তম আয়ের জমিদারীর অধিকার হইতে রাণীকে বঞ্চিত করিয়া উক্ত জমিদারীটি মাননীয় সাহেবের বিপৎকালের মহাবন্ধু মহাপ্রিয়পাত্র মহোপকারক "কান্তবাবু"কে প্রদান করিয়াছিলেন। কান্তবাবু তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে ইহা গ্রহণকরিয়াছিলেন। তৎকালে কোম্পানির পরমহিতৈষী মহোপকারক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে লোক কান্তবাবু বলিয়া ডাকিত। ইনিই মুর্শিদাবাদস্থ কাসিম্-বাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি অতিসামান্য অবস্থা হইতে অদৃষ্টবলে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা-করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বংশের দৌহিত্র মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ঐ জমিদারীটি ভোগ করিতেছেন। আত্মসম্মানজ্ঞ মহারাণী এই সম্পত্তির

অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই অপমান ও অভিমানে রাজ্যশাসনে বীতস্পৃহ হইয়া তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যশাসনভার সমর্পণপূর্ব্বক কাশীধামে গমনকরিয়াছিলেন।

কাশীধামে গমনকরিয়া মহারাণী ভবানী যেরূপ দান-শীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূজা-পাঠ সমাপ্ত করিয়া একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা একটি বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে দানকরিতেন। তিনি যে কয়েক বৎসর কাশীতে বাস করিয়াছিলেন, সেই কয়েক বৎসর প্রতিদিনই প্রাতঃকালে ঐরূপ ব্রাহ্মণকে একটি ঐরূপ বড় বাড়ী দান করিতেন। সুতরাং কাশীতে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের এমন বাড়ী নাই, যাহা রাণী ভাবানী কর্ত্তৃক দত্ত হয় নাই। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ সাংসারিক দায়ে বিপন্ন হইয়া সেই সকল বাড়ীর মধ্যে অনেক বাড়ী অন্যের নিকটে বিক্রয়করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং কাশীতে এমন বাড়ীই নাই, যাহা রাণী ভবানী কর্ত্তৃক দত্ত হয় নাই, এইরূপ বলিলেও অত্যুক্তি-দোষ ঘটিবে না। রাণী ভবানী কাশীর ৺অন্নপূর্ণার বর্ত্তমান প্রস্তরময় বৃহৎ অট্টালিকা ও তন্মধ্যবর্ত্তী মন্দির নির্ম্মাণ-

করাইয়া ইহার গোঁসাইকে সেবায়েৎ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার দৈনিক পূজা-ভোগ, ও নহবৎ-বাদ্য প্রভৃতির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন। ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ঠিক পরবর্ত্তী বৃহৎ প্রস্তরময় দেবালয়টি তিনিই নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। কাশীর বর্ত্তমান বৃহৎ প্রস্তরময় দুর্গাবাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রস্তরময় সোপানরাজি-পরিবেষ্টিত দুর্গাকুণ্ড-নামক বৃহৎ সরোবরটি তিনিই নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। কতকাল অতীত হইয়াছে এবং কতকাল পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বানর এই মন্দিরে বাসকরিয়া কত ভয়ঙ্কর উপদ্রব করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তথাপি কাশীর দুর্গাবাড়ীটি যেন নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বাঁনরের উপদ্রবে কত মন্দিরের চূড়া ও কত বাড়ীর ছাদের ভিত্তি যে নষ্ট হইয়াছে, তাহা কাশীবাসী ভিন্ন আর কে জানিবে? কিন্তু কাশীর দুর্গাবাড়ী এতই দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তথায় সহস্র সহস্র বানরের অত্যন্ত উপদ্রব সত্ত্বেও অদ্যাপি উহার অঙ্গহানি হয় নাই। মনে হয় যেন উহা সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল বাড়ী প্রস্তুত করিতে প্রভূত ব্যয় হইয়াছিল। কাশীর বাঙ্গালীটোলার গোপালমন্দির, তারামন্দির, দণ্ডিভোজনছত্র ও মথুরাছত্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরময় অট্টালিকাসমূহ তিনিই নির্ম্মাণ-করাইয়াছিলেন। ঐ সকল দেবালয়ে দেব-দেবী-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা-ভোগ ও নহবৎ-বাদ্য প্রভৃতির ব্যয়-

নির্ব্বাহের জন্য উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেবালয়ে শত শত অতিথি সাধু ব্রাহ্মণ দণ্ডী সন্ন্যাসী ও কাঙ্গালীদিগের ভোজনের নিমিত্ত যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গামহলঘাট, সর্ব্বেশ্বরঘাট, নারদঘাট ও পাঁড়েঘাট প্রভৃতি বড় বড় ঘাট তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে সংস্কার-অভাবে ঐ ঘাটগুলি জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়াছে। কিন্তু দেবালয়গুলি নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অনেক ভদ্রলোক কাশীতে গিয়া যে সকল বাটী ক্রয়করিয়াছেন, বহু অনুসন্ধানের পর ইহা জানা গিয়াছে যে, ঐ সকল বাড়ী পূর্ব্বে রাণী ভবানী ব্রাহ্মণদিগকে দানকরিয়াছিলেন। ঐ সকল বাড়ী বহুবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কাশীতে এমন বাড়ীই নাই, যাহা পূর্ব্বে রাণী ভবানী কর্ত্তৃক দত্ত হয় নাই। ইহা অত্যুক্তি নহে, ইহা বাস্তবিক কথা। রাণী ভবানী কাশীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া বাসকরিয়াছিলেন। এই কয়েক বৎসর যদি প্রতিদিনই একটি করিয়া বাড়ী দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ কয়েক সহস্র বাড়ী দানকরিয়াছিলেন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কাশীর বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর-মন্দিরটিও পূর্ব্বে ভগ্নাবস্থায় ছিল, রাণী ভবানীর ব্যয়েই উহা বর্ত্তমানরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাই প্রধান দেবতা।

সুতরাং এই দুই দেবতার মন্দির নির্ম্মাণকরাইয়া তিনি বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তারপর কাশীর "পঞ্চক্রোশী"তীর্থে তাঁহার অনুপমা কীর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছে। পঞ্চক্রোশীর সমস্ত পথ রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। "পঞ্চক্রোশী"র যাত্রীরা প্রত্যেক দিন পাঁচক্রোশ পরিভ্রমণকরিয়া পাঁচদিনে পঁচিশ ক্রোশ পথ পরিভ্রমণকরিয়া "পঞ্চক্রোশী"তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যাত্রীদিগের রৌদ্রোত্তাপ-নিবারণের নিমিত্ত এই পঁচিশ ক্রোশ পথের দুইধারে স্নিগ্ধপল্লবাচ্ছাদিত বৃক্ষরাজি সুশীতল ছায়া বিতরণকরিতেছে। প্রত্যেক ক্রোশ অন্তরে একটি একটি বৃহৎ সরোবর ও যাত্রীদিগের বিশ্রামার্থ ধর্ম্মশালা ও তৎসংলগ্ন উদ্যান আছে। যাত্রী-দিগের সঙ্গে যে সকল ভারবাহী গমনকরে, তাহাদের মস্তকস্থিত দ্রব্যসম্ভার-স্থাপনের নিমিত্ত "ধর্ম্মঢোকা" নামক প্রস্তরময় স্তম্ভ স্থানে স্থানে নির্ম্মিত রহিয়াছে। এই সমস্তই রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। "পঞ্চ-ক্রোশী"র পথে যে সকল তীর্থ ও দেবালয় আছে, তৎ-সমস্তই তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রীগণ সুখে-স্বচ্ছন্দে "পঞ্চক্রোশী"তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করে ও অদ্যাপি তাঁহার জয়গান করিয়া থাকে। তিনি অনন্ত দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাশীতে তাঁহার অতুলকীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া

রাখিয়াছে। তিনি কাশীতে কয়েক বৎসর বাস করিয়া নাটোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নাটোরে আসিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ অনবধানতাবশতঃ তাঁহার বৃহৎ সম্পত্তির অনেক উত্তম অংশ নষ্টকরিয়া ফেলিয়াছেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া ভগবতীর ভজন-পূজনে জপ-হোম ও দান-ধ্যানে রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে মনোযোগ দিতেন না। সম্পত্তি-রক্ষণা-বেক্ষণে সর্ব্বদাই অবহেলাকরিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ এই সুযোগ লাভকরিয়া স্ব স্ব উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে আরম্ভকরিয়াছিলেন। রাজস্ব-দেনার দায়ে যখন একটি একটি জমিদারী নিলামে উঠিয়া বিক্রীত হইতে আরব্ধ হইল, তখন তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ঐ সকল সম্পত্তি অল্পমুল্যে ক্রয়করিয়া ক্রমে জমিদার হইয়া উঠিতে লাগিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ যে দিন শুনিতেন যে, তাঁহার অমুক সম্পত্তি রাজস্ব-দেনার জন্য নিলামে চড়িয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ কালীর সম্মুখে দশহাজার ছাগ বলি-দিবার জন্য ও মহাসমারোহের সহিত কালীপূজার নিমিত্ত ভোলানামক তাঁহার প্রিয় ভৃত্যকে আদেশকরিতেন। ভোলা তাঁহার সাধনাকার্য্যের আয়োজনকারী মহাপ্রিয় ভৃত্য ছিল। রাণী কাশী হইতে আসিয়া দেখিলেন যে, অনেক

সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ডিহি আড়্পাড়া"-নামক বৃহৎ সম্পত্তিটি গোবরডাঙ্গার জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা খেলারাম মুখোপাধ্যায় ক্রয় করিয়াছিলেন। "ডিহিকণেশপুর" ও "ডিহিস্বরূপপুর"-নামক সম্পত্তিটি কলিকাতার রাজা গোপীমোহন ঠাকুর ক্রয়করিয়াছিলেন। নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় অনেক ভাল ভাল বৃহৎ বৃহৎ সম্পত্তি ক্রয়করিয়াছিলেন। দয়ারাম রায় অতি বৃদ্ধাবস্থায় দেওয়ানী-কর্ম্ম হইতে অবসরলইলে নড়াইল-জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় নাটোর-রাজবাটীর দিওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাণী ভবানী কাশী হইতে নাটোরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্রের ঐ সকল কাণ্ড দেখিয়া কোন কথা কহিলেন না। তিনি ভাবিলেন, পার্থিববস্তুসকল ক্ষণিকমাত্র। ক্ষণিক ঐহিক বস্তুর জন্য চিন্তাকরিয়া মনকে ব্যথিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে পরম শ্রেয়স্কর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণায় এই মনকে নিযুক্ত করিতে পারিলে পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব সম্পত্তির অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া বৃথা দুঃখ করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না। তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশুরের কনিষ্ঠভ্রাতা অনেক কষ্টে অর্থ উপার্জ্জনকরিয়া এই বৃহৎ রাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন। রাজ্য ঐহিক ও ক্ষণিক হইলেও, রাজ্য

রক্ষাকরিলে অনেক লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বহুলোকের বহুপ্রকার উপকার সাধিত হইয়া থাকে বলিয়া অতি কষ্টে উপার্জ্জিত সম্পত্তি ক্ষণিক হইলেও উহাকে জলে ফেলিয়া দিতে কোন শাস্ত্র অনুমোদন করেন না। ইহার দ্বারা অন্যান্য আশ্রম উপকৃত ও রক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহা অন্যান্য আশ্রমের আশ্রয়স্বরূপ। জ্ঞানী যতি সন্ন্যাসীরা ইহাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেন না। যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অর্থকে অনর্থ বলিয়া ভাবনা করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকেও ভারতে অদ্বৈতবাদ-স্থাপনের নিমিত্ত দক্ষিণদেশীয় রাজা মহারাজাদিগের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তিনি চারিটি স্থানে যে, চারিটি প্রধান মঠ স্থাপনকরিয়াছিলেন এবং ঐ সকল মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ যে প্রচুর ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অর্থ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। আকাশ বা শূন্যরূপ উপাদানে ঐ সকল বৃহৎ বৃহৎ মঠ নির্ম্মিত হয় নাই বা ঐ সকল মঠ-সংপৃক্ত ভূসম্পত্তি অধিকৃত হয় নাই। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ নিবারণপূর্ব্বক শান্তিলাভের জন্য একটি বৃহৎ ভারবান্ ছত্র স্বহস্তে ধারণকরিয়া দূর পথে গমন করিলে ঐ ছত্রধারী ব্যক্তিকে যেমন ছত্রভার-বহনে ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হয় এবং শান্তি অপেক্ষা তাহার অশান্তির ভাগ বাড়িয়া উঠে, তদ্রূপ রাজারও, রাজ্যভার-গ্রহণে সর্ব্বদা মহাদায়িত্ব-চিন্তায় ও

বহুল রাজ-কার্য্যের নিরীক্ষণে কষ্টই সার হইয়া পড়ে। রাজা অপেক্ষা রাজকর্ম্মচারীরা বরং বেশী সুখ ও স্বচ্ছন্দতা উপভোগকরিয়া থাকেন। নিজের হিত অপেক্ষা পরের হিতের নিমিত্তই রাজার রাজ্যপালন অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। মহারাণী ভবানী ভাবিলেন যে, আমি সেই জন্যই এতকাল রাজ্যশাসনে ক্লেশ স্বীকারকরিয়াছি। পূর্ব্ব-কালে রাজারা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণকরিয়া কোলাহলশূন্য পবিত্র স্থানে গিয়া পরমেশ্বর-চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি-বাহিত করিতেন। অতএব আমিও রামকৃষ্ণের হস্তে ইতঃপূর্ব্বেই রাজ্যভার সমর্পণকরিয়াছি। আমার তীর্থ-যাত্রা কৃত্যও সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কোলাহলপূর্ণ নাটোরপ্রাসাদে আর থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইবার সকলকলুষনাশিনী ত্রিতাপহারিণী ভাগীরথীর পবিত্রতীরে মুর্শিদাবাদের বড়নগর-প্রাসাদে বাসকরিয়া জীবনের অবশিষ্টভাগ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণায় অতি-বাহিত করাই আমার পক্ষে একমাত্র শ্রেয়স্কর। এইরূপ বিবেচনা করিয়া মহারাণী ভবানী জীবনের শেষভাগে গঙ্গাতীরে বাসকরিবার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে প্রস্থানকরিয়া-ছিলেন। যাইবার সময় মহারাজ রামকৃষ্ণকে এই উপদেশ করিলেন, "বৎস, ভারতের প্রাচীন সূর্য্যবংশীয় রাজগণের নীতিপথ অবলম্বন করিও।

সূর্য্যবংশীয় রাজা রা যথাবিধি জপ পূজা ও হোম করিতেন। অতিথিগণকে যথাশক্তি দানকরিতেন। লোককে অপরাধের অনুরূপ দণ্ড প্রদানকরিতেন। যথাকালে (অতিপ্রত্যূষে) শয্যা ত্যাগকরিতেন। সত্য-কথনের নিমিত্ত মিতভাষী হইতেন। যশের নিমিত্ত দেশ জয়করিতেন। প্রজার উৎপীড়নের নিনিত্ত দেশ জয়-করিতেন না। তাঁহারা বংশরক্ষার্থ দারপরিগ্রহ করিতেন। তাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। যৌবনে বিষয়-ভোগ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় মুনিগণের বৃত্তি অবলম্বন-করিতেন এবং মরণকালে যোগ দ্বারা তনুত্যাগ করিতেন"। রাণী ভবানী মহারাজ রামকৃষ্ণকে অন্যান্য অনেক হিত-উপদেশ প্রদানকরিয়া গঙ্গাবাসের নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মহারাজ রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ বিপুল আয়োজন ও মহাআড়ম্বরের সহিত 'শক্তি-সাধনায় রত রহিলেন। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করায় রাজকার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। জমিদারীর পর জমিদারী নিলামে চড়িতে লাগিল। দেবীর পূজার আড়ম্বর এবং দেবীর সম্মুখে ছাগ-বলিদানের সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে মহারাজ রামকৃষ্ণ পূজা-করিতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক মহাত্মা যোগী রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দৌবারিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের মহারাজকে গিয়া বলু যে, তিনি

পূজা করিতে বসিয়া অমুক ভূসম্পত্তিটির বিক্রয়ের চিন্তা করিতেছেন কেন? পূজা-সমাপ্তির পর সেই চিন্তায় মগ্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে উচিত। মহারাজার কর্ণে এই কথা পৌঁছিলে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই অন্তর্যামী যোগীকে তাঁহার নিকটে লইয়া আসিতে আদেশকরিলেন। ঐ যোগী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে নির্জ্জনে তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইয়াছিল। শুনা যায় যে, ঐ যোগী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার মা মহারাণী ভবানীই তোমার প্রকৃত গুরু। তিনি তোমার প্রতি সুপ্রসন্না না হইলে লক্ষ লক্ষ বলিদান ও সহস্র সহস্র বার শব-সাধনা করিলেও তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না"। এই কথা বলিয়া সেই যোগী রাজবাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। আর কখনও রাজবাটীতে আইসেন নাই। ইহার পর মহারাজ রামকৃষ্ণ তাঁহার মাতাঠাকুরাণী মহারাণী ভবানীকে সুপ্রসন্ন করিবার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়ভৃত্য ভোলা তাঁহার জপের মালা লইয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। বড়নগর-রাজবাটীতে কয়েকদিন থাকিবার পর তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তিনি জানিতে পারিয়া গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন এবং প্রিয়তম ভৃত্য ভোলাকে তাঁহার জপের মালা আনিতে বলিলেন। ভোলা জপের মালা আনিলে তিনি

গঙ্গাজলমধ্যে গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ইষ্টমন্ত্র জপকরিতে আরম্ভ করিলেন। জপ শেষকরিয়া একটি অন্তিমকালীন সাধনাসঙ্গীত গাইতে আরম্ভকরিলেন। গান পরিসমাপ্ত করিয়া ভোলার দ্বারা মহারাণী ভবানীকে জানাইলেন যে, তিনি (মহারাণী) একবার রাজবাটীর ঘাটে আসিয়া অন্তিম-কালে তাঁহার পুত্রের ব্রহ্মতলে একবার চরণ স্থাপনকরিয়া পুত্রকে যেন কৃতার্থ করেন। মহারাণী ভবানী অন্তিম-কালে পুত্রের এই প্রার্থনা পূরণকরিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণের মস্তকে চরণ স্থাপনকরিবার পরই মহারাজার ব্রহ্মতল সহসা ফাটিয়া গিয়া একটা জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী মহারাণী জয়মণি ও তাঁহার পুত্র রাজা বিশ্বনাথ মুর্শিদাবাদে বড়নগর-রাজবাটীতে আসিয়া মহারাণী ভবানীর সহিত বাসকরিয়াছিলেন। মহারাণী ভবানী তাঁহার সমস্ত দেবোত্তরসম্পত্তি "দানপত্র" করিয়া, তাঁহার পুত্রবধূকে অর্পণকরিয়াছিলেন। মহারাণী ভবানী বৃদ্ধাবস্থায় নানাবিধ শোক-তাপ পাইয়াও কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি বড়নগর-রাজবাটীতে থাকিয়াই যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নিয়মিতরূপে রাজকার্য্য সম্পাদনকরিতেন। ৭৯ বৎসর বয়সেও রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে শয্যা ত্যাগ-করিয়া স্নানাদিকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত

পূজা-পাঠ করিতেন। পরে স্বহস্তে পাক করিয়া হবিষ্যান্ন ভক্ষণকরিতেন। আহারান্তে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা ও স্তব-পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফল খাইতেন। তৎপরে কুশাসনে বসিয়া পুনরায় রাত্রি দেড়প্রহর পর্য্যন্ত রাজকীয় কাগজ-পত্র দেখিতেন। পরে শয়নকরিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মসকল নিয়মিতরূপে প্রতিপালন-করিতেন। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী হইয়াও স্বহস্তে হবিষ্যান্ন পাক-করিয়া খাইতেন। বালিকারাজবধূরূপে নাটোর-রাজবাটীতে প্রবেশকরিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিতরূপে দৈনিক ক্রিয়াসকল প্রতিপালনকরিয়াছিলেন। কেবল বিধবা হইবার পর স্বহস্তে হবিষ্যান্ন-পাক ও ভূমিশয্যা-গ্রহণ প্রভৃতি তাঁহার দুই একটি বেশী কার্য্য বাড়িয়াগিয়াছিল মাত্র। নতুবা রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃস্নান, ও পূজা, স্তব-পাঠ শেষ করিয়া ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠকরিয়া রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শ্রবণকরান, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া, আহারের পর জমিদারীর খাতা-পত্র দেখা, ইত্যাদি কার্য্য তিনি একরূপেই চালাইয়া-ছিলেন। কেবল বৈধব্যের পর তাঁহার এই কার্য্য-গুলি বাড়িয়াছিল। যথা :—প্রজাগণের অভিযোগ-শ্রবণ, বিচার, সিদ্ধান্তকরা বা রায় দেওয়া, জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে কর্ম্মচারিগণকে যথোপযুক্ত উপদেশপ্রদান, জমি-

দারী-সম্পৃক্ত অভাব-অভিযোগ-শ্রবণ, নিয়মাবলী-সংস্কার, প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ, কাগজ-পত্রে স্বাক্ষরকরা, নবাবসরকারে ও অন্যান্য স্থলে পত্র-লিখন-প্রণালী-কথন, বিধিব্যবস্থাপ্রণয়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে পঞ্চাশ বৎসর কাল অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বৃহৎ রাজ্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়া মহাপ্রতাপের সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাশিক্ষিতা পুণ্যশ্লোকা আদর্শমহিলা মহারাণী ভবানী মুর্শিদাবাদস্থ বড়নগর-রাজবাটীতে কলুষ-নাশিনী গঙ্গা দর্শনকরিতে করিতে ৭৯ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে পরলোকে গমনকরিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই।

মালবদেশে আহম্মদনগর জেলার অন্তর্গত পাথর্ডী-নামক গ্রামে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আনন্দ রাও শিন্দে। তিনি একজন সামান্য কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু তিনি ধার্ম্মিক পরোপকারক ও উদারচরিত ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তাঁহার একটি সন্তান না হওয়ায় তিনি ও তাঁহার স্ত্রী বিষন্ন মনে দিনযাপন করিতেন। একদিন একটি সন্ন্যাসী তাঁহাদের গৃহে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে আনন্দরাও বাটীতে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি

সমুচিত আতিথ্য প্রদর্শনকরিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী গৃহ-
কর্ত্রীর বদন বিষন্ন দেখিয়া বিষাদের কারণ অবগত হইলেন
এবং বলিলেন যে, কোহ্লাপুরে জগদম্বা দেবীর আরাধনা-
করিলে তাঁহাদের কামনা সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ঐ
সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে আনন্দরাও বাটীতে আসিয়া সমস্ত
বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। পরদিন তাঁহারা কোহ্লাপুরে
গমন করিয়া জগদম্বা দেবীর আরাধনায় রত হইলেন।
এক বৎসর কাল একাগ্রচিত্তে আরাধনার পর আনন্দরাও
একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, জগদম্বা দেবী তাঁহাকে
বলিতেছেন যে, আমি তোমাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট
হইয়াছি। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে গমন কর।
তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আনন্দরাওর স্ত্রীও সেই
দিন এই স্বপ্ন দেখিলেন যে, উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা
একটি অসামান্য সুন্দরী নারী তাঁহার ললাটে সিন্দুর দিয়া
ও তাঁহার ক্রোড়ে একটি সুলক্ষণা সদ্যোজাতা কন্যা স্থাপন-
করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পতি ও পত্নী এই প্রকার
স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের একটি
সুলক্ষণা কন্যা জন্মিবে। পরদিন তাঁহারা জগদম্বা দেবীকে
ষোড়শ উপচারে পূজাকরিয়া এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ব্রত-
কৃত্য সমাপ্ত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রায়
এক বৎসর পরে আনন্দরাওর একটি কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ
হইল। এই কন্যার নাম অহল্যাবাই। গ্রামের একজন

অভিজ্ঞ জ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠী গণনাকরিয়া বলিলেন, "এই কন্যা কালে একটা স্বাধীন রাজ্যের নির্ভয়া তেজস্বিনী অধীশ্বরী হইবেন এবং ইনি জগদ্বিখ্যাতা দানশীলা হইবেন। ইঁহার কীর্ত্তি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সেই কীর্ত্তি স্থায়িনী হইবে"। এই জ্যোতিষীর গণনা উত্তর কালে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছিল। পূর্ব্বকালে এইরূপ সত্যগণনায় সমর্থ বহু জ্যোতিষী ভারতে জন্মিয়াছিলেন। এক্ষণে আসল নাই, নকল আছে, প্রকৃত শিক্ষা কমিয়াছে, চাতুরী বাড়িয়াছে। অহল্যাবাই শৈশবে বড়ই সুশীলা ও দয়াস্নেহবতী ছিলেন। তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। পাথরডী গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয় আনন্দরাওর পরমবন্ধু ছিলেন। তিনিই অহল্যাবাইর গৃহশিক্ষক ছিলেন। "অহল্যাবাই কালে রাজ্যেশ্বরী হইবেন," জ্যোতিষীর এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন-করিয়া আনন্দরাওর এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্যেশ্বরী হইতে হইলে শিক্ষিতা হওয়া চাই। রাজ্যেশ্বরী অশিক্ষিতা হইলে রাজ্য রক্ষাকরা মহাকঠিন হইয়া পড়ে। অশিক্ষিতা রাজ্যেশ্বরীকে পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগকরিতে হয়। শিক্ষার অভাবে মন্ত্রিবর্গের করতলগত হইয়া থাকিতে হয়। অবশেষে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। অহল্যাবাই বাল্যকালে শিক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে রাজনীতিশাস্ত্র-শিক্ষা-প্রভাবে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করিতে

পারিয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যোগবাসিষ্ঠরামায়ণ, উপনিষৎ এবং অন্যান্য বহু ধর্ম্মশাস্ত্র ও মুক্তিশাস্ত্র পাঠকরিয়া শান্তচিত্তে কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন। অহল্যাবাইর নবম বর্ষ-বয়সে আনন্দরাও তাঁহার বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধান-করিতে লাগিলেন।

পাত্রের ভাবনায় তাঁহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। অহল্যাবাইর শুভাদৃষ্টের বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিনা চেষ্টায় একটি সুপাত্রের সহিত সম্বন্ধ অযাচিতভাবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। এই পাত্র আবার যে সে পাত্র নয়। ইনি একজন স্বাধীন নরপতির পুত্র। একজন অতি সামান্য দরিদ্র কৃষিজীবীর নবম-বর্ষীয়া কন্যার সহিত একটি স্বাধীন নরপতির বিবাহ-সম্বন্ধ অযাচিতভাবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যার পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতিবল বা ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ স্বীকার-করিতেই হইবে। যে যেমন কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তাহাকে তদ্রূপ ফল প্রদানকরেন। পূর্ব্বজন্মের সুকর্ম্ম-দুষ্কর্ম্ম অস্বীকারকরিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা-দোষ ঘটে। যে সময়ে আনন্দরাও কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র অনুসন্ধান-করিতেছিলেন সেই সময়ে পুনার বাজীরাও পেশোয়ার একদল সৈন্য পাথরূডী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহারা মালবদেশের বিদ্রোহ দমনকরিয়া পুণায় যাইতে-
ছিল। তাহারা ক্লান্ত হওয়ায় পাথরডী গ্রামে কিয়ৎক্ষণ
বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের সহিত মল্হর্
রাও হোল্কর্-নামক এক স্বনামধন্য সেনানী ছিলেন।
তিনি কৃষক আনন্দরাওর গৃহের নিকটস্থ এক দেবমন্দিরে
দেবতাকে প্রণামকরিবার জন্য উপস্থিত হইয়া অহল্যা-
বাইকে দেখিতে পাইলেন। অহল্যাবাই সেই সময়ে
তথায় তাঁহার গুরুমহাশয়ের নিকটে বসিয়া সংস্কৃত-স্তব
অভ্যাসকরিতেছিলেন। বালিকার মুখে সুস্বরে সুমধুর
স্তোত্র-পাঠ শ্রবণকরিয়া মল্হর্ রাও হোল্করের সেনানী-
সুলভ কঠিন হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি
আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার নয়নযুগল হইতে
আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ঐরূপ স্তোত্র-
পাঠ শুনিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনেকরিলেন।
অহল্যাবাইর শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে অহল্যাবাইর কুল-
পরিচয় পাইয়া পরক্ষণে আনন্দরাওর সহিত পরিচিত
হইলেন এবং তাঁহার কন্যার সহিত নিজের পুত্রের
বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আনন্দরাও এই প্রস্তাবে
সম্মত হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে পুণানগরীতে মল্হর্
রাও হোল্করের পুত্র খণ্ডেরাওর সহিত সৌভাগ্যবতী
শ্রীমতী অহল্যাবাইর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। অতি
সামান্য দরিদ্র কৃষকের কন্যা বধূরাণী হইলেন। অহল্যা-

বাইর বিদ্যা-বুদ্ধি সুচরিত্র ও রাজ্য-শাসন-পদ্ধতির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহার শ্বশুর মল্‌হর্‌রাও হোল্‌করের পরিচয় দেওয়া উচিত। মল্‌হর্‌রাও হোল্‌কর্ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজে একটি স্বাধীন রাজ্যের নরপতি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম খণ্ডুজী। তিনি পুণা হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে হোল্-নামক এক পল্লীগ্রামে বাসকরিতেন। পশুপালন ও কৃষিকার্য্য তাঁহার জীবিকা ছিল। পুরুষানুক্রমে পশু-পালন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহকরায় তাঁহাদের বংশ "ধন্‌গর্"-নামে অভিহিত ছিল। ধন্‌গর্ শব্দের অর্থ পশুপালক। হোল্-নামক স্থানে বাসকরিতেন বলিয়া হোল্‌কর্ তাঁহাদের উপাধি। মহারাষ্ট্র-ভাষায় নিবাসী অর্থে "কর্" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—ভাণ্ডার্‌কর্ নিম্বাল্‌কর্ পাটন্‌কর্ ইত্যাদি। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মল্‌হর্‌রাও হোল্‌কর্ জন্মিয়াছিলেন। তিনি যখন পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বালক, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণজীর শরণাগত হইয়াছিলেন। (স্যার্ জন্ ম্যাল্‌কম্, "মধ্য-ভারত ও মালবের ইতিহাস"-নামক স্বীয় পুস্তকে নারায়ণজী এই নাম উল্লেখকরিয়াছেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় পুস্তকে ভোজরাজজী এই নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।) তলোদেঁ-নামকগ্রামে নারায়ণজীর নিবাস ছিল। তলোদেঁ

একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। উহা খান্দেশ্ জেলার অন্তর্গত। তথায় তাঁহার সামান্য কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি কৃষি, পশুপালন, ও পশুচারণ প্রভৃতি স্বজাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ-করিয়া কোন মহারাষ্ট্রীয় রাজার সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিদেশেই থাকিতে হইত। সুতরাং নিজের ভূমিকর্ষণ, পশুপালন, পশুচারণ, ও গৃহ-রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য শরণাগত ভগিনী ও ভাগিনেয়কে বাটীতে রাখা তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। তিনি ভাগিনেয় মল্‌হর্‌কে গৃহের ঐ সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

একদা এক জ্যোতিষী মল্‌হরের হস্তরেখা গণনাকরিয়া বলিয়াছিলেন যে, কালে এই বালক অসাধারণ যোদ্ধা হইবে এবং বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বাধীন রাজা হইবে। জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া মল্‌হরের হৃদয়ে উচ্চ আশা ও উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। তিনি পশুচারণাদি কর্ম্ম ত্যাগ-করিয়া সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য মাতুলের নিকটে আগ্রহ সহকারে প্রার্থনাকরিলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বীয় প্রভুর আদেশে নিজের দলে তাঁহাকে প্রবেশকরাইলেন। মল্‌হর্‌রাও সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া অনন্যচিত্তে, শতগুণ উৎসাহে, কঠোর উদ্যমে, ও অবিচ্ছিন্ন নিয়মে উচ্চ আশা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। নিজগুণে

তিনি ক্রমে যুদ্ধবিভাগের উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভকরিয়া অবশেষে উচ্চতম পদ লাভকরিয়াছিলেন। তিনি একদা এক ভীষণ যুদ্ধে নিজাম্ উল্‌মুল্‌ক্‌এর এক সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা সেনাপতিকে নিহত করিয়া চতুর্দ্দিক্-ব্যাপিনী প্রশংসা লাভ-করিয়াছিলেন। তাঁহার অসীম সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীন নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইতিহাস-সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও পেশোয়া নিজের সৈন্যদলে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মল্‌হর্‌রাও প্রথম পাঁচশত অশ্বসৈনিকের অধিনায়কত্বের পদ পাইয়া-ছিলেন। প্রকৃত গুণবান প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র পাইয়া ক্রমে নিজকার্য্যের সাময়িক সুফল লাভকরিতে লাগিলেন। বাজীরাও পেশোয়ার মহাশত্রু নিজাম্ আলি তাঁহার নিকটে পরাজিত হওয়ায় এবং পোর্টুগীজ্‌দস্যু-উৎপীড়িত কঙ্কনদেশে তৎকর্ত্তৃক শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বাজীরাও পেশোয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মদানদীর উত্তরকূলস্থ দ্বাদশটি জেলা তাঁহাকে জায়গীর্‌রূপে পুরস্কার প্রদানকরিয়াছিলেন। মালবদেশের আধিপত্য ও অধিকার লইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত মুসলমানগণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। এই ভীষণ যুদ্ধে মল্‌হর্‌রাও যেরূপ যুদ্ধ-কৌশল, পরাক্রম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে শত্রুপক্ষ মুসলমানগণও তাঁহার প্রশংসাকরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মল্‌হর্‌রাও এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় বাজীরাও পেশোয়া তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে সত্তরটি জেলা এবং ইন্দোর প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীররূপে পারিতোষিক প্রদানকরিয়াছিলেন এবং মালবদেশের সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব প্রদানকরিয়াছিলেন। এই সময়েই মল্‌হর্‌রাও হোল্‌কর্‌ ইন্দোরে স্বীয় রাজধানী স্থাপনকরিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায় হইয়াছিল। মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ যে সকল দেশ জয়করিয়াছিলেন, সেই গুলির পুনরুদ্ধার করা ক্ষীণশক্তি মুসলমানসম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়গণই ভারত্‌সাম্রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বয়ং সম্রাট্‌ মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদিগকে কখন বা রাজ্যাংশ কখন বা তাঁহাদের অভীষ্ট ধন দানকরিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং নিজের শত্রুদমনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনাকরিতেন। একবার দিল্লীর মোগলসম্রাট্‌ তাঁহার শত্রু রোহিলাগণকে দমনকরিবার জন্য মল্‌হর্‌রাওকে আমন্ত্রণকরিয়াছিলেন। মল্‌হর্‌রাও সম্রাট্‌কে সাহায্যকরিবার জন্য রোহিলাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সংখ্যা স্বপক্ষীয় সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং নূতন কৌশল অবলম্বন না করিলে

এ যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বনকরিয়া এই যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়াছিলেন। গভীর অন্ধকার রজনীতে শত্রুপক্ষ স্বীয় শিবিরমধ্যে নিদ্রিত হইলে তিনি বহুসংখ্যক মহিষ ও বৃষের শৃঙ্গে প্রজ্জ্বলিত মশালের আধার বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে শত্রু-শিবিরের বিপরীত দিকে ছাড়িয়া দিয়া শত্রুশিবির আক্রমণকরিলেন। শত্রুগণ গাঢ় অন্ধকারে সহসা আক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে ধাবমান পশু-গণের ভীমনাদ শ্রবণকরিয়া ও তাহাদের শৃঙ্গস্থিত অসংখ্য আলোকমালা অবলোকনকরিয়া শত্রুগণ ভাবিল যে, দুই দিক হইতে দুইটি সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ-করিতে আসিতেছে। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল, এবং যে যেদিকে পথ পাইল, সে সেই দিকে দ্রুতবেগে পলায়নকরিল। শত্রুশিবির শত্রুশূন্য হইয়া পড়িল। বিজয়লক্ষ্মী মল্‌হর্‌রাওর অঙ্কশায়িনী হইলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় তাঁহার বীরত্বখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ চান্দোর্ প্রদেশ প্রদানকরিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিয়া-ছিলেন "আমি ইন্দোরের স্বাধীন রাজা হইলেও আমি বাজীরাও পেশোয়ার অধীন একজন সামান্য সেনানী মাত্র।

সুতরাং আমার প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার অজ্ঞাত-সারে ও অনভিমতে উহা গ্রহণ করা আমার উচিত নয়,” এই কথা বলিয়া তিনি এই পুরস্কার গ্রহণকরিতে সম্মত হয়েন নাই। কেবল চান্দোর্ প্রদেশের “দেশমুখ” এই উপাধিমাত্র গ্রহণকরিয়া সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ও তাঁহার মানরক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইন্দোরের নরপতির এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে। মল্‌হর্‌রাও হোল্‌কর্ পূর্ব্বোক্ত রোহিলাযুদ্ধে যেরূপ কৌশলে জয়-লাভ করিয়াছিলেন, শায়েস্তাখাঁকে পরাজয়করিবার জন্য শিবাজীও ঐরূপ কৌশল অবলম্বনকরিয়াছিলেন এবং কার্থেজের ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবীর হ্যানিবল্‌ও একবার ঐরূপ কৌশল অবলম্বনকরিয়া-ছিলেন। এই সময়ে আহম্মদ্ সাহ আব্‌দালী স্বীয় দুর্দ্দম্য প্রবল পরাক্রমে আফ্‌গান্-সৈন্যের সাহায্যে পঞ্জাবপ্রদেশ লুণ্ঠনকরিয়া ঘোর অশান্তি উৎপাদনকরিতেছিলেন। দিল্লীর হীনবল মোগলসম্রাট্ পূর্ব্ব হইতে অন্তর্ব্বিদ্রোহে জর্জ্জরিত হইয়া মহাকষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন। তিনি এই নূতন বহিঃশত্রুর গতি রোধকরিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় শক্তির শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে মহা-রাষ্ট্রীয়গণ যদি গৃহবিবাদ পরিত্যাগকরিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কার্য্যকরিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হিন্দুস্থান হিন্দুরই হইত। পরমেশ্বর মহারাষ্ট্রীয়গণকে

ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ প্রদানকরিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজদোষে—গৃহবিবাদ-দোষে স্ব স্ব প্রধান্য-রক্ষার জন্য অপরকে অবজ্ঞাকরারূপ দোষে ভগবদ্দত্ত সেই সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ যদি পাণিপথযুদ্ধে পরাজিত না হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান হিন্দুরই হইত। পাণিপথের ভীষণযুদ্ধে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় বীর পুরুষের ন্যায় মল্‌হর্‌রাও নিজের দল-বল লইয়া যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন।

গর্ব্বিত সদাশিবরাও শেশোয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেন না। তিনি মল্‌হর্‌রাওকে তাঁহাদের বংশের ভৃত্য বলিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাকরিতেন। মল্‌হর্‌রাও তাঁহাকে একটা উত্তম পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইলে তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মেষপালকের পরামর্শ শুনিতে চাহি না। ইহা বীরপুরুষদিগের যুদ্ধক্ষেত্র। ইহা মেষপাল চরাইবার ক্ষেত্র নয়।" মল্‌হর্‌রাও এইরূপ অবজ্ঞাত হইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি যে উৎসাহ ও উদ্যম হৃদয়ে ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, সে উদ্যম ও উৎসাহের মাত্রা কমিয়া গেল। সর্ব্বসমক্ষে ঐরূপ অপমানে তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বীয় সৈন্য-সামন্ত সহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতিকরিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় জাতির দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। সেই দক্ষিণহস্ত, গর্ব্বিত নির্ব্বোধ

সদাশিবরাও পেশোয়ার অবজ্ঞারূপ মুষ্ট্যাঘাতে বেদনা-প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। পাণিপথের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় জাতির শোকাবহ পরাজয় ঘটিল। এই যুদ্ধে অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য নিহত হইয়াছিল। কেবল একমাত্র মল্‌হর্‌রাওই স্বীয় সৈন্য-সামন্তের সহিত অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমনকরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণামে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজারা হীনবল হইয়া পড়ায় মল্‌হর্‌রাও মহা-রাষ্ট্রীয় জাতির নেতা হইয়াপড়িলেন। তিনি অনুরূপা পত্নী লাভকরিয়াছিলেন বলিয়া মানবজীবনের ঈদৃক্ উৎকর্ষ সাধনকরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী গৌতমাবাই তাঁহার সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিলেন। তিনি যেমন সুশিক্ষি[illegible] পতিব্রতা, গৃহকর্ম্মদক্ষা ও ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন, তদ্রূপ [illegible]নি বীরহৃদয়া দৃঢ়চিত্তা উৎসাহবতী ও সাহসিনী ছি[illegible] মল্‌হর্‌রাও কোন যুদ্ধে পরাজিত বা অকৃতকার্য্য [illegible] বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে গৌতমাবাই তাঁ[illegible]কে নানাবিধ বচন-বিন্যাসে উৎসাহিত ও উত্তেজিত ক[illegible] পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধার্থে প্রেরণকরিতেন। যুদ্ধক্ষেত্র হই[illegible] তিনি যতদিন পর্য্যন্ত গৃহে না আসিতেন, ততদিন পর্য[illegible] গৌতমাবাই কেশসংস্কার ও উত্তম বেশ-ভূষণাদি পরি[illegible]গ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদাই পতির কল্যাণ প্রার্থ[illegible]রিতেন এবং যে সকল গৃহকার্য্যগুলি না

করিলে চলে না, তাহাই করিতেন। পতির ন্যায় তাঁহারও দানশীলতা, আশ্রিতবাৎসল্য, সদাচার, সদ্ব্যবহার ও পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণ ছিল। অহল্যাবাই শ্বশুর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট হইতেই এই সকল সদ্‌গুণ পাইয়াছিলেন। অহল্যাবাইর বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পিতার ও মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবায় মনঃ-প্রাণ অর্পণ-করিয়াছিলেন। তাঁহারা বালিকা নববধূর ভক্তি শ্রদ্ধা ও যত্ন দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মল্‌হর্‌রাও ও গৌতমাবাইর অন্তর কোমল হইলেও বাহিরে স্বভাবটা কিছু উগ্র ছিল। অহল্যাবাই, ভক্তি, শুশ্রূষা, সহিষ্ণুতা, আজ্ঞাপালন ও গৃহকর্ম্মদক্ষতা-গুণে তাঁহাদিগকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। পল্লীর প্রতিবেশিগণ, এই বালিকা নববধূকে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর উগ্র স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই অহল্যা-বাইর প্রশংসা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর স্নেহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালিকা যাহা বলিত, তাঁহারা তাহাই করিতেন। এমন কি, মল্‌হর্‌রাওর রুগ্না-বস্থায় এই বালিকা তাঁহাকে যতটুকু জল পানকরিতে বলিতেন, তিনি ততটুকুই পানকরিতেন। মল্‌হর্‌রাও অত্যন্ত

অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন। অতি সামান্য কার্য্যে অত্যন্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। অহল্যাবাই ইহা ভাল বিবেচনা করিতেন না। অথচ কিন্তু তজ্জন্য শ্বশুরকে কিছু বলিতেও সাহস করিতেন না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ব্যয়ভার স্বহস্তে গ্রহণকরিয়া শ্বশুরের অমিত-ব্যয়িতা-দোষের প্রতিকারকরিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তিনি রাজকুলবধূ ছিলেন। তাঁহার অত্যধিকসংখ্যক দাস-দাসী ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে তাঁহার আলস্য ছিল না। তিনি পরিশ্রমে বিরক্তি বোধ-করিতেন না। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগকরিয়া স্নানাদিকার্য্য সমাপ্তিপূর্ব্বক শিবপূজা করিতেন। পরে দাসদাসীগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণকরিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে প্রণামকরিতেন। তিনি বাল্যকালেই অম্বাদাস পৌরাণিক-নামক এক সদাচার, নিষ্ঠাবান্, জ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকটে দীক্ষা গ্রহণকরিয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা-স্তব-পাঠাদি পারলৌকিক কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানকরিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। রাজবধূ হইয়াও বিলাস কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। পূজা-স্তব-পাঠাদি কর্ম্মে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। অম্বাদাস পৌরাণিকের নিকটে ভক্তি, জ্ঞান ও রাজনীতি-

শাস্ত্র শিক্ষাকরিতেন। বালিকার এইরূপ মতি-গতি দেখিয়া ও শুনিয়া পল্লীর নরনারীগণ তাঁহাকে ভক্তি করিত। সর্ব্বদা পূজা-পাঠ করিলে পাছে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী বিরক্ত হয়েন, এই ভয়ে তিনি অনেক বাহ্য পূজার পরিবর্ত্তে মানসপূজা করিতেন।" সদাচারা শ্রদ্ধাভক্তিমর্ত্তী পূজাজপপরায়ণা বালিকা শূদ্রানী অহল্যাবাই অনেক ভক্তি-শ্রদ্ধা-সদাচার-বর্জিতা প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অপেক্ষা পবিত্রা ছিলেন। অহল্যাবাইর পতিভক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া জ্ঞানকরিতেন, মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রের নাম মালেরাও এবং কন্যার নাম মুক্তাবাই। অহল্যাবাইর ভাগ্যে দাম্পত্যসুখ বেশী দিন ঘটে নাই। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের সমীপবর্ত্তী কুম্ভেরী-নামক দুর্গ-অবরোধ কালে তাঁহার স্বামী খণ্ডেরাও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তখন অহল্যাবাইর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকার্ত্তা অহল্যাবাই চিতারোহণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় চিতাও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর সাশ্রুনয়নে কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, "মা, খণ্ডুজী আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় শোকসাগরে ভাসাইয়া পলায়ন করিল। তুমি আমাদিগকে ত্যাগকরিয়া ইহলোক হইতে পলায়ন করিলে বৃদ্ধশ্বশুর-হত্যার পাতকিনী

হইবে। মা, তোমার এই বালক ও বালিকাকে বিপৎ-সাগরে ভাসাইও না। মাতৃহীন বালক-বালিকাকে কে দেখিবে? আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। আমাদের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী। এ অবস্থায় তোমার এই অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাকে কে রক্ষা করিবে মা"? এই বলিয়া বৃদ্ধ মল্‌হর্‌রাও চিতারোহণে কৃতসঙ্কল্পা পুত্রবধূর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনকরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনকরিতে লাগিলেন। দয়ার্দ্রচিত্তা অহল্যাবাই গুরুজন-বাক্য অলঙ্ঘনীয় বিবেচনাকরিয়া ও শিশু পুত্র-কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যতা বুঝিতেপারিয়া চিতারোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। মল্‌হর্‌রাও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়াই অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিঁনি আজ একটা বিস্তৃত প্রদেশের স্বাধীন স্বনামধন্য রাজা হইতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান মল্‌হর্‌রাও এক্ষণে এই স্থির করিলেন যে, অহল্যাবাইর হস্তে রাজ্যের কয়েকটি কার্য্যের গুরুভার অর্পণকরিলে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভুলিতে পারিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব-রক্ষার পর্য্যবেক্ষণ, রাজস্ব-সংগ্রহের সুব্যবস্থা-বিধান, সৈন্যবিভাগের উন্নতিবিধান ও ব্যয়নির্দ্ধারণ, কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ ও অপসারণ, ও রাজ্যের আয়ের ক্ষতি-বৃদ্ধি-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কার্য্যের গুরুভার বিধবা পুত্র-বধূর হস্তে অর্পণকরিলেন। এই সকল রাজকীয় কার্য্যের

গুরুতর ভার বিধবা পুত্রবধূর হস্তে অর্পণকরায় মল্হর্‌রাওর দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

অহল্যাবাইকে গুরুতর রাজকীয় কার্য্যভারে আক্রান্ত করিয়া রাজকীয় কার্য্য-চিন্তায় নিমগ্ন করিয়া তাঁহার বৈধব্য-যন্ত্রণা হ্রাসকরা ও তাঁহাকে শোক-তাপ-বিলাপাদির অবসর-প্রদান না করাই মল্হর্‌রাওর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। আর তাঁহার অদূরবর্ত্তী মৃত্যুর পর অতিক্লেশে স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জিত তাঁহার মালবরাজ্যের রক্ষার জন্য অহল্যাবাইকে রাজকার্য্যে বিচক্ষণ করা তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। অহল্যাবাইর হস্তে এই সকল রাজকীয় কার্য্যের ভার অর্পণ-করিয়া তিনি সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্য্যের ভার স্বহস্তে রাখিলেন। তিনি ইন্দোররাজধানীতে রক্ষিতব্য প্রয়োজনীয় সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য ও কতিপয় সামন্ত সহ বাফ্‌গাঁও-নামক স্থানে বাসকরিতেন। অহল্যাবাই পূর্ব্বোক্ত রাজকীয় কার্য্যে চিত্ত সমর্পণকরিয়া দিন দিন দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও উচ্চ রাজ-পুরুষগণ তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কোন সামান্য কার্য্যও করিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে প্রভু মল্হর্‌রাওর ন্যায় সম্মানকরিতেন। অহল্যাবাইর কার্য্যও বড় সহজ কার্য্য ছিল না। বড় বড় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান রাজ-কার্য্যাভিজ্ঞ উচ্চবেতনভোগী উচ্চ রাজপুরুষগণের উচ্চ রাজকার্য্যাবলী নিরীক্ষণকরিয়া তাহার দোষ-গুণ বিচার-

করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। তাঁহার শ্বশুর রাজ্যের প্রায় সকল বিভাগের এইরূপ গুরুতর কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণকরিয়াছিলেন। অহল্যাবাইর আর একটি অসাধারণ গুণ এই ছিল, তিনি তাঁহার শ্বশুর অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে অথচ সুচারুরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। তাঁহার শ্বশুর বাফ্‌গাঁও হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি তাঁহাকে সমস্ত হিসাব-নিকাশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি মালবের রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া উচ্চ রাজপুরুষগণও বিস্মিত হইয়া যাইতেন। এই কার্য্যে অহল্যাবাই তাঁহা-দিগের অপেক্ষা এমন কি, তাঁহার শ্বশুর অপেক্ষাও অধিকতর দক্ষা হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষাকার্য্যে তাঁহার এতই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার শ্বশুর তাঁহার দক্ষতার উপর নির্ভরকরিয়া—তাঁহার হস্তে রাজ্যের সমস্ত বিভাগের সমস্ত ভার অর্পণকরিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে পাণিপথ-যুদ্ধে গমনকরিয়াছিলেন। উগ্রপ্রকৃতি মল্‌হর্‌রাও ভাল-মন্দ পরিণাম বিচার না করিয়া হটাৎ কোন একটা কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে অহল্যাবাই ভিন্ন কেহ তাঁহাকে প্রয়োজনানুসারে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিতে পারিত না। সেইজন্য মল্‌হর্‌রাও রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক গুরুতর বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর সহিত অগ্রে পরামর্শ না করিয়া অহল্যাবাইর সহিত সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রণা করিতেন। যে কার্য্যে

প্রধান মন্ত্রী অনুমোদনকরিতেন না, কিন্তু অহল্যাবাই অনুমোদনকরিতেন, মল্‌হর্‌রাও সেই কার্য্যটি করিতেন। যে কার্য্য অহল্যাবাইর অনুমোদিত হইত না, তিনি তাহা কখনই করিতেন না। মল্‌হর্‌রাও জীবিত থাকিতেই অহল্যাবাই রাজ্যের সকল বিষয়েই কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অহল্যাবাই প্রভুশক্তি মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তির মানবী মূর্ত্তি ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টানির্ভরশীল লক্ষ্মীকৃপাপাত্র স্বনামধন্য পুরুষসিংহ মল্‌হর্‌রাও হোল্‌কর্ বহুকাল রাজত্ব ভোগকরিয়া ৭২ বৎসর বয়সে—পূর্ণ বয়সে পূর্ণগৌরবে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র মালেরাও হোল্‌কর্ ইন্দোরের রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। পুত্র রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইলেও অহল্যাবাইকেই প্রকৃতরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহকরিতে হইত। কারণ, একে মালেরাওর বয়স কম ছিল, তারপর তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত অব্যবস্থিত ছিল এবং তিনি রাজকীয় কর্ম্মে অতিশয় অপটু ছিলেন। মল্‌হর্‌রাও যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন অহল্যাবাইর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত থাকিলেও তিনি এই ভার তত দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ, তখন তাঁহার হস্তে এই ভার সত্ত্বেও তিনি তাঁহার শ্বশুরের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভকরিতে পারিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসর গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র

নর্ম্মদা নদীর তীরে বাসকরিয়া ব্রত, পূজা ও দান-ধ্যানাদি পারলৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্মে কিয়ৎকাল সুখে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেন। এক্ষণে রাজকার্য্যা-ক্ষম অল্প-বয়স্ক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরিয়া নর্ম্মদা-নদীতীরে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববৎ কিয়ৎ-কাল অতিবাহিত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়া-ছিল। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব উপলব্ধ হইতে লাগিল। এক্ষণে তাঁহার মহত্ত্ব-প্রদর্শনের সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্বকরিয়া যাঁহাদিগকে স্ববশে রাখিয়া মল্‌হর্‌ রাও বাহুবলে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং অহল্যা-বাই শত্রুমণ্ডলীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হইয়া অতি বিষম সময়ে রাজ্যভার গ্রহণকরিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মালেরাও বাল্যকালেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অহল্যাবাই মনে করিতেন যে, রাজ্যভার স্কন্ধে পড়িলেই পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে। কিন্তু রাজ্যভার-গ্রহণের পর মালেরাওর চরিত্র আরও মন্দ হইয়া পড়িল। যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা এই চারিটি পদার্থের একটি একটিই বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। আর চারিটি একত্র অবস্থিত হইলে তাহারা

কিরূপ ঘোর অনর্থ ঘটাইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পরই মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। মদ্যপান করিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগকেও বেত্রাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ভাবী ইন্দোরাধিপতি তুকোজীরাও হোল্‌কর্-নামক তাঁহার এক অতি নিকট জ্ঞাতি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে উদ্যত হইলে তিনি এক ভৃত্য দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছিলেন। অহল্যাবাই নিষ্ঠাবান্ বেদবেদান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া মালেরাও সেই সকল ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে অত্যন্ত অপমান ও নির্যাতন করিতেন। তিনি পট্টবস্ত্র ও পাদুকার মধ্যে এবং রজতমুদ্রাপূর্ণ সুবর্ণকলসের মধ্যে তীক্ষ্ণবিষধারী সর্প ও বৃশ্চিক গোপনে রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী-গণকে ঐ বস্ত্র ও পাদুকা পরিধানকরিতে বলিতেন এবং ঐ কলসের ভিতর হইতে যত ইচ্ছা তত মুদ্রা লইতে বলিতেন। তাঁহারা ঐ বস্ত্র ও পাদুকা পরিধান করিলেই এবং মুদ্রা-গ্রহণার্থ কলসের মধ্যে হস্ত নিক্ষেপকরিলেই সর্পাঘাতে এবং বৃশ্চিকদংশনে প্রাণত্যাগ করিতেন। এই ব্যাপার দেখিয়া মালেরাও অসীম আনন্দ উপভোগ-করিতেন। পুত্রের এই সকল নৃশংসকাণ্ড দেখিয়া রাজ্ঞী অহল্যাবাইর হৃদয় লজ্জায় ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই অশান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। মালেরাও সর্ব্বদাই মাতার অশান্তি উৎপাদন করিতেন। মাতা, পুত্রের দৌরাত্ম্যে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া সর্ব্বদাই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন এবং পুত্রের চরিত্র যাহাতে সংশোধিত হয়, তন্নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকটে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন।

অতিরিক্ত মদাপান ও ইন্দ্রিয়ের অসংযম-দোষ বশতঃ মালেরাও অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার দুইটি পত্নীও তাঁহার সহিত একচিতায় আরোহণ-করিয়া সহমৃতা হইলেন। এইবার অহল্যাবাই শোক-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। প্রথম, অল্পবয়সে বৈধব্য-যন্ত্রণা, তারপর শ্বশুর ও শ্বশ্রূর মৃত্যু, তারপর একমাত্র পুত্রের বিয়োগ, এবং তৎপরে পুত্রবধূদ্বয়ের সহমরণে তিনি শোকসন্তারে প্রপীড়িতা হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য-সমৃদ্ধিমান্ পুরুষ বা সৌভাগ্যসমৃদ্ধিমতী নারীকে প্রায়ই সাংসারিক সুখে বর্জ্জিত দেখা যায়। তাঁহার সাংসারিক বিপদের সহিত রাজ্যসংক্রান্ত এক মহাবিপদ আসিয়া উপ-স্থিত হইল। বিপদ একাকী আসেনা। পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এক সময়ে সহসা উপস্থিত হইয়া থাকে। পুত্র ও পুত্রবধূদ্বয়ের মৃত্যুর পর শোকার্ত্তা অহল্যাবাইর হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শ্বশুরের অতি নিকট আত্মীয় তুকোজীরাওহল্‌কর্-নামক তাঁহার

সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণকরিয়া কিছুদিনের জন্য নর্ম্মদা-নদী-তীরে নির্জনে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া চিত্তের শান্তিবিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহা হইলনা। সেই সময়ে গঙ্গাধর যশোবন্ত-নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইন্দোররাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মল্‌হর্‌রাওকে যুদ্ধাদি কার্য্য উপলক্ষে অধিকাংশ সময় বিদেশে থাকিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্তের হস্তেই সমস্ত রাজ্যভার অর্পিত থাকিত। মল্‌হর্‌রাওর মৃত্যুর পর কূটবুদ্ধি গঙ্গাধর যশোবন্ত অহল্যাবাইকে সদা ধর্ম্মকর্ম্মে নিরতা দেখিয়া বলিল, "মাতুশ্রী, (মা) আপনি নিজের ব্যয়োপযোগী কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি লইয়া পুণ্যতমতীর্থ কাশীতে বাসকরুন। আপনার এরূপ অবস্থায় কাশী-বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প"। অহল্যাবাই গঙ্গাধরের কথা শুনিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাকে অপসারিত করিয়া মালব-রাজ্য আত্মসাৎ করাই গঙ্গাধরের উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিলনা। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, কাশী-বাসের সময় এখনও অতীত হয় নাই। আমার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমিই বুঝিব। আমি আপনার উপদেশের প্রার্থিনী নহি"। অহল্যাবাই আপাততঃ নর্ম্মদা-তীরে নির্জ্জনবাসে বিরতা রহিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি দল গঠিত করিতে-

আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার মনের মত লোক রঘুরাও বা রাঘোবা দাদা পেশোয়াকে এই দলের নায়ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই পাপিষ্ঠ রাঘোবা ইতিহাস-পাঠকের নিকটে সুপরিচিত। এই কুলাঙ্গারের মূর্খতা-দোষেই ইংরাজদিগের সহিত প্রথম মহারাষ্ট্রযুদ্ধ বাধিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ মানব-রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছিল। গঙ্গাধর যশোবন্ত, রাঘোবাকে একখানি গুপ্তপত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, "ইন্দোররাজ্য উত্তরাধিকারিশূন্য হইয়াছে। আপনি ইহা এক্ষণে অনায়াসে অধিকার করিতে পারেন। আপনি সত্বর আসিয়া এই রাজ্য অধিকারকরুন। মালেরাওর মৃত্যুতে রাজ্যের সকলেই শোকার্ত্ত। ঈদৃশ উত্তম সময়েই ইন্দোররাজ্যের সিংহাসন অধিকারকরাই আপনার একান্ত উচিত। এইরূপ সুযোগ ত্যাগকরা আপনার উচিত নহে। এইরূপ সুযোগ আর ঘটিবে না"। গঙ্গাধরের পত্র পাইয়া রাঘোবার আনন্দের সীমা রহিলনা। কারণ, এই সময়ে যিনি পেশোয়া-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহার নাম মাধবরাও পেশোয়া। রাঘোবা, মাধবরাওর পিতৃব্য ছিলেন। সুতরাং রাঘোবার একটা স্বাধীন-রাজ্যের সিংহাসনে বসিবার লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া রাজদণ্ড ধারণকরা অপেক্ষা ইন্দোরের শূন্য সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড ধারণকরাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি

ইন্দোরের শূন্য সিংহাসনে বসিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর যশোবন্তের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শিবাজী গোপাল ও রাওজী মহাদেব-নামক অহল্যাবাইর দুইজন অতিবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম অবগত হইয়াছিলেন। অহল্যাবাই সে সময়ে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা নিজে এই সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর করিতে সাহসী হইলেননা। তাঁহারা হর্‌কুবাই ও উদাবাই-নাম্নী মল্‌হর্‌রাওর দুই কন্যাকে প্রথমতঃ এই বিষয় অবগত করাইলেন। হর্‌কুবাই ও উদাবাই অহল্যাবাইকে এই বিষয় জানাইলেন। অন্যলোক হইলে ঈদৃশ শোকের সময়ে এইরূপ সংবাদ শ্রবণকরিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু বীর-পুত্রবধূ বীরপত্নী ভারতের বীরনারী অহল্যাবাই এই সংবাদ শ্রবণ-করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান-করাইয়া ঘৃণা দৃঢ়তা ও তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "দুইটা পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, চণ্ডালোচিত পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা রাজ-পুত্রবধূকে রাজার ধর্ম্মপত্নীকে পথের কাঙ্গাল করিতে উদ্যোগ করিতেছে।

একটা ব্রাহ্মণ আমার লবণভক্ষক কৃতঘ্ন গঙ্গাধর যশোবন্ত, আর অন্য ব্রাহ্মণটি, পেশোয়াকুলের অধম আত্ম-সম্মান-জ্ঞানহীন দুষ্টাশয় রাঘোবা। কিন্তু আমি

বলিতেছি, আমি ভীম অসি হস্তে রণক্ষেত্রে চামুণ্ডা-রূপে দাঁড়াইলে পেশোয়ার সিংহাসন বিকম্পিত হইবে। আমরা যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্রাহ্মণের জাতি নহি। আমরা "শিলেদার"। (যুদ্ধোপজীবী অশ্বসৈনিকের জাতি) আমার শ্বশুর বাহুবলে এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। কেরাণীগিরি করিয়া রাজ্য স্থাপনকরেন নাই। (বাজীরাও পেশোয়া প্রথমে শিবাজীর অধীনে কেরাণীগিরি করিতেন, পরে বৃহৎ স্বাধীন পেশোয়া-রাজ্য প্রতিষ্ঠা-করিয়াছিলেন। পেশোয়া শব্দের অর্থ কেরাণী) আমার শ্বশুর পেশোয়ার অধীনে সৈনিকের কার্য্য করিয়া ভৃত্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রভুর উপকার ছাড়া কখনও কৃতঘ্নতা-আচরণ করেন নাই। তাঁহার প্রভু এত সন্তুষ্ট না হইলে তাঁহাকে এত জায়গীর দিতেন না। প্রভুকুলোৎপন্ন হইয়া ভৃত্যবংশের অনিষ্টসাধন করা ব্রাহ্মণোচিত কার্য নয়। আমার শ্বশুর শ্রীমন্তদিগের (পেশোয়াদিগের) সেবক হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি আজীবন ভৃত্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার পুত্রবধূ হইয়া তাঁহাদিগকে তদ্রূপ সম্মান করিতে সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু সেবিকার অনিষ্ট-সাধন করা প্রভুকুলের উচিত কার্য্য নয়। আমার শ্বশুরের রাজ্যের ধ্বংস-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না"। অহল্যাবাই শিবাজীগোপাল ও রাওজিমহাদেবের প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপকরিয়া বলিলেন, "আপনারা দুইজন যে, আমার অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, তাহা আমি অদ্য বুঝিতে পারিলাম। আপনারা অদ্যই গাইকোয়াড়্ ভোন্‌সলে ও সেনাপতি ভাদাড়ে এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় মণ্ডলেশ্বর রাজাদিগের নিকটে শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া সৈন্য-সাহায্য-প্রেরণের নিমিত্ত গুপ্তভাবে পত্র প্রেরণকরুন। পত্রে যাহা লিখিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি। আমার বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ তুকোজিরাও হোল্‌কর্ এক্ষণে উদয়পুরে আছেন। তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণকরিয়া তাঁহাকে এখানে আহ্বানকরুন। কিন্তু খুব সাবধান। যেন আমাদের এই গুপ্তমন্ত্রণা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া না পড়ে। মন্ত্রগুপ্তি বিষয়ে খুব সাবধান হইবেন।" পূর্ব্বোক্ত রাজা-দিগের নিকটে এইরূপ এক একখানি গুপ্তপত্র লিখিত হইয়াছিল :—"আমার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় স্বহস্তে অসি-চালনাদিরূপ ইষ্টকপ্রস্তরখণ্ডাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে বীরত্বরূপ ভিত্তি নির্ম্মাণকরিয়া তদুপরি একটি উচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকার ন্যায় ইন্দোররাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে দৈব এক্ষণে আমার প্রতিকূল হওয়ায় আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। যে সকল আশ্রিত ভৃত্য, কঠোর সেবা ও দেহরক্তপাত দ্বারা প্রভু শ্রীমন্ত-দিগকে (পেশোয়াদিগকে) পূর্ব্বে সাহায্য করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে পারিতোষিক-

স্বরূপ জায়গীর সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল প্রভু-সাহায্যকারী আশ্রিত ভৃত্যের সন্তানদিগকে রক্ষা করা এবং সেই সন্তানগণের নিকট হইতে বংশপরম্পরাক্রমে সেবা গ্রহণকরাই শ্রীমন্তদিগের (পেশোয়াদিগের) উচিত কার্য্য। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভৃত্যের সন্তানদিগকে বঞ্চনাকরিয়া বিপন্ন করিয়া বলপূর্ব্বক অন্যায়পূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই ধনসম্পত্তি গুলি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। নিজপ্রদত্ত ধন নিজে অপহরণকরিয়া দত্তাপহারী পাপী হইতে তাঁহারা এক্ষণে সচেষ্ট। দত্তাপহার-পাপকে পাপ বলিয়াই তাঁহারা গণ্য করিতেছেন না। এক্ষণে তাঁহারা তাদৃশ পাপানুষ্ঠানের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। আমার ভাগ্যে যেরূপ ভোগ নিরূপিত আছে, তাহা আমাকে অবশ্যই ভুগিতে হইবে। কিন্তু অদ্য আমি যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছি, কালে আপনাদেরও সেইরূপ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। কারণ, আপনারাও আমার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের ন্যায় শ্রীমন্তদিগের (পেশোয়াদিগের) ভৃত্য।

শ্রীমন্তগণ ভৃত্যবঞ্চনার অভিনয় করিবার জন্য রণ-রঙ্গ-মঞ্চে উপস্থিত হইতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। আমার স্বার্থ আপনাদের স্বার্থের সহিত বিজড়িত। উভয় পক্ষেরই সমান স্বার্থ। সেইজন্য আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা

করিবার নিমিত্ত শীঘ্র সৈন্য-সাহায্য প্রেরণ করুন, ইহাই আপনাদের পরমবন্ধু সুভেদার্ মল্‌হর্‌রাও হোল্‌করের বিধবা পুত্রবধূর সবিনয় নিবেদন, জানিবেন"। মহারাষ্ট্রীয় নরপতিগণ রাজনীতিক সুকৌশলে লিখিত এই গুপ্তপত্র খানি অহল্যাবাইর দূতের নিকট হইতে পাইবামাত্র এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণকরিতে লাগিলেন। বরোদার গাইকোয়াড়্ মহারাজ বিংশতি সহস্র সৈন্য ইন্দোরে প্রেরণকরিলেন। মহারাজ জন্থুজী ভোন্‌স্‌লা বহু সৈন্য-সামন্ত সহ নর্ম্মদানদীতীরস্থ হুসেঙ্গাবাদে কার্য্যোপলক্ষে বাসকরিতেছিলেন। তিনি অহল্যাবাইর পত্র প্রাপ্তিমাত্র দূত প্রেরণকরিয়া জানাইলেন যে, সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ শীঘ্র আগমন করিতেছেন। অন্যান্য মণ্ডলেশ্বর নরপতিগণও, অহল্যাবাইকে এই বিপদে সাহায্য করিবার জন্য বহু সৈন্য প্রেরণকরিতে লাগিলেন। অহল্যাবাই পেশোয়া-সিংহাসনে অধিরূঢ় মাধবরাও পেশোয়া এবং তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠা সুস্বভাবা পত্নী রমাবাইকেও একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাদের পিতৃব্য রাঘোবার কাণ্ড তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন এবং এই বিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনাকরিয়াছিলেন। মাধবরাও পেশোয়া অহল্যাবাইর এই পত্র পাইয়া নিম্নলিখিত উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন:—"যে ব্যক্তি আপনার শ্বশুরের

রাজ্য ও ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে, এমন কি, যে পাপী উহা আত্মসাৎ করিবার জন্য পাপ প্রবৃত্তিকে মনে স্থান দিবে, আপনি তাহাকে অতি অবশ্য দণ্ড দিবেন। আপনি এ বিষয়ে কোন সংকোচ বোধকরিবেন না। এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই জানিবেন। আপনি আপনার শ্বশুরের মৃত্যুর পর যে, স্বহস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত জানিবেন। আমি যে, উহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তাহার প্রমাণ এই যে, অতঃপর আপনি অন্যান্য স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় আপনার দুইজন দূতকে আমার রাজধানীতে পাঠাইয়া দিবেন। দূতদ্বয় আমার রাজধানীতে থাকিয়া আমার রাজসভায় যথাবিধি গতায়াত করিতে পারিবেন। অদ্য হইতে আমি আপনাকে আমার রাজসভায় দূত রাখিবার অধিকার প্রদান করিলাম"। মাধবরাও পেশোয়া তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা পেশোয়ার দুঃষ্ট স্বভাব অবগত ছিলেন। শ্বশুর-পতি-পুত্র-বিহীনা অহল্যাবাইর প্রতি তাঁহার ঐরূপ কুৎসিত আচরণে তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ভৃত্যবংশের প্রতি পেশোয়াকুলোৎপন্ন ব্যক্তির এইরূপ কুৎসিত আচরণ অত্যন্ত ঘৃণাজনক বোধকরিয়া তিনি বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন। মাধব রাও পেশোয়ার পত্নী রমাবাইর সহিত অহল্যাবাইর ঘনিষ্ঠ সখ্যভাব ছিল। তাঁহাদের সর্ব্বদা পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিত না বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের

পরস্পরের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান চলিত। একদা মাধব রাও যখন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন অহল্যাবাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য পুণায় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অহল্যাবাইর সহিত রমাবাইর নানাবিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। সেই সময়ে রমাবাই অহল্যা-বাইকে বলিয়াছিলেন যে, রাঘোবা ও তাঁহার পত্নী আনন্দী-বাইর কুটবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতা দোষে শেষে পেশোয়া-কুলের গৌরব নষ্ট হইবে এবং মহারাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য সমূলে বিধ্বস্ত হইবে। পেশোয়া-বংশ উৎসন্ন হইবে। পেশোয়াবংশের এই ভয়ঙ্কর শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঈশ্বরের নিকটে তিনি সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আর তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পাছে এই ভয়ঙ্কয় শোচনীয় পরিণাম দর্শনকরিতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইবেন। ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তুকোজী রাও হোল্‌কর্ দূতমুখে অহল্যাবাইর আজ্ঞা শ্রবণকরিবামাত্র ইন্দোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অহল্যাবাই তাঁহার হস্তে সৈন্যবিভাগ ও রাজ্যের অন্যান্য বহু বিভাগের ভার অর্পণকরিলেন এবং "গাড়্‌রা খেরী"-নামক স্থানে শিবির স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বহু সৈন্য সহ অবস্থিতি করিয়া শত্রুপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য

রাখিবার জন্য আজ্ঞা প্রদানকরিলেন। মণ্ডলেশ্বর গায়্-কোয়াড়্ ও ভাদাড়ে তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সৈন্য ইন্দোরে প্রেরণকরিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত রসদ প্রদানকরিতে ও শত্রুসৈন্যকে বাধা দিবার জন্য তাহা-দিগকে যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপিতকরিতে আজ্ঞা দিলেন। কোথায় কোন সৈন্যদল কিপ্রকারে অবস্থিতি করিলে শত্রুপক্ষের গতি রোধকরিতে পারা যাইবে, কিপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুপক্ষকে পরাজয়করিতে পারা যাইবে, তদ্বিষয়ে রাজনীতিশাস্ত্রসুপণ্ডিতা অহল্যাবাই কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া সুব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিজ সৈন্যগণকেও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশকরিলেন। রাজ্যমধ্যে চতুর্দ্দিকেই সমরায়োজন এবং সাজ্ সাজ্ রব পড়িয়া গেল। অহল্যা-বাইর স্নেহ দয়া ও সুবিবেচনা গুণে রাজ্যের প্রজাবর্গ তাঁহাকে মাতৃবৎ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। যে সকল প্রজা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, তাহারাও তাঁহার রাজ্যের রক্ষার জন্য উৎসাহে ও কর্ত্তব্য-বিবেচনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এদিকে গঙ্গাধর যশোবন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে অহল্যাবাইকে এইরূপ সতর্ক হইতে দেখিয়া রাঘোবাকে গুপ্তভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে লাগিল। রাঘোবা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, একটা বিধবার

রাজ্য আক্রমণকরিয়া আত্মসাৎ করা ধন-জন-সম্পন্ন পেশোয়াকুলোৎপন্ন পরাক্রমী দুর্দ্দান্ত রাঘোবার পক্ষে অতি সামান্য কথা। তারপর তিনি গঙ্গাধরের নিকট হইতে যখন শুনিলেন যে, ব্যাপারটি বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ বিধবা নারী সামান্য বিধবা নারী নয়। এই বিধবা নারীর ক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। সেই ভ্রান্ত ধারণা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু এইরূপ সময়ে তিনি যদি যুদ্ধার্থ অগ্রসর না হয়েন, তাহা হইলে পেশোয়া-কুল কলঙ্কিত হইবে। একটা ভৃত্যবংশীয় সামান্য বিধবার সহিত যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে লোকসমাজে তিনি মুখ দেখাইবেন কিরূপে? এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সৈন্য-সামন্ত সহ একটি বিধবা অবলার সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

অহল্যাবাই এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্য-সামন্তগণের নেত্রীত্ব গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, অশ্বারোহণ, অস্ত্র-শস্ত্রসঞ্চালনাদি যুদ্ধবিদ্যা যে, শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তাহা না শিখিলে একেবারে হটাৎ যুদ্ধের দিন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণকরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত

অসম্ভব। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সমরাঙ্গনে যে, উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং তিনি বাল্যকালে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিয়া রাজস্ব-আদায়, রাজ্যরক্ষা-ব্যয় প্রভৃতি রাজকীয় কার্য্যসমূহের শিক্ষার সহিত যুদ্ধবিদ্যাও, শিক্ষাকরিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাকে সমরাঙ্গনে সৈন্যবেশে উপস্থিত দেখিয়া ও তাঁহার সাহস বিক্রম ও কঠোর প্রতিজ্ঞা সন্দর্শনকরিয়া তাঁহার শত্রুবর্গ বিস্মিত হইয়া গেল। রাঘোবা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে তিনি কোন প্রকারেই বিজয়ী হইতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিপত্তির রক্ষার জন্য পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহ ইন্দোর-আক্রমনার্থ সিপ্রা-নদীর দক্ষিণতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত তাঁহাকে নানাকথায় যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিল। অহল্যা-বাইর সৈন্যাধ্যক্ষ তুকোজী রাও হোল্‌কর্ এই সংবাদ অবগত হইয়া অহল্যাবাইর চরণে প্রণামকরিয়া রাঘোবার অভিযানে বাধা দিবার নিমিত্ত সিপ্রা-নদীর দক্ষিণতীরা-ভিমুখে সৈন্য সহ যাত্রা করিলেন। কোন স্থানে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া সমস্ত রাত্রি সুদূর পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে সিপ্রা-নদীতীরস্থ উজ্জয়িনী-নগরীর সমীপস্থ একটি গিরিসঙ্কটে আসিয়া তথায় শিবির স্থাপন-করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাঘোবার সৈন্যদিগকে

সিপ্রা-নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে দেখিয়া তুকোজী রাঘোবাকে দূতমুখে জানাইলেন যে, রাঘোবা সিপ্রা-নদী উত্তীর্ণ হইলেই তুকোজী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ করিবেন। রাঘোবা যেন তাঁহার উদ্যোগের পরিণাম বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হয়েন। তাঁহার উদ্যোগের পরিণাম কিন্তু বড়ই মন্দ। রাঘোবা, তুকোজীর তেজস্বিতাব্যঞ্জক ও দৃঢ়তাসূচক বাক্য শ্রবণকরিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এক্ষণে তিনি এই যুদ্ধের পরিণামই বিশেষভাবে চিন্তা-করিতে আরম্ভকরিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি এই যুদ্ধে প্রথম বারে তাঁহার পরাজয়ই ঘটে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বারে পুনরায় যুদ্ধ-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে পেশোয়া-সিংহাসনে অধিরূঢ় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবরাওর শরণাপন্ন হইতে হইবে। অথচ মাধবরাও কিন্তু এ যুদ্ধে সম্মতি দান-করেন নাই। অধিকন্তু তিনি পিতৃব্যকে বলিয়াছেন যে, আপনার এই কার্য্যের জন্য আপনি নিজেই দায়ী। মাধব-রাওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই নিজব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ-করিয়া এই যুদ্ধ চালাইতে উদ্যত হইয়াছেন। যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজস্কন্ধেই গ্রহণকরিয়াছেন। অহল্যা-বাইর পক্ষে সমস্ত মহারাষ্ট্রশক্তি যোগদান করিয়াছেন। সকলে একদিকে, আর তিনি একাকী একদিকে। এ অবস্থায় যুদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ চালাইলে শেষরক্ষা

করিতে পারা যাইবে না। ইত্যাদিরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চারিদিকে চিন্তা করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে সিপ্রানদী উত্তীর্ণ হইতে নিষেধকরিলেন। তুকোজীর সাময়িক শাসনবাণী মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া রাঘোবার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। রাঘোবা দূতমুখে তুকোজীকে জানাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে আসেন নাই। মালেরাও পরলোকে গমন করিয়াছেন শুনিয়া পুত্রশোকার্ত্তা অহল্যাবাইকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কেবল তিনি পুণা হইতে ইন্দোর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন মাত্র। তুকোজী রাও রাঘোবার দূতমুখে এই কথা শুনিয়া দূতকে বলিলেন, "তোমার প্রভু যদি "মাতুশ্রী"কে (অহল্যাবাইকে) সান্ত্বনা দিবার জন্যই ইন্দোরে আসিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে এত সৈন্য-সামন্ত কেন" ? রাঘোবার দূত রাঘোবাকে এই কথা নিবেদন করিলে তিনি তুকোজীর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তুকোজীর সন্দেহ দূর করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। তিনি কতিপয় সামন্ত (সর্দ্দার) ও দুইজন মাত্র দেহরক্ষক সঙ্গে লইয়া তাম্‌জামে আরোহণকরিয়া তুকোজীর শিবিরে গমনকরিলেন। তুকোজী দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন ও যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার তাম্‌জামের পার্শ্বে পদব্রজে শিবিরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে যথাবিধি তাম্‌জাম্ হইতে নামাইলেন এবং ভৃত্যবংশোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া

তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইলেন এবং নিজে নীচাসনে বসিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রার্থনাকরিলেন। রাঘোবা বলিলেন, "আমি আমার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত উজ্জয়িনীতে রাখিয়া কতিপয় মাত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত ইন্দোরে গিয়া পুত্রশোকার্ত্তা অহল্যাবাইকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতেছি"। তুকোজী বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করিলে এ ভৃত্য অদ্যই আপনাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দোরে যাইতে প্রস্তুত আছে"। তুকোজী সেই দিনই রাঘোবাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক দূত অগ্রেই ইন্দোরে গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা অহল্যা-বাইকে নিবেদনকরিল। অহল্যাবাই তুকোজীর কার্য্য-দক্ষতা অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সৈন্য-সামন্তদিগকে যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগকরিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদানকরিলেন। যে সকল রাজা তাঁহাদের সৈন্যগণকে প্রেরণকরিয়াছিলেন, সেই সকল সৈন্যকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানকরিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রেরণকরিলেন। দৈবকৃপায় বিনা রক্ত-পাতেই যুদ্ধের সুফল ফলিল দেখিয়া ও রাঘোবা করায়ত্ত হইল দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। তুকোজীর সহিত রাঘোবা যথাসময়ে ইন্দোরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার বাসের নিমিত্ত অহল্যাবাই নিজ প্রাসাদের সমীপস্থ

একটি বৃহৎ অট্টালিকা সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্য অগ্রেই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। রাঘোবা তথায় আসিয়া প্রায় মাসাবধি কাল বাসকরিয়াছিলেন। তাঁহার এতদিন বাসকরিবার একটি রাজনীতিক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোন প্রকারে তিনি ইন্দোররাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ব্যবস্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপাততঃ তিনি ইন্দোররাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া অভিলষিত ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন। পরে, অহল্যাবাইর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারি-শূন্য ইন্দোররাজ্য তাঁহার হস্তগত হইতে পারে। কিম্বা যদি কোন প্রকারে অহল্যাবাইকে একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইতে পারা যায়, এবং ঐ দত্তকপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার যদি তিনি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই দত্তকপুত্রকে ক্রীড়াপুত্তলী করিয়া তিনি স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু এই সকল বিষয় হটাৎ অহল্যাবাইর নিকটে প্রস্তাবকরিলে বুদ্ধিমতী অহল্যাবাই তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন। সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব একদিনে এই সকল বিষয় উত্থাপন করা রাজনীতি শাস্ত্রানুমোদিত নহে। সেইজন্য এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অন্ততঃ মাসাবধিকাল এখানে থাকা অতি প্রয়োজনীয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাঘোবা প্রায় মাসাবধি কাল ইন্দোরে অবস্থিতি করিয়া-

ছিলেন। এই এক মাসের মধ্যে "সেব্য সেবকের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ" এবং রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় লইয়া অহল্যা-বাইর সহিত রাঘোবার সাত আট বার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। রাঘোবা, বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা অহল্যাবাইর নিকটে এই সকল তর্কে পরাজিত হইয়াছিলেন। অহল্যা-বাই নবদ্বীপের বাঙ্গালী নৈযায়িকের নিকটে তর্কবহুল ন্যায়-শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কি, না, তাহা এক্ষণে জানিবার কোন উপায়ই নাই। কিন্তু তাঁহাকে রাজনীতিক তর্কে কেহ যে, পরাভূত করিতে পারিত না. ইহা বখর-নামক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। রাঘোবা অহল্যাবাইর নিকটে তর্কে পরাভূত হওয়ায় ও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি ইন্দোর ত্যাগকরিয়া পুণায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে তুকোজীকে বহু-মূল্য বস্ত্র উষ্ণীষ ও আভরণাদি বহু পারিতোষিক প্রদান-করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত অহল্যাবাইর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজকৃত মহাপরাধের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে বালকের ন্যায় ক্রন্দনকরিয়া শত বার ক্ষমা প্রার্থনাকরিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত অনুতপ্ত দেখিয়া স্নেহদয়ার্দ্রচিত্তা অহল্যাবাই তাঁহাকে ক্ষমাকরিয়া-ছিলেন এবং পরে তাঁহাকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, গঙ্গাধর যশোবন্ত নিজের অকৃতজ্ঞতা ও বিরুদ্ধাচরণ স্মরণকরিয়া মধ্যে মধ্যে এতই

অনুতপ্ত হইতেন যে, রাজকার্য্য করিতে করিতে সময়ে সময়ে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হইত। সেই অনুতাপের ফলে তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, এবং অবশেষে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগকরিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণকরিয়াছিলেন। অহল্যাবাই সৈন্যাধ্যক্ষ তুকোজীকে প্রধান দৌত্যপদ প্রদানকরিয়া পুণায় পেশোয়া-দরবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। বুদ্ধিমতী অহল্যাবাই ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, তুকোজীর ন্যায় বুদ্ধিমান শক্তিমান রাজনীতি-চতুর ব্যক্তিই পেশোয়া-দরবারের মত দরবারে থাকিয়া সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে একমাত্র সমর্থ। তুকোজীর এক কথায় রাঘোবার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হওয়ায় যুদ্ধ আরব্ধ হয় নাই এবং ধরাতল অনর্থক নর-শোণিত-স্রোতে প্লাবিত হয় নাই।

বিনা রক্তপাতে ইন্দোররাজ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। তুকোজী পুণায় গিয়া পেশোয়া-দরবারে অহল্যাবাইর প্রধানদূতরূপে নিযুক্ত হইলে অহল্যাবাই, বিপদে উপকারক গাইকোয়াড়্, সিন্ধিয়া, ও ভোন্‌সলা প্রভৃতি স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় নরপতিদিগকে ইন্দোরে নিমন্ত্রণকরিয়া মহাসমাদর ও যত্নের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন এবং ভোজনান্তে তাঁহাদিগকে মূল্যবান বস্ত্র, উত্তরীয়, উষ্ণীষ ও নানাবিধ রত্নালঙ্কার প্রদানকরিয়া কৃতজ্ঞতা মিত্রতা ও

সদ্ভাব-সূচক বচনে সবিনয় নিবেদন করিলেন, “আপনারা আমাকে বিপদে সাহায্য করিয়া যেরূপ হৃদয়ের মহত্ব ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনকরিয়াছেন, তাহা আমি কোন ভাষার দ্বারা বর্ণনা করিতে নিতান্ত অক্ষম, জানিবেন। আমি আপনাদের নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আপনাদের দয়ার তুলনা নাই। আমি ও আমার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণ আপনাদের নিকটে চিরকাল ঋণী রহিল, জানিবেন।” নৃপতিগণ অহল্যাবাইর আদর যত্ন ও সদ্ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত হইয়া স্ব স্ব রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। যখন অহল্যাবাই পুত্র-শোকে শয্যাগত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন গঙ্গাধর যশোবন্ত ও রাঘোবা পেশোয়া তাঁহার অন্য আর একটি ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটাইয়া তাঁহার মৃতপ্রায় শরীরে খড়্গ-প্রহারবৎ অমানুষিক বা পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই বিপদের উপর বিপদে পড়িয়া অহল্যাবাই যেরূপ ধৈর্য্য, সাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞান, রাজনীতিশাস্ত্রে দক্ষতা, এবং মানসিক ও শারীরিক বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া উদয়পুর যোধপুর জয়পুর প্রভৃতি দেশের স্বাধীন নরপতিগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং তিনি এই হৃদয়বিদারক পুত্রশোকের সময়ে বুদ্ধিবলে পূর্ব্বোক্ত বিপদ্ হইতে শীঘ্র উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁহারা সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া

ও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা-লাভের জন্য তাঁহার নিকটে বহুমূল্য উপহারসকল প্রেরণ-করিয়াছিলেন। অহল্যাবাই তাঁহাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকটে প্রত্যুপহার প্রেরণকরিয়া-ছিলেন ও তাঁহাদের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া তাঁহা-দিগের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। তুকোজী, পেশোয়া-দরবারে অহল্যাবাইর প্রধান দূত হইয়া যখন পুণায় গমন-করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অহল্যাবাই নারোগণেশ (নারায়ণগণেশ) ও শিবাজীগোপাল-নামক দুই জন অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে তাঁহার সহিত তথায় পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহারা তিন জন পেশোয়া-দরবারে উপস্থিত হইলে মাধব রাও পেশোয়া, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসিতে আদেশ দিয়া অহল্যাবাইর ও তুকোজীর প্রশংসায় রাজসভা প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। পেশোয়ার পক্ষ হইতে মহারাণী অহল্যাবাইর দরবারে একজন বিশ্বস্ত রাজনীতিজ্ঞ দূত রাখিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মাধব রাও বলিলেন, "আমার দরবারের কোন লোক তথায় নিযুক্ত হইলে তাহার মতের ও মনের সহিত তোমাদের মতের ও মনের ঐক্য সংসাধিত হইতে বহুদিন লাগিবে। অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, মহারাণীর নিজের দরবারের একজন বিশ্বস্ত রাজনীতিজ্ঞ লোক তথায় আমার দূতরূপে নিযুক্ত হইলে আমি তাহাকে নিয়োগপত্র ও যথোপযুক্ত

মাসিক বেতন প্রদানকরিব। ইন্দোরের লোক ইন্দোরে থাকিয়া পেশোয়া-দরবারের কার্য্য করিলে তাহার যথেষ্ট সুবিধা ও পরম লাভ হইবে। মহারাণী যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আমি আমার দূতরূপে তথায় নিযুক্ত করিব। অহল্যাবাইর ইচ্ছানুসারে নারোজীগণেশ এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অহল্যাবাই প্রতিদিন রাজোচিত বেশ পরিধানকরিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া দরবার করিতেন। তাঁহার শ্বশুরের ও পুত্রের মৃত্যুর পর রাজ্যের সকল বিভাগের সমস্ত কার্য্য-ভার তাঁহার হস্তে পতিত হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি অকাতরে সেই সমস্ত ভার বহনকরিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য সম্পাদন-করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিচারকের কার্য্য করিতে হইত। মহারাণী অহল্যাবাই প্রাণদণ্ডের বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার পর্য্যন্ত করিতেন। তাঁহার কোন প্রজা দরিদ্রতম হইলেও তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নিজের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপনকরিতে পারিত এবং উহা জ্ঞাপন-করিলে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইয়া উহার সুবিচার করিতেন। তুচ্ছ ও গুরুতর সকল বিষয়েই তিনি সমভাবে বিচার করিতেন। তিনি স্বকর্ণে প্রজার আবেদন শুনিতেন। অন্যান্য বিচারকগণ যে সকল বিচার করিতেন,

তিনি সেই সকল বিচারের দোষ-গুণ স্বয়ং পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার রাজকার্য্য-সম্পাদনের অসাধারণ ক্ষমতা শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মালব ও মধ্য-ভারতের ইতিহাসপ্রণেতা স্যার্ জন্ ম্যাল্‌কম্ সাহেব একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "হোল্‌কর্‌বংশীয় ব্যক্তিগণের নিকটে অহল্যাবাইর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তাঁহারা অহল্যাবাইর পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, এবং অতিরিক্ত প্রশংসায় পাছে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্যতার হানি হয়, এই বিবেচনায় আমি তাঁহার নিঃসম্পর্ক পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাঁহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহকরিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার বিষয় যতই অনুসন্ধান করিয়াছি ততই আমার বিস্ময় ও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছে"। অহল্যা-বাই স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণের পরই রাজ্যের সমগ্র কৃষি-ক্ষেত্রের পরিমাণ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রের পুনঃ-পরিমাণ-নিরূপণ করিতে গেলেই সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণের বৃদ্ধিই সম্পাদিত হইয়া পড়ে। ইহাতে ভূস্বামিগণেরই যথেষ্ট লাভ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পরিমাণ-নিরূপণচ্ছলে অনেক ভূস্বামী প্রজাদিগকে ছলে বলে কৌশলে প্রবঞ্চিত করিয়া নিজ নিজ বার্ষিক আয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন। কিন্তু অহল্যাবাই এইরূপ কার্য্য দ্বারা প্রজাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া তাহাদের সুখ-

শান্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের কোন ক্ষতি করেন নাই। তাঁহার শ্বশুরের সময় হইতে যে যেরূপ প্রজাস্বত্ব উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, তিনি তাহাকে সে স্বত্বে বঞ্চিত করেন নাই। এবং সেই স্বত্বের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অতিরিক্ত কর দিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করেন নাই। অহল্যাবাইর রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখ-শান্তিতে কালযাপন করিত। তিনি প্রজাগণকে এতই ভাল বাসিতেন যে, প্রজা দুষ্টই হউক আর শিষ্ট হউক, তাঁহার নিকটে দুইজনই স্নেহের ও দয়ার পাত্র ছিল। উচ্চতম বিচারালয়ে বিচারকরিয়া কোন অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদানের সময় অহল্যাবাই বিচারাসনে বসিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই কথা বলিতেন, যে, "ঈশ্বরের সৃষ্ট অন্য কোন মানুষকে বধকরিবার পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশেষভাবে তাহার অপরাধের বিচারকরিয়া ও দণ্ড নীতি-শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকে বধকরাই মরণশীল মানবের একান্ত উচিত কার্য্য"। সাধারণতঃ মহিলাজাতির মধ্যে অনেকেই আলস্য, ঔদাস্য, তাম্বুলাদিচর্ব্বণ, "তাস্" ও "দশ পঁচিশ" প্রভৃতি ক্রীড়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরচর্চ্চা বস্ত্রালঙ্কারচর্চ্চা, নাটক-"নভেল"-পাঠ, শিশু পুত্র-কন্যারা রোদনকরিলেই তাহাদিগকে প্রহার, এবং ননদ, যা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর ও ভাসুর প্রভৃতি একান্নবর্ত্তী লোকদিগের সহিত বিবাদ-

বিসম্বাদেই অনেক সময় বৃথা নষ্ট করেন। যাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা মন্দ, যাঁহাদের দাস-দাসী নাই, তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত গৃহকর্ম্মের পর মধ্যাহ্নে ভোজনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অপরাহ্নে একটু নিদ্রা যান্। তারপর উত্থিত হইয়া পুনরায় অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভোজনান্তে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয়েন। পুনরায় প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার সময়ও পান্ না। রন্ধন, ভোজন, গৃহমার্জ্জন, ও ভোজনপাত্র ধৌত করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই যেন তাঁহারা এ জগতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অভিমান করেন, যাঁহাদের যথেষ্ট দাস-দাসী আছে, পাচক-পাচিকা আছে, যাঁহাদিগকে গৃহের কোন কর্ম্মই করিতে হয় না, তাঁহারা কেবল ভোজনে, পানে, উত্তম উত্তম বেশভূষা-পরিধানে, আলস্যে, নিদ্রায়, সদা শয়নে, ও নিষ্কর্ম্ম উপ-বেশনে শরীরের মেদ বৃদ্ধিকরিয়া নিজেরাই ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেদের বাতব্যাধি উৎপাদনকরেন ও কষ্ট পাইয়া থাকেন। অহল্যাবাই কিন্তু এই শ্রেণীর মহিলা ছিলেন না। তিনি একটা স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মত ঐশ্বর্য্যের ভোগ এ জগতে অতি অল্প মহিলার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যের

অধীশ্বরী হইয়াও পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী মহিলাগণের ন্যায় সদা পান-ভোজনে বেশ-ভূষা-পরিধানে, শয়নে ও নিষ্কর্ম্ম উপবেশনে অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতেন না। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের নিয়মাবলী ছিল। তিনি সেই নিয়মের সহিত প্রাত্যহিক কার্য্য সম্পাদনকরিতেন। তিনি কখনই নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, পূজা ও স্তবপাঠের পর কোন দিন রামায়ণের কয়েক অধ্যায়, কোন দিন শ্রীমদ্ভাগবতের, কোন দিন শ্রীমদ্ভগদ্বগীতার ও কোন দিন মহাভারতের কয়েক অধ্যায় স্বয়ং পাঠকরিতেন। কোন কোন দিন নিত্যপুরাণ-পাঠক ব্রাহ্মণ যেখানে বসিয়া পাঠকরিতেন, সেখানে গিয়াও কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পুরাণপাঠ শুনিতেন এবং রাজবাটীর অন্যান্য মহিলাদিগকে এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। তৎপরে রাজবাটীর দ্বারদেশে সমাগত ভিক্ষুকগণকে স্বহস্তে ভিক্ষা প্রদানকরিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন-করাইয়া স্বয়ং ভোজনকরিতেন। তাঁহার ভোজন বিষয়ে রাজোচিত কোন আড়ম্বর ছিল না। বিধবা হইবার পর তিনি কোন উত্তম মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণকরেন নাই, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বৈধব্যদশায় শয়ন, অশন, বসন, ও ভূষণাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-

বিধি আছে, তিনি সম্যকরূপে সেই সকল বিধি পালন-করিতেন। ভোজনের পর নির্দ্দিষ্ট রাজকীয় কার্য্যালয়ে গিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিধান-করিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনা ও স্তোত্রপাঠাদি সমাপ্ত করিতেন ও পুনরায় রাজকার্য্য করিতে বসিতেন। প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান ও ফলভক্ষণের পর দাসীগণ ভূমিতে শয্যা পাতিয়া দিলে তাহার উপর শয়ন করিতেন। বৈধব্যের পর তিনি পল্যঙ্কোপরি শয়ন করিতেন না। ইহাও বৈধব্যদশায় ব্রহ্মচর্য্যের অন্যতম অবশ্য পালনীয় কঠোর বিধি। তিনি বৈধব্যদশায় মস্তকে কেশ উদ্গত হইলেই মুণ্ডনকরিয়া ফেলতেন। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে বিধবারা মস্তকে কেশ রক্ষা করেন না। বঙ্গদেশেও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলের বিধবা মহিলাগণ মস্তকে কেশ রক্ষা করেন না। অহল্যাবাইর পূর্ব্বোক্ত দৈনন্দিন কার্য্যাবলীতে কখনও আলস্য বা ঔদাস্য ছিল না। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যগুলি নিয়মিতরূপে প্রতিপালিত হইত। নিয়মিতরূপে দৈনন্দিন কার্য্যানুষ্ঠানের রীতি ইউরোপীয় নর-নারীর মধ্যে প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা ভারতের নর-নারীগণের মধ্যে এই-রূপ রীতি নাই বলিলেই চলে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ছিল। এক্ষণে বৃটিশ রাজত্বকালে যেরূপ মহাসুখস্বচ্ছন্দে ভারতের

নর-নারী বাস করিতেছেন, তাহা অপক্ষপাতে সম্যক্ উপলব্ধিকরিয়া এই রাজত্বকে রামরাজত্ব বলিলেও অত্যুক্তি বা চাটুবাক্য হয় না। কারণ, এক্ষণে কোন প্রবল দুর্ব্বলকে বধকরিয়া জেলাকোর্টের বিচারে নিষ্কৃতি পাইলেও হাই-কোর্টের ব্যয়সাধ্য মহাসূক্ষ্ম সুবিচারে বধের উপযুক্ত দণ্ড-লাভ করিয়া থাকে। কিম্বা জেলাকোর্টের বিচারে কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হাইকোর্টে আপীল্ করিলে হাইকোর্টের মহাপ্রশংসনীয় সূক্ষ্ম সুবিচারে সে ব্যক্তি একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করে, কিম্বা যাবজ্জীবন বা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র-পাঠে প্রায় নিত্যই এইরূপ ঘটনা অবগত হওয়া যায়। আবার এহেন উত্তম হাইকোর্টের বিচারে কোন ব্যক্তির প্রকৃত-রূপে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে সর্ব্বপ্রধান বৃটিশরাজধানী লণ্ডন-মহানগরীর "প্রিভি কাউন্‌সিল্"-নামক উচ্চতম উত্তমোত্তম বিচারালয়ের সর্ব্বোত্তম সূক্ষ্ম সুবিচারে সুফল ফলিয়া থাকে। প্রকৃত দোষী দণ্ড পায়, ও প্রকৃত নির্দ্দোষ নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। যাঁহারা ভারতের "পুলিশ্"-শাসনের নিন্দা না করিয়া জলপান করেন না, তাঁহারাও শপথ করিলে ইহা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ভারতীয় পুলিশের কঠোর শাসন না থাকিলে "গুণ্ডা" ও "বদ্‌মাস্" নামক দুর্বৃত্তগণের দৌরাত্ম্যে কিম্বা অনিষ্টচেষ্টক ছদ্মবেশী

ভদ্রের উৎপীড়নে এতদিন বাস করা অসম্ভব হইত। পুলিশ বা গুপ্তচরবিভাগীয় সুদক্ষ কর্ম্মচারীর বিস্ময়জনক, শিক্ষাপ্রদ, ঔৎসুক্যবর্দ্ধক অনুসন্ধানপদ্ধতির প্রভাবে দোষী ব্যক্তি ধৃত হইয়া হাইকোর্টের সুবিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কচিৎ কোন পুলিশ-কর্ম্মচারী ভ্রমবশতঃ কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ধরিয়া অভিযুক্ত করিলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিচারকের সূক্ষ্ম সুবিচারে নিষ্কৃতিলাভ করিলেও, সাধারণতঃ পুলিশকে দোষ দেওয়া কখনই উচিত নয়। ব্যক্তিবিশেষের দোষে সমগ্র বিভাগটা দোষাস্পদ হইতে পারে না। পৃথিবীতে ভাল মন্দ লোক সকল বিভাগেই আছে। যে সময়ে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই যেরূপ অশান্তি ও অরাজকতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এমন কি, মোগলসাম্রাজ্যের পূর্ণ উন্নতির সময়েও, দিল্লী হইতে সুদূর দেশে যেরূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খল শাসন-পদ্ধতি ছিল, তাহা একবার চিন্তা করিলে সমপ্রাণ সমবেদন ব্যক্তির হৃৎকম্প উপস্থিত হয় না কি? উহার একটা চিত্র মনে অঙ্কিত করিয়া লইলে আধুনিক ভারতীয় পুলিশের দোষদর্শী ব্যক্তিকে সত্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া ইহা বলিতে হইবে যে, আধুনিক শাসনপদ্ধতি বা বিচারপদ্ধতি বাদসাহী সকল শাসনপদ্ধতি ও সকল বিচার-পদ্ধতি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই রামরাজত্বের সহিত বৃটিশরাজত্বের তুলনা দেওয়া হইয়া

থাকে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে রাজদ্রোহী বা অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন, কিম্বা তাঁহাদের রাজকীয় অনুগ্রহলাভের ক্ষুধা এতই প্রবল যে, তাঁহারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দুষ্ট কাঙ্গালের ন্যায় চিৎকার করিয়া দাতার প্রতি কটুবাক্য-বাণ বর্ষণকরেন। যিনি ঈদৃশ সত্যকথনকে ইংরাজের চাটুবাদ বলিয়া মনে করেন, তিনি কৃতঘ্ন বা ভ্রান্ত কিম্বা নীচচেতাঃ। চিৎকার করিয়া ভিক্ষা করিলে কিম্বা কটুক্তি বর্ষণকরিলে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। নিজের চরণের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে স্বীয় অভীষ্ট পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। "আমি খঞ্জব্যক্তি। আমাকে গাড়ী দাও, পাল্কী দাও", বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিলে বা উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকিলে কেহ গাড়ী পাল্কী দিবে না। কিম্বা "ঘোড়া দিলায়্ দে রাম্," বলিয়া ঘোড়া প্রার্থনা করিলে রাম সদয় হইয়া ঘোড়া দিলেও বিচিত্র ঘটনাচক্র বশতঃ সেই ঘোড়া উল্‌টে যদি বহনীয় হইয়া উঠে, তাহা হইলে "উল্‌টা বুঝ্‌লি রাম", এই কথা বলিয়া রামকে দোষ দেওয়া কি ভাল?

অহল্যাবাই যে সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, সে সময়ে একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা যে, কিরূপ কঠিন কার্য্য ছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকের নিকটে অবিদিত নহে। তখন ভারতের সর্ব্বত্রই রাজা মহারাজা ও জমিদারগণ পরস্পরের স্বাধীনতারক্ষার নিমিত্ত পরস্পর

করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ভীল-উপদ্রব তিরোহিত হইল। উপদ্রুত প্রদেশে অচিরে শান্তি স্থাপিত হইল। ভীলদিগের এই এক নিয়ম ছিল যে, তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের মধ্য দিয়া অন্য রাজ্যের লোক সকল গমনাগমন করিলেই তাহারা ইহাদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর আদায় করিত। এই করের নাম "ভীলকড়ি"। স্থানভেদে এই "ভীলকড়ি"র পরিমাণ ভিন্নভিন্নরূপ ছিল। একটি বৃষ যত পরিমাণ জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, ঐ পরিমাণ জিনিষের উপর আধ্ পয়সা কর নির্দ্দিষ্ট ছিল। অহল্যাবাই তাহাদিগের পুরুষানুক্রমে প্রচলিত এই কর-আদায়-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধন না করায় তাহারা তাঁহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগকরিয়া কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকরিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভীল সর্দ্দারকে তাঁহার রাজ্যের প্রজা পথিকগণের ধন-প্রাণ রক্ষার্থ দায়ী হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অহল্যাবাইর রাজ্যে পরম সুখ-শান্তি ও উৎকৃষ্ট শাসননীতির প্রশংসায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক ধনবান বণিক নানাস্থান হইতে ইন্দোরে আসিয়া বাসকরায় ইন্দোর ক্রমশঃ একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইন্দোর একটি সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র ছিল। অহল্যাবাইর রাজত্বকাল হইতেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি

হইতে আরম্ভ হয়। নাগরিকগণের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তিনি তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদানকরিতেন। অত্যাচারী ব্যক্তি অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইলেও তিনি কখনই তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। একদা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী তুকোজী রাজবিধি অনুসারে কোন উত্তরাধিকারি-বিহীন বণিকের প্রচুর সম্পত্তি রাজকোষাগার-ভুক্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ঐ বণিকের পত্নী পিত্রালয়েই বাস করিতেন। ঐ বণিক্-পত্নী এই সংবাদ অবগত হইয়া অহল্যাবাইর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অহল্যাবাই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বণিক্পত্নীকে অভয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আপনার স্বামীর সম্পত্তি নিরাপদে ভোগকরুন এবং জীবনান্তে যাহাতে উহা কোন ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনার সম্পত্তি লইয়া আমার কোষাগার পূর্ণ করিবার প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমার কোষা-গারের এখনও এমন দুরবস্থা উপস্থিত হয় নাই যে, আপনার সম্পত্তি লইয়া উহা পূর্ণ করিতে হইবে"। তুকোজীরাওকে এই বণিক্পত্নীর সম্পত্তি লইতে নিষেধ করিলেন। খণ্ডেরাও-নামক তাঁহার রাজস্ববিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী একজন ইজারদারকে উৎপীড়ন

করিয়াছিলেন বলিয়া অহল্যাবাই তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি স্মরণ রাখিবেন, যথাসময়ে কর সংগ্রহকরা অপেক্ষা প্রজাগণকে সুখী করাই আপনার প্রধান কার্য্য। আপনি প্রজাগণকে সুখী করিতে পারিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলেই আমি অধিকতর সন্তোষ লাভ করিব।" অহল্যা-বাইর রাজ্যের কোন নিঃসন্তান প্রজা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকে দত্তকপুত্র-গ্রহণের আদেশ প্রদান না করিয়া মরিয়া গেলে দত্তকপুত্র-গ্রহণের জন্য ঐ মৃত প্রজার পত্নীকে অহল্যাবাইর নিকটে অনুমতি গ্রহণকরিতে হইত। দত্তক-পুত্র না লইয়া ঐ প্রজার পত্নী মরিয়া গেলে ঐ প্রজার সমস্ত সম্পত্তি রাজনীতি অনুসারে রাজকোষাগারভুক্ত হইত। অহল্যাবাই কিন্তু এই বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি বহু কষ্টে অর্থ উপার্জ্জনকরিয়া উত্তরাধিকারি-বিহীন হইয়া মরিয়া যায়, তাহার উপার্জ্জিত সম্পত্তির রক্ষার নিমিত্ত দত্তকপুত্র গ্রহণকরাই তাহার স্ত্রীর পক্ষে উচিত কার্য্য। যদি তাহার স্ত্রী দত্তকপুত্র গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থে তাহার স্বামীর কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় হওয়াই উচিত। ধর্ম্মার্থে ঐ অর্থের সদ্ব্যয় হইলে ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ কল্যাণই সাধিত হইতে পারে"। একদা তাঁহার রাজ্যের অধিবাসী এক নিঃসন্তান ধনবান বণিক্, স্ত্রীকে দত্তকপুত্র-গ্রহণের অনুমতি দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়া-

ছিল। তাহার স্ত্রী, স্বামীর আদেশ অনুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অহল্যাবাইর এক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ঐ বণিক্‌পত্নীকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, যদি তুমি তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষাগারভুক্ত হইবে। আর তোমার এই দত্তকপুত্র-গ্রহণ অসিদ্ধ করিয়া দিব। নিরুপায়া বিপন্না বণিক্‌পত্নী সেই দত্তক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অহল্যাবাইর শরণাগত হইলেন, ও সেই কর্ম্মচারীর উৎপীড়নের কথা তাঁহাকে নিবেদনকরিলেন। অহল্যাই সেই কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিলেন, এবং বণিক্‌পত্নীর সেই দত্তক পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া মাতৃবৎ আদর করিতে লাগিলেন। আদর করিবার সময় তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। বণিক্‌পত্নী রাজ্ঞীর এইরূপ দয়া-স্নেহ-দর্শনে আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহারও নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অহল্যাবাই সেই বালককে বহুমূল্য জরীর জামা, পাজামা, টুপী ও হার-বলয়াদি সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে সুন্দর সুসজ্জিত বহুমূল্য শিবিকায় আরোহণকরাইয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। ঐ বণিক্‌পত্নী অহল্যাবাইকে অনেক মূল্যবান্ উপঢৌকন দিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অন্য কোন অবসর হইলে

তিনি উহা লইতে পারিতেন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তিনি উপঢৌকন-গ্রহণে অক্ষম। ঐ বালক কোন এক সম্মানিত ধনী বণিকের দত্তকপুত্র বলিয়া তাহার সম্মানার্থ তিনি তাঁহাকে ঐ শিবিকাটি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতে অনেক রাজার রাজ্যে উচ্চ অট্টালিকানির্ম্মাণ, শিবিকারোহণ, ও গৃহে বা দেবালয়ে প্রহরে প্রহরে নহবৎ-বাদ্য প্রভৃতি প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এখনও কোন কোন স্বাধীন রাজার দুর্গমধ্যস্থিত প্রাসাদের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে রৌদ্র বা বৃষ্টির সময়েও ছত্র ব্যবহারকরা প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ। রাজার বাড়ীর ভিতরে অন্য ব্যক্তি ছত্র ব্যবহার করিলে রাজার একছত্রত্বের ব্যাঘাত হয়, মানহানি হয়। সুতরাং কর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য হইয়া রৌদ্রে পুড়িতে হয় এবং বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। অহল্যাবাইর রাজ্যে এইরূপ অদ্ভুত নিয়মের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া প্রজাগণকে কখনও কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। তাঁহার রাজ্যের কোন প্রজা উচ্চ উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণকরিয়াছে, কিম্বা কোন প্রজা বহু অর্থ উপার্জ্জন করে ও উত্তম যান-বাহনে আরোহণকরিয়া থাকে, এই কথা শুনিলে অহল্যাবাই অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন এবং এইরূপ ধনী ও সম্মানিত প্রজা তাঁহার রাজ্যে বাস করে বলিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎকালে অনেক রাজার রাজ্যে প্রজার পক্ষে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করা মহাবিপজ্জনক ছিল।

রাজার ভয়ে প্রজারা প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত। অনেক রাজা প্রজার প্রভূত অর্থ-সঞ্চয়ের সংবাদ অবগত হইয়া লুণ্ঠন করিয়া লইতেন। একদা অহল্যাবাইর রাজ্যের প্রজা নিঃসন্তান ধনবান দুই ভ্রাতা প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমনকরিলে তাঁহাদের বিধবা পত্নী দুইটি অহল্যাবাইকে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি প্রদানকরিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অহল্যা-বাই তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা এই অর্থ ধর্ম্মার্থে ব্যয়করুন। তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আপনাদের অর্থেরও সদ্গতি হইবে"। বিধবাদ্বয় তাঁহার অনুমতি ক্রমে তাহাই করিয়াছিলেন। কোন মৃত প্রজার পত্নী তাঁহার নিকটে দত্তক-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনার সময় উপঢৌকন দিতে চাহিলে তিনি তাহা লইতেন না। ইহাতে তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বলিতেন, "প্রজা রাজকীয় বিধি অনুসারে রাজ-প্রাপ্য উপঢৌকন দিতে বাধ্য। আপনি তাহা লইবেন না কেন"? তাহাতে তিনি এই উত্তর করিতেন যে, "প্রজাকে দত্তকপুত্র-গ্রহণের জন্য রাজার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় এবং রাজাকেও অনুমতি দিতে হয়, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। কিন্তু তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ-করিতে শাস্ত্র আদেশ করেন নাই। ইহা স্বেচ্ছাচারী, যে কোন উপায়ে ধন-বৃদ্ধি-কামী রাজার রাজ্যতন্ত্রের নিজ-

রচিত বিধি মাত্র। ইহা প্রাচীন শাস্ত্রবিধি নহে। অহল্যা-বাইর দয়া-স্নেহের তুলনা দৃষ্ট হয় না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তথা হইতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বহু সহস্র লোক দলে দলে অহল্যাবাইর রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আগমন করিয়াছিল। অহল্যা-বাই তাহাদের জন্য নিজের অন্নভাণ্ডারের দ্বার সদা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান সময়ে সাধারণতঃ লোক ব্রাহ্মণ ও স্বজাতীয় আত্মীয় বা অন্য জাতীয় মিত্রগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। কিন্তু দরিদ্র চণ্ডালাদি ইতর জাতিকে প্রচুররূপে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়-প্রদানে পরিতৃপ্ত করে না। সেইজন্য অহল্যাবাই ইহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোজন-করাইতেন ও উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রদানকরিতেন। মনুষ্যজাতির প্রতি তাঁহার দয়া-স্নেহের কথা ছাড়িয়া দিয়া পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবের প্রতি তাঁহার দয়া-স্নেহের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পক্ষিগণ ক্ষেত্রের শস্য ভক্ষণকরিয়া কৃষকের ক্ষতি করে বলিয়া তাহারা সর্ব্বত্রই কৃষক কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া থাকে। অহল্যাবাইর প্রাণে ইহা সহিত না। তিনি পতঙ্গগণের ভক্ষণের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শস্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। পতঙ্গগণ নানাস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া তথায় নির্ভয়ে আনন্দে শস্য ভক্ষণকরিত। মৎস্যের প্রতি তাঁহার দয়ার কথা

শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মৎস্যগণের ভক্ষণের নিমিত্ত নর্ম্মদানদীর জলে প্রতিদিন ভূরি ভূরি খাদ্যদ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইত। তিনি যখন যে তীর্থে গমনকরিয়াছেন, তথায় এত অন্ন-বস্ত্র ও ধন বিতরণকরিয়াছেন যে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ভারতে এমন তীর্থ ই নাই, যেখানে অহল্যাবাইর কীর্ত্তি নাই। কাশীতে "অহল্যাবাই-ব্রহ্মপুরী"তে তাঁহার বৃহৎ অন্নসত্রে অদ্যাপি বহুলোক ভোজনকরিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকে। কাশীর "অহল্যাবাইর ঘাটে"র উপর উচ্চদুর্গতুল্য বৃহৎ প্রস্তরময় প্রাসাদের মধ্যে ঐ অন্নসত্র এখনও চলিতেছে "অহল্যাবাইর ঘাটে"র উপরিস্থ ঐ অন্নসত্রের একটি কক্ষে এখনও প্রহরে প্রহরে সুমধুর "নহবৎ"-বাদ্য-ধ্বনি শ্রোতার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত-করিতেছে। "অহল্যাবাইর ঘাটে"র মত অমন সুন্দর সুদৃঢ় পরিচ্ছন্ন প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত ঘাট কুত্রাপি নাই বলিলেই চলে। কতকাল পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কাশীতে ইহাই সান্ধ্য সমীরণ-সেবনের একমাত্র স্থান।

কাশীর "অহল্যাবাই ঘাট", ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির, "মণি-কর্ণিকাঘাট" প্রভৃতি, এবং গয়ায় বিখ্যাত প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন বিষ্ণুপাদমন্দির প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ অদ্যাপি তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি ঘোষণাকরিতেছে। তিনি দিল্লী হইতে

পুরী পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মাণকরাইয়া পথিকগণের যে, কি মহান উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই অবর্ণনীয়। পথিকগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া ফল-সম্ভারবিশিষ্ট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে, এবং উহাদের ফল ভক্ষণকরিবে, এবং পক্ষিগণ ঐ সকল বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্ম্মাণকরিয়া বাসকরিবে, এই উদ্দেশে তিনি এই বিখ্যাত সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত পথের দুই পার্শ্বে নানাবিধ ফলবৃক্ষ রোপণকরাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার শশুর মল্‌হর্‌রাও মৃত্যুর সময় ৭০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি এবং ১৬ কোটি টাকা নগদ ও বহুসংখ্যক মণি-রত্নাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিয়াগিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, অহল্যাবাই এই ১৬ কোটি টাকাই পুণ্য-কার্য্যার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। মল্‌হর্‌রাওর মৃত্যুর পর তাঁহার কোষাগারে ১৬ লক্ষ টাকা সঞ্চিত আছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া রাঘোবা পেশোয়া উহা আত্মসাৎ করিবার জন্য অহল্যাইকে দূতমুখে জানাইয়াছিলেন যে, "আপনার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় আমাদেরই বংশের ভৃত্য হইয়া অনেক কোটি টাকা উপার্জ্জনকরিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। ইহা আমাদেরই গৌরবের কথা, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সৈন্যপোষণ-ব্যয়ের নিমিত্ত আমাদের কোষাগারে অর্থাভাব ঘটিয়াছে।

আপনি আমাদের ভৃত্যের পুত্রবধূ। অতএব এ সময়ে আপনার শ্বশুরের প্রভুবংশের উপকার সাধনকরা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আপনার শ্বশুরের অর্থ-দ্বারা আমাদিগকে সাহায্যকরা আপনার উচিত"। অহল্যাবাই রাঘোবার দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূত-মুখে তাঁহাকে জানাইলেন, "আমি আমার কোষাগারে সঞ্চিত অর্থগুলি দানাদি ধর্ম্মকর্ম্মার্থে ব্যয়করিবার জন্য রাখিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং আপনি প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের ন্যায় উহা গ্রহণকরিতে পারেন। আমি ঐ অর্থগুলির উপর তুলসীপত্র রাখিয়া ও উহাতে গঙ্গাজল সিঞ্চনকরিয়া দানমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উহা উৎসর্গকরিয়া একাদশী সংক্রান্তি বা পূর্ণিমা পুণ্যতিথিতে উহা আপনাকে দানকরিতে পারি। আপনি এইরূপে এই দান গ্রহণ-করিতে পারেন"। রাজত্বাভিমানী মহাদাম্ভিক রাঘোবা অহল্যাবাইর এইরূপ কথা শুনিয়া অহল্যাবাইকে লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি যাজনাদি-উপজীবী প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ নহেন। সুতরাং তিনি ঐরূপে দান গ্রহণকরিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঐ টাকা লইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহাকে আপাততঃ যুদ্ধদান করিলে তিনি সাদরে উহা গ্রহণকরিতে প্রস্তুত আছেন। অহল্যাবাই রাঘোবার এই কথার এই উত্তর দিলেন যে, "যুদ্ধে মরি, সেও ভাল, তথাপি দানাদি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যে

অর্থ ব্যয়করিব বলিয়া সংকল্পকরিয়াছি, তাহা অন্য কর্ম্মের নিমিত্ত কখনই ব্যয়করিব না"। রাঘোবা অহল্যাবাই কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন ও যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নিরূপিত দিবসে তিনি সৈন্য-সামন্তে পরিবৃত হইয়া নিরূপিত যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন। অহল্যাবাইও, যুদ্ধবেশে সজ্জিতা পাঁচশত দাসীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাঘোবা, অহল্যাবাইর স্ত্রী-সৈন্যকে আক্রমণকরিবার জন্য নিজের সৈন্যাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল, "মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-সেনাপতিগণ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক"। তখন রাঘোবা অহল্যাবাইর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পুরুষ সৈন্য-সামন্ত সকল যুদ্ধকরিতে আসে নাই কেন"? অহল্যাবাই বলিলেন, "আমরা পেশোয়ার ভৃত্য। প্রভুর সহিত যুদ্ধকরিয়া কৃতঘ্ন প্রভুদ্রোহী হইতে চাহি না। পক্ষান্তরে ভৃত্য বধ-করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে বধকরিয়া আমার ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানার্থে রক্ষিত অর্থগুলি অনায়াসেই লইতে পারেন। পারলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত উৎপাদনকরা ও ভৃত্য বধকরা যদি আপনার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আপনি অনায়াসেই ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ইহাতে আমি অণুমাত্র

ভীত-চকিত নহি”। কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্না প্রকৃত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা ধর্ম্মার্থে প্রাণের মমতাকে তুচ্ছ জ্ঞানকরেন। তাঁহার নিকটে প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। ব্রাহ্মণ পুরুষ রাঘোবা শূদ্রা মহিলা অহল্যাবাইর এই প্রকার ধর্ম্মবুদ্ধি ও তেজঃ-সূচক রাজনীতি-কৌশল-পূর্ণ কথা শুনিয়া লজ্জিতবৎ প্রতীয়মান হইলেন। তাঁহার প্রকৃত লজ্জাবোধ হইয়াছিল কি না, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণই নারীদিগের সহিত যুদ্ধকরিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তখন সেস্থলে অহল্যাবাইর নিকট হইতে মানে মানে বিদায় লওয়াই তিনি বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার নিজের সৈন্য-সামন্ত সকল নারীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে না, এ কথা অহল্যাবাইর নিকটে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া—প্রকৃত কথা ব্যক্ত না করিয়া অহল্যাবাইকে বলিলেন, “তোমার শ্বশুর আমাদের অনেক লবণ ভক্ষণকরিয়াছে, তুমি তাহারই পুত্রবধূ। একে তাহার পুত্রবধূ, তায় আবার বিধবা, তাহাতে আবার একটিও পুরুষ-সৈন্য তোমার সঙ্গে নাই। সুতরাং তুমি আমাদের ক্ষমা ও দয়ারই পাত্রী। অতএব এ যাত্রা তোমার সহিত যুদ্ধ করিলাম না। পাঁচশত মাত্র অবলার সহিত আমার প্রবলা বাহিনী যুদ্ধকরিয়া জয়লাভ করিলেও লোকে বলিবে, “ওরূপ জয় জয়ই নয়”। ঐরূপ

জয়ে কোন "বাহাদুরী" নাই। তাই এ যাত্রা তোমার সহিত যুদ্ধ করা হইল না", এই কথা বলিয়া রাঘোবা স্বকীয় সৈন্যমণ্ডলীর দিকে চলিয়া গেলেন। অহল্যা-বাইও পাঁচশত স্ত্রী-সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগকরিয়া স্বস্থানে প্রস্থানকরিলেন। রাঘোবা যেরূপ কুটিল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীও, তদ্রূপাই ছিলেন। অহল্যাবাইর অন্তঃকরণটি খুব নির্ম্মল সুন্দর ছিল। কিন্তু তিনি সুশ্রী সুন্দরী রমণী ছিলেননা। একদা রাঘোবার স্ত্রী, অহল্যাবাই সুন্দরী কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত ইন্দোর-রাজবাটীতে একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। দাসী, অহল্যাবাইকে দেখিয়া রাঘোবার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলিয়াছিল, "অহল্যা-বাই দেখিতে তেমন সুন্দরী না হইলেও, তাহার মুখমণ্ডল হইতে যেন একটা অসাধারণ জ্যোতিঃ বা তেজ নির্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়"। রাঘোবার স্ত্রী বলিলেন, "সে যাহা হয় হউক, তজ্জন্য আমি ভাবিত নহি। অহল্যা-বাই সুন্দরী না হইলেই হইল। সে ত সুন্দরী নয়, তাহা হইলেই হইল"। রাঘোবার স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিলেন। একদা জয়পুরের মহারাজার নিকটে হোল্‌কর্-সরকারের প্রাপ্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা বাকি পড়িয়াছিল। তুকোজিরাও হোল্‌কার্ তখন ইন্দোর-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি জয়পুররাজের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী দিওয়ান্ দৌলতরামের নিকটে সেই প্রাপ্য টাকার

জন্য কয়েকবার "তাগাদা" করিয়া সেই টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। তুকোজিরাওর সহিত গোয়ালিয়রের মহারাজ মহদাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ জিউবা দাদা বক্সির সহিত কোন কারণবশতঃ বিবাদ ঘটিয়াছিল। জিউবাদাদা দিওয়ান্ দৌলতরামকে লিখিলেন, "আপনি তুকোজিকে ঐ টাকাটা দিবেন না। যদি তুকোজি ঐ টাকার জন্য আপনাদের সহিত বিবাদকরিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে সাহায্যকরিতে প্রস্তুত আছি, জানিবেন। " দিওয়ান্ দৌলতরাম তুকোজীকে লিখিলেন, "আপনাদের প্রাপ্য টাকা বিনা আপত্তিতে আমরা চুকাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জিউবা দাদা বক্সি বলিতেছেন, এ টাকাটা তাঁহারই প্রাপ্য। অতএব আপনাদের দুইজনের মধ্যে যিনি প্রবল হইবেন, তিনিই আমাদের নিকট হইতে ঐ টাকা লইতে পারেন"। তুকোজি, দিওয়ান দৌলতরামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু জিউবা দাদা তুকোজির প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বেই তুকোজীকে সহসা আক্রমণকরিলেন। যুদ্ধের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়ায় তুকোজি সে যাত্রায় পরাজিত হইলেন। তুকোজির অনেক সৈন্য ও কয়েকজন দক্ষ সেনাপতি সে যুদ্ধে হত হওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি জয়পুর হইতে দ্বাবিংশতি

ক্রোশ দূরে "ব্রাহ্মণ গাঁও"-নামক স্থানে অবস্থিত একটি দুর্গের মধ্যে পলায়নকরিয়া নিজের প্রাণ রক্ষাকরিয়াছিলেন। তুকোজি রাও এইরূপ বিপন্ন হইয়া তাঁহার বিপত্তি-বার্ত্তা জানাইবার জন্য ও শীঘ্র উপযুক্ত অর্থ ও সৈন্য-প্রেরণের নিমিত্ত অহল্যাবাইর নিকটে গোপনে একটি লোককে প্রেরণকরিয়াছিলেন। অহল্যাবাই সে সময়ে নর্ম্মদানদী-তীরস্থ মহেশ্বরক্ষেত্র-নামক তীর্থে ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজকার্য্য করিতে করিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তিনি এইখানেই কয়েকদিন ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া শান্তিলাভ করিতেন। তিনি তুকোজির পরাজয় ও পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া মহাক্রোধসূচক স্বরে বলিলেন, "কি! তুকোজি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে? মানরক্ষা না করিয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়নকরা কাপুরুষের কার্য্য। সে যুদ্ধে মরিল না কেন? এরূপ লোক মরিয়া গেলে কোন ক্ষতি ছিল না। ওঃ, শেষটা এই বৃদ্ধাবস্থায় তুকোজির কাপুরুষতার দরুণ সিন্ধিয়ার একটা ভৃত্যের হস্তে—জিউবার হস্তে আমার এত অপমান!! ইহা কখনই সহ্য হয় না"। এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশকরিয়া অহল্যাবাই সেই বার্ত্তাবাহককে বলিলেন, "যাও, তুকোজির নিকটে গিয়া বল যে, সে যেন অণুমাত্র ভীত চিন্তিত ও হতাশ না হয়। হটাৎ আক্রমণকারী, কূটবুদ্ধি, কাপুরুষোচিতব্যবহারকারী জিউবাকে যেন সে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়। আমি তুকোজির

সাহায্যের জন্য সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র সৈন্য-সমূহে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছি এবং সৈন্য-সমুদ্রের উপরে অর্থের সেতু নির্ম্মাণকরিয়া দিতেছি। আর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকরিয়া তুকোজির সামর্থ্য ও উৎসাহ যদি নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, সে যদি যুদ্ধ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিও যে, আমি স্বয়ং শীঘ্রই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছি"। এই বলিয়া তিনি তুকোজির নিকটে বহুসংখ্যক সৈন্য ও কয়েক লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তুকোজি উপযুক্ত সৈন্য ও অর্থ পাইয়া জিউবা দাদা বক্সির সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে জিউবাদাদা তুকোজির নিকটে পরাজিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় এই যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে স্যার্‌জন্ ম্যাল্‌কম্ এই কথা লিখিয়াছেন যে, "তুকোজি ও জিউবাদাদার মধ্যেই পরস্পর কলহ উপস্থিত হওয়াতেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। নতুবা সিন্ধিয়া ও হোল্‌কর্ এই দুই বংশের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য বশতঃ এ যুদ্ধ ঘটে নাই। উভয়ের দুই কর্ম্মচারীর দোষেই ইহা ঘটিয়াছিল। অহল্যাবাই যুদ্ধপ্রিয়া ছিলেন না। তিনি সদাই শান্তিপ্রিয়া ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ তুল্য সুখ-শান্তি উপভোগকরিয়া বাসকরিত। রাজকীয় কার্য্যে

হিন্দুর ন্যায় মুসলমানকেও তিনি নিযুক্ত করিতেন। তিনি মুসলমান প্রজা বা কর্ম্মচারীর প্রতি বিদ্বেষ বা পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেন না। সমান অধিকার প্রদান করিতেন। তিনি কাহারও খোসামোদ ভালবাসিতেন না। তিনি চাটুভাষীকে অত্যন্ত ঘৃণাকরিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর পক্ষপাতিনী বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের কোন দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। তিনি বড়ই স্পষ্টবক্ত্রী ছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁহার অতিরিক্ত প্রশংসা বর্ণনাকরিয়া বহুশ্লোকপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনাকরিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। অহল্যাবাই এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গ্রন্থকার আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ গ্রন্থ অহল্যাবাইর মনের মত না হইলে তিনি ইহা কখনই আদ্যোপান্ত শুনিতে চাহিতেন না। কারণ, রাজকার্য্যে তিনি এতই ব্যস্ত যে, অন্য কার্য্যের জন্য তাঁহার এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও ঘটিয়া উঠে না। তাঁহাকে একটা বা দুইটা শ্লোক শুনাইবার অবসরলাভ অন্য কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আর তিনি যখন আমার এতগুলি কবিতা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই এইবার আমার সৌভাগ্যের চক্র শীঘ্রই ঘুরিতে আরম্ভ করিবে। এইরূপ

আশান্বিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ স্বরচিত গ্রন্থখানি অহল্যাবাইকে আদ্যোপান্ত শুনাইয়াছিলেন। শুনাইবার পর অহল্যা-বাই তাঁহার নিকট হইতে ঐ গ্রন্থখানি লইয়া একজন ভৃত্যকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য নিকটে আসিলে তাহার হস্তে ঐ গ্রন্থখানি অর্পণকরিয়া বলিলেন, "এই গ্রন্থখানিতে একটি প্রস্তর বাঁধিয়া নর্ম্মদা নদীর জলে নিক্ষেপকরিয়া আইস। যেন এখানি ভাসিয়া না উঠে। ভাসিয়া উঠিলে ইহা পুনরায় লোকের নেত্রগোচর হইবে"। কবি ব্রাহ্মণটিকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি অতি দীনা হীনা নারী। আমি এত অতিরিক্ত প্রশংসার যোগ্যা নহি। নিজে নিজের অত অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিলে পাপ হয়। ঠাকুর, আমাকে পাপগ্রস্ত করিবেন না"। এই কথা বলিয়া অহল্যাবাই সেস্থান ত্যাগকরিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। একদা অনন্ত ফন্দী-নামক এক সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অর্থপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। অনন্ত-ফন্দী মহারাষ্ট্রের "লাওনীকার" (শীঘ্র পদ্যরচয়িতা) কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্য লোকসকল কুড়ি ক্রোশ দূর হইতে সমাগত হইত। তিনি চিন্তা না করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অতি উত্তম উত্তম কবিতা রচনা ও পাদ-পূরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এত বড় প্রসিদ্ধ কবি ও ব্রাহ্মণ হইয়াও,

ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রজালবিৎ কোন মুসলমানের সংসর্গে থাকিয়া ইন্দ্রজাল দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহকরিতেন। একদা রাজ্ঞী অহল্যাবাই কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তির উপরে অত্যন্ত কুপিতা হইয়াছিলেন। সেই ক্রোধ তাঁহার মনে তখন অতিশয় অশান্তি উৎপাদনকরিয়াছিল। সেই সময়ে হটাৎ অনন্ত ফন্দী ইন্দোরের রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীর দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা জানাইলে রাজ্ঞী এইরূপ মনের অশান্তির সময় তাঁহার দুইটী কবিতা শুনিয়া আমোদ উপভোগকরিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দর্শন দিতে সম্মতা হইলেন। অনন্ত ফন্দী রাজ্ঞীর সম্মুখে বসিবা মাত্রই এমন একটি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনাকরিয়া রাজ্ঞীকে শুনাইয়াছিলেন, যে, ঐ কবিতাটি শুনিবা মাত্রই রাজ্ঞীর চিত্ত মহাপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একজোড়া মূল্যবান অতি উৎকৃষ্ট কাশ্মিরী পাল্লাদার শাল অনন্ত ফন্দীকে পারিতোষিক প্রদান করিলেও তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমানের সহিত ইন্দ্রজাল দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহকরেন বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

রাজ্ঞীর তিরস্কারে অনন্ত ফন্দীর মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি ঐন্দ্রজালিক বৃত্তি পরিত্যাগকরিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী অহল্যা-

বাই ব্রাহ্মণের ভক্ত হইলেও ব্রাহ্মণের দোষ দেখিলে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ দেখিলে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ব্রাহ্মণ-সন্তানের বেদাদিশাস্ত্রে সুশিক্ষার জন্য তিনি অনেক সংস্কৃত-বিদ্যামন্দির স্থাপনকরিয়াছিলেন। এই বিদ্যামন্দির গুলির কার্য্যপরিচালনের নিমিত্ত তিনি বহু অর্থ ব্যয়-করিতেন। অদ্যাপি তাঁহার কাশীস্থ অন্নসত্র-বাটীতে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ অবৈতনিক সংস্কৃতশিক্ষা পাইয়া থাকে। তিনি অশিক্ষিত নরনারীকে ভয়াবহ জীব বলিয়া মনে করিতেন। কথিত আছে যে, মল্‌হর্‌রাওর দুই কন্যা তাঁহার ননন্দা হর্‌কুবাই ও উদাবাইকে তিনি নিজে গুরুতর রাজকার্য্য-ভার সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্ম-চারিগণ বিস্মিত হইয়া যাইতেন। রাজস্বসংগ্রহ ও রাজস্ব-বিধির নূতন ও সহজ প্রণালী প্রণয়নকরিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরেরও বিস্ময় ও মহাসন্তোষ উৎপাদনকরিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধেও, নূতন ও অনায়াসে কার্য্যকর উত্তম বিধিসকল প্রণয়নকরিয়া তদানীন্তন বহু স্বাধীন রাজার প্রধান মন্ত্রীদিগেরও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়া-ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পরবর্ত্তী বহুরাজ্যের রাজারা রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিধির পরিবর্ত্তন বা নূতনরূপে প্রণয়নের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে

সে বিষয়ে অহল্যাবাই কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মতই অনুসরণ করিতেন। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার এইরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অবগত হইয়াই স্যার্ জন্ ম্যাল্কম্ বলিয়াছেন যে, "অহল্যাবাইর ন্যায় সুশিক্ষিতা সুদক্ষা রাজ্ঞী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল"। অহল্যাবাইর গুণাবলী সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনেক গাথা প্রচলিত আছে। বোম্বাই য়্যান্থ্রোপলজিক্যাল্ সোসাইটির সভাপতি (Vice President) মিষ্টার এইচ্, এ, য়্যাক্ওয়ার্থ-নামক গুণগ্রাহীর জাতি একজন ইংরাজ সেই সকল গাথা পরিশ্রমপূর্ব্বক সংগ্রহকরিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। আমাদের দেশেও পলাশীর যুদ্ধ, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, ও তিতুমিরের লড়াই সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় অনেক গাথা প্রচলিত আছে। সেইগুলি সংগ্রহকরিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলে ইতিহাস লিখিবার জন্য উত্তম উপাদানসকল সংগৃহীত হইতে পারে। অহল্যাবাই শেষ দশায় তুকোজির হস্তে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণকরিয়া কোলাহলশূন্য শান্তিপূর্ণ নর্ম্মদানদীতীরস্থ মহেশ্বরক্ষেত্রে বাস করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। রাজনীতিশাস্ত্রে রাজার তিনটি শক্তির উল্লেখ আছে। যথা—প্রভুশক্তি উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি। এই ত্রিশক্তিসম্পন্ন রাজারই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তুকোজির হস্তে রাজ্যের

সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইলেও, তাঁহাতে উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি নিহিত হইলেও, অহল্যাবাই স্বীয় প্রভুশক্তি-রক্ষণে কখনই উদাসীন হয়েন নাই। যিনি তাঁহার এই প্রভুশক্তির ব্যাঘাত ঘটাইতে চেষ্টাকরিতেন, অহল্যাবাই তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিতেন। একদা পুণার পেশোয়া-দরবারের প্রতিনিধি ও দূত, ইন্দোর-দরবারে নিযুক্ত, শিবাজি গোপালের কর্ম্মপটুতা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মাধবরাও পেশোয়া তাঁহাকে একটি উচ্চপদ প্রদান করিয়া পুণায় নিজদরবারে রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তুকোজিরাও, পেশোয়ার মান-রক্ষার্থ শিবাজী গোপালকে পুণায় পেশোয়া দরবারে কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজ্ঞী অহল্যাবাই তুকোজিকে নিকটে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "তোমাদের ব্যবহারে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইন্দোররাজ্যের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই। ইহাতে আমার কোন অধিকারই নাই"। তুকোজি এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "এরাজ্যে যদি আমার কোন অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আমার আজ্ঞা না লইয়া শিবাজী গোপাল পুণায় পেশোয়া-দরবারে গিয়া কখনই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত না। পেশোয়া, শিবাজী গোপালকে যখন নিজ দরবারে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন,

তখন সে কথাটা আমাকে একবার জ্ঞাপন করাও কি উচিত ছিল না? শিবাজী গোপাল ইন্দোরে আমার দরবারেই থাকিয়া পেশোয়া-দরবারের দৌত্যকার্য্য করিবে, এইরূপ একটা নিয়ম পূর্ব্বে ধার্য্য হয় নাই কি? যাহার দরবারে সে এতদিন ছিল, অন্য দরবারে যাইবার সময় তাহাকে একবার সেই কথাটা জানান কি তাহার উচিত কর্ম্ম নয়? তুমি বা শিবাজী গোপাল আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিলেও আমি অণুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ, আমি এক্ষণে গীতার সার কথা প্রতিপালনের নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া মহেশ্বরক্ষেত্রে বাস করিতেছি। লাভ, ক্ষতি, মান, অপমান, জয় পরাজয়, ও নিন্দা-স্তুতিতে সম জ্ঞান করাই গীতার উপদেশ। এ অবস্থায় এইরূপ সমজ্ঞানের সাধনাই আমার ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়াছি। তুমি এক্ষণে উৎসাহ-শক্তি ও মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন হইয়াছ। প্রভুশক্তিসম্পন্ন হইতে যাহা একটু তোমার বাকি ছিল, তাহাও হইয়াছে। যাহাই হউক, তজ্জন্য আমি অণুমাত্র চিন্তিত নহি। কিন্তু বাপু, আমার এই শেষ কথা, আমার শ্বশুর মহাশয়ের কীর্ত্তি টা বজায় রাখিয়া যাহাতে পেশোয়ার অনুগ্রহপাত্র হইতে পার, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও। আমি মরি কি বাঁচি, সে সংবাদ তুমি যেরূপ রাখিবে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ এখন হইতেই প্রকাশ পাইতেছে”। তুঁকোজিরাও

রাজ্ঞীর এইরূপ কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজগণ্ডে নিজে চপেটাঘাত করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে রাজ্ঞীর চরণে মস্তক স্থাপনকরিলেন এবং অনুতপ্তচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "মা, অপরাধ হইয়াছে। মার্জ্জনা করুন। "কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়"। আমার কুল-দেবতা স্বয়ং মার্ত্তণ্ডদেব মানবীমূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে আজ্ঞা করিলেও আপনার অনুমতি বিনা আমি আর কোন কার্য্যই করিব না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, মা, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা"।

রাজ্ঞী অহল্যাবাই তুকোজীকে অত্যন্ত অনুতপ্ত দেখিয়া বলিলেন, "যাও। আর এরূপ যেন না হয়। নিজের কথার মত কার্য্য করিও। লৌকিক মর্য্যাদা রক্ষাকরিয়া কার্য্য করিলে পরমেশ্বরের পরম অনুগ্রহ লাভকরিতে পারা যায়। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়"। ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভকরিয়া যাঁহারা বড়লোক হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাংসারিক সুখে বঞ্চিত। অনেকেই পারিবারিক দুঃখে জর্জ্জরিত। অহল্যাবাই স্ত্রীলোক হইয়া যেরূপ রাজশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতিবিরল। কিন্তু তিনি সাংসারিক সুখে সুখিনী ছিলেন না।

অল্পবয়সে তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। তাহার পর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার একমাত্র পুত্র মালেরাওর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়াগিয়াছিল। তাহার পর মালেরাওর দুইটি পত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার একমাত্র কন্যা মুক্তাবাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেই মুক্তাবাইও অকালে বৈধব্যযন্ত্রণা পাওয়ায় অহল্যাবাই যে, কিরূপ কষ্ট অনুভবকরিয়াছিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। মুক্তাবাইর একটি পুত্র হইয়াছিল। অহল্যাবাই তাহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া নিজের কাছে রাখিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দৌহিত্রটিও যৌবনাবস্থায় উপনীত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অহল্যাবাই শোকের সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। বিধবা কন্যা, মুক্তাবাইও বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। অহল্যাবাই তাঁহাকে সহমৃতা হইতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তাবাই বলিয়াছিলেন, "মা, তোমার মৃত্যুর পর তোমার রাজ্যের প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য আমাকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিতেছ। কিন্তু মা, তুমি একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, তোমার

মৃত্যুর পর আমার ন্যায় সামান্য বিধবার পক্ষে এত বড় স্বাধীন রাজ্য সসম্মানে রক্ষাকরা কিরূপ ভয়াবহ ব্যাপার ? আমি কি মা, তোমার ন্যায় শক্তিশালিনী প্রতাপিনী হইতে পারিব ? কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন রাজ্য-লোলুপ দুশ্চরিত্র রাজাদিগের হস্তে তখন নিগৃহীত হওয়া অপেক্ষা এক্ষণে মানে মানে পতির সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষাকরাই শ্রেয়ঃ"। অহল্যাবাইর অনেক অনুনয় ও নিষেধ সত্ত্বেও মুক্তাবাই পতির সহিত এক চিতায় আরোহণকরিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যেস্থলে এই চিতা সজ্জিত হইয়াছিল, অহল্যাবাই তথায় জামাতা ও কন্যার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত একটি উত্তম স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি কয়েকটি শোক পাইয়া অহল্যাবাই জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন। তিনি গীতা ও যোগবাসিষ্ঠ-রামায়ণ প্রভৃতি পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নকরিতেন বলিয়া এই সকল শোকে উন্মত্তা ও অধীরা হয়েন নাই। এই সকল গ্রন্থ-শিক্ষা-প্রভাবেই তিনি নিজ কর্ত্তব্যপালনে সমর্থা হইয়া-ছিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া নিজকর্ত্তব্যমাত্র পালন-করিতেন। তিনি কর্ত্তব্যপথ হইতে কখনই ভ্রষ্ট হয়েন নাই। শোকসন্তাপে প্রপীড়িত হওয়ায় ক্রমেই তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তিনি এ অবস্থাতেও, পারলৌকিকশাস্ত্র-পাঠ ও ব্রত-উপবাসাদি হইতে নিবৃত্ত হয়েন নাই। তাঁহার প্রজাগণ

তাঁহাকে কেবলমাত্র প্রতিপালিকা রাজ্ঞী বলিয়া মনে করিত না। তাহারা তাঁহাকে তাহাদের সাক্ষাৎ জননী বলিয়া মনেকরিত। সেই জন্য তাহারা সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িত। তিনি তাহাদের অতিশয় আগ্রহ হেতু মহেশ্বরক্ষেত্র ত্যাগকরিয়া ইন্দোরে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, তিনি ততই পুণ্যকার্য্যের মাত্রা বাড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি "মুক্তদ্বারঅন্নসত্র"-নামক একটি দীন-ভোজনা-লয় স্থাপন করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সত্রে কেবলমাত্র যে, ব্রাহ্মণ-ভোজনেরই ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু এই সত্রে যে কোন জাতীয় ও যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতি আসিয়া যাহাতে খাদ্য ও বস্ত্র পাইতে পারে, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের একটা সংখ্যা বিধিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত বলিয়া তিনি তাহাদের বাসনা-পরিপূরণের জন্য তাঁহার শেষ অবস্থাতেও অন্তঃপুর হইতে দরবার-গৃহে আসিয়া বসিতেন। এরূপ প্রজারঞ্জিকা কোন রাজ্ঞী এ পৃথিবীতে জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। ঈদৃশী সুশিক্ষিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা রাজ্ঞী ভারতে জন্মিয়াছেন বলিয়াই ভারত গৌরবান্বিত। পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয়া

রাজ্ঞী অহল্যাবাই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবণ-মাসে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে ষাট্ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রজাবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত দিব্য ধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার পরম-স্নেহাস্পদ, পুত্রসম, নিজগুণে উন্নতির চরম সীমায় আরূঢ়, মহারাজ তুকোজীরাও হোল্‌কর্ বাহাদুর ইন্দোররাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তুকোজীর বংশধরই এক্ষণে ইন্দোরের অধিপতি।

সমাপ্ত।